মোগল বংশ।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত।

"Man can be read by the heart of man. The heart is strengthened * * * * by what it hears and sees, and until it hears or sees the bad and the good, it knows neither sorrow nor joy in this world."—Tarikhu—s Subuktigin.

কলিকাতা,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
প্রকাশিত।

১৩১১।

কলিকাতা,

৬নং কলেজ-স্কোয়ার,

সাম্য-যন্ত্রে শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

মা!
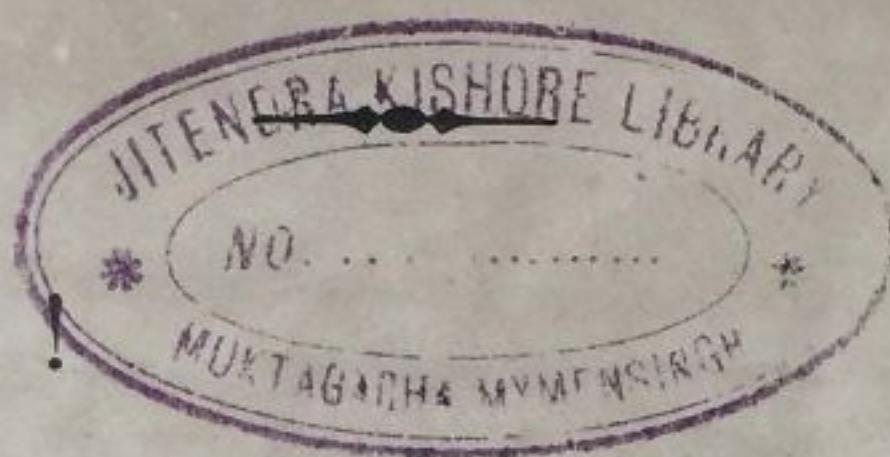
সেবকের অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

কেদারপুর।
৫ই শ্রাবণ,
১৩১১।

ভূমিকা।

ভারতবর্ষে মোগলগণ কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধ দুইশত বৎসর রাজত্ব করেন। মোগল বংশোদ্ভব বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে মোগল শাসনের সূত্রপাত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মোগল সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পানি-পথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পরে দেশ মধ্যে অরাজকতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং মোগল শাসন বিলুপ্ত হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস ঘটনা বৈচিত্র্যে অতি মনোহর। এই ইতিহাসের অনুশীলন করিলে মহৎ জীবনের সাহচর্য্যে হৃদয় প্রশস্ত এবং নানারূপ লোক চরিত্র এবং ঘটনার পর্য্যালোচনায় বিচার শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। যে সকল কারণ পরম্পরায় মোগল সাম্রা-জ্যের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে কার্য্য কারণ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির সার-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। মোগল-ইতিহাস আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, স্বজাতি-প্রেম ও স্বার্থত্যাগই জাতীয় উন্নতির মূল, এবং তাহার অভাবেই জাতীয় অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

অন্য একটি কারণেও মোগল-ইতিহাস আমাদের প্রণিধান যোগ্য। ভারতবর্ষ এখন হিন্দু মোসলমানের দেশ ; এই অধঃপতিত ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন জন্য হিন্দু মোসলমানের সম্মিলন আবশ্যক। কিরূপে হিন্দু মোসলমানকে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা একটি গুরুতর সমস্যা। পরস্পরের ইতিহাস অনুশীলন আমাদের অভীপ্সিত সম্মিলনের

একতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দু মোসলমানের অতীত গৌরব সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতীতি জন্মিলে, সম্মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। হিন্দু যদি জানিতেন যে, মোগল সম্রাট-কুলে প্রজাবৎসল নরপতির অভাব ছিল না, এবং তাঁহারা ভারতবর্ষের উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অধিকাংশ স্থলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মোসলমানের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ ভাবের পরিবর্ত্তে সদ্ভাব দেখা যাইত।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় মোগল রাজত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত পরিমাণে আলোচনা হইতেছে না। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোগল সম্রাটগণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ মাসিক-কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিসাধন বাবু ব্যতীত অন্য কোন বঙ্গীয় লেখক মোগল সম্রাটগণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কোন এক উপলক্ষ্যে আমার মনে মোগল রাজত্ব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার অভিলাষ উপস্থিত হয়। আমার শক্তি সামান্য, ভাষা দরিদ্র এবং লিপি-কৌশল অকিঞ্চিৎকর। তথাপি দুরাশার তাড়নায় আমি ১৩০৭ সাল হইতে "সাহিত্য", "উৎসাহ", "আরতি" ও "বান্ধবে" মোগল সম্রাটগণ সম্বন্ধে সময় সময় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে সেই সকল প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া "মোগল বংশ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি কতিপয় সহৃদয় সুহৃদ হইতে সবিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছি। "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ভাষা বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য অধিকাংশ প্রবন্ধ দেখিয়া দিয়াছেন। দ্বারবঙ্গ নর্থব্রুক স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র-

নাথ নিয়োগী বি, এ, মহাশয় এবং টাঙ্গাইল বালিকা বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয় কোন কোন প্রবন্ধের পারিপাট্য বিধান জন্য যত্ন করিয়াছেন। "বান্ধবের" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় "মোগলের অধঃপতন" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম অংশ দেখিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম ইণ্টারপ্রেটার কাজি জহরুল হক বি, এল, সাহেব প্রথম দুইটি প্রবন্ধের নামবাচক শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মৌলবী আবদুল বাছেদ খাঁ সাহেব মুন্তাখবু-ল-লুবাব নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের কোন কোন স্থানের অনুবাদ করিয়া উক্ত গ্রন্থ হইতে আমার উপকরণ সংগ্রহ করিবার সুবিধা করিয়া দেন। টাঙ্গাইলের উকীল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার মহাশয় আকবর শাহ সম্বন্ধে দুই একটি তত্ত্বের সন্ধান বলিয়া দিয়া বহু পুরাতন দুই খণ্ড ধর্ম্মতত্ত্ব আমাকে অর্পণ করেন। ময়মনসিংহের স্কুল সমূহের সবইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ মহাশয় গ্রন্থের মুদ্রণ জন্য উদ্যোগী হইয়া প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সকল সুহৃদ আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রবন্ধগুলি মাসিক কাগজে প্রকাশিত হইবার সময় সমালোচকগণ অনুকূল মন্তব্য দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের উৎসাহ লাভ করিতে না পারিলে আমি আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

এই গ্রন্থে বহু স্থানে ত্রুটী পরিলক্ষিত হইবে। গ্রন্থকার মফঃস্বলবাসী, এ কারণেও নানা দোষ সংঘটিত হইয়াছে। মফঃস্বলে বসিয়া ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। অনেক সময় যথোপযুক্ত অর্থ ব্যয়

করিয়াও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এজন্য কোন কোন স্থান ইচ্ছানুরূপ ভাবে লিখিত হইতে পারে নাই। প্রুফ দেখার অসুবিধায় বহু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটিয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ সহজেই এই সকল ভুল দেখিতে পাইবেন; এ কারণ আর স্বতন্ত্র সংশোধন পত্র দেওয়া গেল না।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আমি বর্ণিত বিষয় গুলি সত্যানুমোদিত ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই; এক্ষণে পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইলেই সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

কেদারপুর, টাঙ্গাইল।
৫ই শ্রাবণ, ১৩১১ সাল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সংশোধন।

জাহাঙ্গীর শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ১ম লাইনে "অম্বরাধিপতির দুহিতা"র স্থানে "যোধপুরাধিপতির দুহিতা" হইবে।

যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের নাম ।
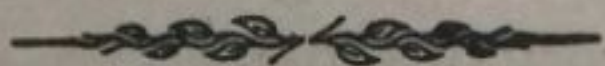
Tabakta Nasiry. (Translated into English by G. H. Raverty.)

Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. VII.

Journals of the Asiatic Society.

Elliot's History of India, Vols. III—VIII.

Riaz-us-Salatin. (Persian Text.)

Stewart's History of Bengal.

Oriental Annuals, 3 Vols.

Todd's Rajsthan.

Wheeler's History of India.

Ain-i-Akbari. (Translated into English by Francis Gladwin.)

Munta Khabu-lLubab. (Persian Text.)

Stanley Lane Poole's Babar.

Dow's History of Hindustan.

Keene's Turks in India.

Akbarnanama. (Translated into English by H. Beveridge.)

Erskine's Babar and Humayun, Vol. I.

Elphinstone's History of India.

Malleson's Akbar.

Malleson's History of Afghanistan.
Stanley Lane Poole's Mediœval India.
R. C. Dutt's Ancient India.
Bernier's Travels.
Orm's Historical Fragments.
Stanley Lane Pool's Aurangzeb.
Marshman's History of India.
Keen's Fall of the Moghul Empire.
Duff's History of the Maharattas.
Cunnigham's History of the Sikhs.
Seir Mutakherin. (Translated into English by Hazi Mustafa)
Beveridge's (A. S.) Emperor Akbar.
P. N. Bose's Hindu Civilisation during British Rule.
সাহিত্যে প্রকাশিত হরিসাধন বাবুর শাহজাহান ও আওরঙ্গজের সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী।
মৌলবী আব্দুল করিম, বি, এ, প্রণীত মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত আর্য্যকীর্ত্তি।
সাধনা, তৃতীয় বর্ষ।
উৎসাহ, ১ম বর্ষ।
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস।
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ভারতের ইতিহাস।
ধর্ম্মতত্ত্ব (পাক্ষিক পত্র, নববিধান সমাজ)।

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

মোগল বংশ।

চেঙ্গিস খাঁ ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ।

উত্তর পশ্চিম এসিয়ার সুবিশাল ভূখণ্ডের সংখ্যাতীত অধিবাসীদিগকে ইউরোপীয়ান ইতিহাসবিদ্‌গণ সাধারণতঃ তুর্কি, তাতার এবং মোগল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ ধর্ম্ম ভাষা ও আচার ব্যবহারে পরস্পর বিরোধী তিনটির অধিক জাতি এবং অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত। যদিও স্মরণাতীত কাল হইতেই তাহারা দক্ষিণ এসিয়ার রত্ন-প্রসূ জনপদ সমূহে দৈব বিপদের ন্যায় পতিত হইয়া দেশ ছারখার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছে, অথবা কোন কোন বিজিত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে ; তথাপি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহাদের কাহারও স্থায়ী অভ্যুদয় এবং প্রবল প্রতাপ সংঘটিত হয় নাই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিম এসিয়ার কোন কোন স্থানের অধিবাসী খলিফা সাম্রাজ্যে প্রথম প্রবেশ লাভ করে। তদবধি তাহারা পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং সভ্যতা লাভ করে। কিন্তু তখনও এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসীই অনুন্নত ছিল। প্রাগুক্ত অভ্যুদয়ের ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পরে চেঙ্গিস খাঁ মোগল জাতির বরলাস বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এসিয়ার সুবিস্তৃত অংশ মথিত করিয়া সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপ কম্পিত করিয়া

তুলেন। তারপর তদীয় পৌত্র হালাকু খলিফা সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। (১)

আমরা চেঙ্গিস খা ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের বিবরণ পাঠক-বর্গকে উপহার দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু এই বিবরণ বিশদ করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

মোসলমান ইতিহাস বিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পয়গম্বর নোয়া সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। মহাত্মা নোয়া শাসন-সৌকার্য্যার্থ আপনার দিগন্ত-বিস্তৃত সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্রত্রয়কে প্রদান করেন।

তদনুসারে তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস আধুনিক চীন, তুর্কিস্থান ও অক্সাস নদী বিধৌত প্রদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া ভলগা নদীর তীরে রাজধানী স্থাপিত করেন। তুর্কি জাতি এই ইয়াফেসকে তাহাদের আদি পুরুষ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে।

ইয়াফেসের আট (কাহারও কাহারও মতে এগার) পুত্র ছিল। ইয়াফেসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম তুর্ক। তুর্ক পিতৃ রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার পূর্ব্বক উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণে অভিষিঞ্চিত ও নয়নাভিরাম শ্যামল ক্ষেত্রে শোভিত সিল-উক নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। তুর্কের অধিকৃত প্রদেশ তাঁহার নামানুসারে তুর্কিস্থান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তদ্দেশবাসিগণ তুর্কি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

---

(১) মোহাম্মদ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশ স্বীয় শাসনাধীন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ খলিফা নামে পরিচিত। তাঁহাদের আধিপত্য সুবিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। প্রথমতঃ মদিনায় খলিফাদের রাজধানী ছিল, তারপর উহা ক্রমান্বয়ে ডামস্কসে ও বোগদাদে স্থানান্তরিত হয়।

তুর্কের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম অলিঞ্জা খাঁ। প্রথমে তাঁহার কোন পুত্রসন্তান হয় না। কিন্তু অবশেষে দুই যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার গৃহ আলোকিত করিয়াছিল। অলিঞ্জা খাঁ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহাদিগকে তাতার খাঁ ও মোগল খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয় বয়সপ্রাপ্ত হইলে স্বরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণপূর্ব্বক জীবনের সায়াহ্নকালে বিশ্রাম-সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হন। ভ্রাতৃদ্বয় রাজ্যলাভ করিয়া একযোগে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন ; কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে তাঁহারা পর-স্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব-স্ব-নামানুসারে তাতার-আই-মাক ও মোগল-আই-মাক নামক দুইটি স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মোগল খাঁর অধস্তন নবম পুরুষ ইল খাঁর সমসময়ে তুর নামক একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। পররাজ্যলোলুপ তুর ইল খাঁকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিবার মনন করেন। তাতার ও মোগল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করিলে, উভয় বংশে পুরুষানুক্রমে শত্রুতা চলিতেছিল। রাজা তুর, ইল খাঁকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তাতারবংশীয় অধিপতি সুঞ্জ খাঁ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। মোগলের একাধিক পুত্র ছিল। তাঁহার জনৈক পুত্র ইগুর নামক এক স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইগুর জাতিও জ্ঞাতিশত্রুবিনাশের জন্য রাজা তুরের দলভুক্ত হইল। রাজা তুর বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ইল খাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মোগল জাতি ইল খাঁর একান্ত অনুরক্ত ছিল ; তাহারা শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বহুসংখ্যক তাতার ও ইগুর যোদ্ধা শত্রুহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিল ; রাজা তুর সসৈন্যে রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। মোগল সৈন্য শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন

করিল। এই সূত্রে মোগলের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। রাজা তুর মোগলদিগকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যেই পলায়ন করিয়াছিলেন। মোগল সৈন্য শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন জন্য আপনাদের সুদৃঢ় অবস্থানভূমি পরিত্যাগ করিয়া বূ্যহভঙ্গ করাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে শত্রুসৈন্য নিশাবসানে অতর্কিতভাবে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। মোগল সৈন্য এই আকস্মিক আক্রমণের গতির প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া শত্রুহস্তে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কেবলমাত্র ইল খাঁর পুত্র কারআন খাঁ ও শ্যালকপুত্র নগুজ খাঁ সস্ত্রীক অন্যত্র ছিলেন বলিয়া শত্রুহস্ত হইতে নিস্তার পান। মোগল খাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ আগুজ স্বীয় পিতৃব্যদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করায় তাঁহারা চীন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুর কর্তৃক সমস্ত মোগলবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং আধুনিক মোগল জাতি আগুজের পিতৃব্যগণ, কারআন খাঁ ও নগুজের বংশোদ্ভব।

রাত্রি সমাগত হইলে এই চারি জন স্ত্রী পুরুষ (কারআন খাঁ ও তাঁহার স্ত্রী, এবং নগুজ ও তাঁহার স্ত্রী) ধন রত্ন ও গোমেষপাল লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা দুরারোহ পথে নিরাপদ স্থানে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক শস্যরাজিসুশোভিত উপত্যকায় উপনীত হইলেন, এবং উহার প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন। এই স্থানে কারআন ও নগুজের বংশ কালক্রমে অত্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করাতে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং তথায় আর স্থানসঙ্কুলন হইল না। আবুল ফজলের মতানুসারে দুই সহস্র বৎসর ও আবুল গাজির মতানুসারে চারি শত বৎসর মোগলগণ এই স্থানে বাস করিয়াছিল।—কোন মত যথার্থ, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। এ জন্য মোগল জাতি ইরগানাকুন্

উপত্যকা (১) (এই উপত্যকায় তাহারা বাস করিতেছিল) পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া ইরগানাকুন উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল, ভূকম্পনে তাহা রুদ্ধ হওয়ায় নূতন পথ আবিষ্কার করিতে তাহাদিগকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহারা নবাবিষ্কৃত পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, লৌহ আকরে উহা রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, মোগলগণ অগ্নিসংযোগে পথ পরিষ্কার করিয়া পৈতৃক রাজ্যে উপনীত হইল। (২) এই সময় মোগলভূমি তাতার-আই-মাক জাতির হস্তগত ছিল। আগন্তুক মোগলগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনর্ব্বার মোগলভূমি অধিকার করেন। মোগল খাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ আগুজের পিতৃব্যবংশীয়গণও চীন রাজ্য হইতে মোগলভূমিতে উপনীত হইয়া কারআত (কারআন) ও হুরলাগিন (নগুজ) মোগলের সহিত সম্মিলিত হইল। মোগলগণের পৈতৃক রাজ্যে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহাদের অন্যতম শাখার অধিনেতৃপদে ইয়ালদাজ খাঁ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবুল ফজলের মতে ইয়ালদাজ খাঁ পারস্যের সুবিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ অধিপতি নোশেরওয়ার

---

(১) The mountains referred to are evidently those mighty ranges towards the sources of Salinga and its upper tributaries. Major H. G. Raverty.

(২) মোগলগণ ইরগানাকুন হইতে বহির্গত হইবার দিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতি বৎসর উৎসব করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে মোগলবংশীয় অধিপতিগণ অগ্নিকুণ্ডে এক খণ্ড লৌহ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া থাকেন। ইরগানাকুন হইতে বহির্গত হইবার সময় মোগলগণ লৌহআকররুদ্ধ পথ অগ্নিসংযোগে পরিষ্কার করিয়াছিল। এই ঘটনার অনুকরণেই মোগল অধিপতিগণ এইরূপ অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু কোন কোন ইতিহাসবেত্তা ইহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চেঙ্গিস খাঁ প্রথমে খিতা রাজ্যে লৌহকর্ম্মকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়াই মোগল অধিপতিগণ ঈদৃশ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

রাজত্বের সময় পৈতৃক বাসভূমি পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন। নোশেরওয়া ৫৩১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। নোশেরওয়ার রাজত্বকালে (খৃঃ ৫৭৮) পয়গম্বর মহম্মদ জন্মপরিগ্রহ করিয়া আরবদেশ পবিত্র করেন। মহম্মদ তাদৃশ ন্যায়পরায়ণ ভূপতির রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করাতে, আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

এই সময় মোগলজাতি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। তাহারা স্ব স্ব প্রধান ছিল, একে অন্যের আধিপত্য স্বীকার করিত না। মৃগয়ালব্ধ মাংস ও অনায়সধৃত মৎস্যই তাহাদের আহার্য্য ছিল। গৃহপালিত ও বন্য পশুর চর্ম্ম ও লোম দ্বারা তাহারা গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া লজ্জা-নিবারণ করিত। ফলতঃ, তখন মোগলগণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; সভ্যতার জ্যোতিঃ তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

ইয়ালদাজ খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জুইনা বাহাদুর পিতৃসিংহা-সনে আরোহণ করেন। জুইনা বাহাদুরের আলানকোওয়া নাম্নী এক সর্ব্বগুণসম্পন্না রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুবুন এই কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। পিতার জীবদ্দশায় এই বিবাহের ফলস্বরূপ দুইটি পুত্রসন্তান লাভ করিবার পর আলানকোওয়া বিধবা হন। জুইনা বাহাদুরের মৃত্যুর পর আলানকোওয়ার পুত্রদ্বয় তদীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া আলানকোওয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

আলানকোওয়া পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। একদা রাত্রিকালে তিনি নিদ্রাভিভূতা ছিলেন। তখন এক অপূর্ব্ব রশ্মিমালা তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করাতে তিনি সসত্ত্বা হইলেন।

এই সংবাদ প্রচারিত হইলে মোগলগণ তৎকথিত বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতে লাগিল। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্টকাল সমাগত হইলে আলানকোওয়া এককালে তিনটি পুত্র প্রসব করিলেন। কালক্রমে এই পুত্রত্রয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ বুজঞ্জর খাঁ মোগলিস্থানের একাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। (১)

বুজঞ্জর খাঁর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষের নাম তোমনাই খাঁ। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল। দ্বিতীয়টির দুই যমজ পুত্র ছিল; একের নাম কাবাল ও অন্যের নাম কাজুলি।

একদা কাজুলি রাত্রিযোগে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে ক্রমান্বয়ে তিনটি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র নির্গত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। চতুর্থবার একটি অত্যাশ্চর্য্য উজ্জ্বল নক্ষত্র তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া আলোকচ্ছটায় সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিল, এবং তাহার অত্যুজ্জ্বল প্রভায় অন্যান্য তারকা উজ্জ্বলতর হইল। এইরূপ প্রভাদীপ্ত তারকামালা দ্বারা আকাশের প্রত্যেক বিভাগ আলোকিত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের অন্তর্দ্ধানের পরও পৃথিবী সমুজ্জ্বল রহিল। ইহার পর কাজুলির নিদ্রাভঙ্গ হইল। অত্যল্প কাল পরেই তিনি পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হইলেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন, এবার তাঁহার নিজের বক্ষঃস্থল হইতে সাতটি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে

(১) এই অসম্ভব গল্প কেন কল্পিত হইয়াছিল? সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেজর র‍্যাভারটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ইতিহাসবেত্তা এই ঘটনা বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুজঞ্জর খাঁর বংশেই চেঙ্গিস খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি আপনাকে দৈববলশালী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। উত্তরকালে যে সময় চেঙ্গিস খাঁ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন দেবাশ্রিত বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য, এইরূপ অসম্ভব গল্প কল্পিতহইয়াছিল।

বহির্গত হইয়া অদৃশ্য হইল। অষ্টমবার একটি বৃহদায়তন নক্ষত্র বহির্গত হইয়া আলোকচ্ছটায় সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত করিল। তাহার পর এই বৃহদায়তন নক্ষত্র হইতে কতিপয় ক্ষুদ্র তারকা সমুদ্ভূত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল সমুজ্জ্বল করিল। এজন্য নক্ষত্ররাজ অদৃশ্য হইলেও এই ক্ষুদ্র তারকামালার প্রভায় সমগ্র পৃথিবী পূর্ব্ববৎ সমুজ্জ্বল রহিল। রজনীর অবসান হইলে কাজুলি খাঁ পিতৃসমীপে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, "কাবাল খাঁ, তোমার বংশীয় তিন জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিবেন; তাহার পর যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইবেন, এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রত্যেকেই এক এক প্রদেশে রাজত্ব করিবেন। কাজুলি বাহাদুর, তোমার বংশে সাত জন সুশাসক ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিবেন; তাহার পর যিনি আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার আধিপত্য সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর বিস্তার লাভ করিবে, এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যেও প্রত্যেকেই পৃথিবীর এক এক বিভাগে রাজ্যসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন।" এই ব্যাখ্যা শেষ হইলে কাবাল খাঁ ও কাজুলি বাহাদুর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কাবাল ও তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিবেন, এবং কাজুলি বাহাদুর ও তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। (১) তদনুসারে তোমিনাই খাঁর মৃত্যুর পর কাবাল খাঁ রাজপদে ও কাজুলি খাঁ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

---

(১) সুপ্রসিদ্ধ এস্‌ক্রাইন সাহেব বাবর ও হুমায়ুন নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তৈমুরলঙ্গ চেঙ্গিস খাঁর বংশধরগণ কর্তৃক শাসিত রাজ্যে আবির্ভূত হন। তৈমুরলঙ্গ রাজক্ষমতার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, আপনাকে চেঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করিতে পারিলে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পরে তৈমুরলঙ্গ

কাবাল খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া মোগল জাতির বিভিন্ন শাখা তাঁহার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এই সময় মোগলাধিকৃত রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে খিতা রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তত্রত্য অধিপতি আলতান খাঁ কাবাল খাঁর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার বাসনায় তাঁহাকে স্বরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। কাবাল খাঁ খিতা রাজ্যে উপনীত হইলে তাঁহাকে আলতান সসম্মানে ও সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কাবাল খাঁ মত্ততাবস্থায় কোন দুষ্কার্য্য করাতে আলতান খাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শিরস্ত্রাণ ও কোমরবন্ধ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। কাবাল খাঁ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত সহজে কাবালকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারিষদবর্গ আলতান খাঁর নিন্দা করিতে লাগিলেন; এ জন্য তিনি তাঁহার অতিথিকে পুনর্ব্বার রাজধানীতে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবাল খাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। আলতান খাঁ তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কাবাল সানজুতি নামক জনৈক বন্ধুর শিবিরে বিশ্রাম করিতেছিলেন; এমন সময় সৈন্যদল তাঁহার নিকট উপনীত হইল। কাবাল খাঁ তাহাদের সঙ্গে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সানজুতি

জন্মগ্রহণ করেন; এই সময়ের মধ্যে চেঙ্গিস খাঁর বংশীয়গণ সংখ্যাধিক্যবশতঃ নানা স্থানে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির পক্ষে তাঁহাদের স্বশ্রেণীভুক্ত হওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু পুরুষানুক্রমে চেঙ্গিসবংশীয়গণের সহিত সংস্রবের বিষয় প্রচার করিলে জনসাধারণ সহজেই তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিবে, এবং তাহাতে তাঁহার গন্তব্য পথও সুগম হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তৈমুরলঙ্গ এই গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার বংশীয়গণের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংসৃষ্ট বলিয়া পরিচিত করেন। কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত চতুর্থ নক্ষত্র চেঙ্গিস খাঁর ও কাজুলি খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত অষ্টম নক্ষত্র তৈমুরলঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস সূচিত করিয়াছিল।

তাঁহাকে নিবারণ করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব প্রদান করিলেন। কাবাল এই বন্ধুর সাহায্যে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া আলতান খাঁর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। আলতান খাঁর প্রেরিত সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মোগলিস্থানে উপনীত হইলে, রাজাজ্ঞায় তরবারিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই সময় কাবাল খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওকিনবরকাক দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন; তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকে মোগল জাতির চিরশত্রু তাতারগণের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলতান খাঁর নিকট সমর্পণ করিল। আলতান খাঁ নির্দ্দোষ রাজকুমারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া কাবাল খাঁর দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরেই কাবাল খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র কুবিলা খাঁ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন; এবং ভ্রাতৃহন্তাকে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে খিতা রাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কুবিলা খাঁ তুমুল যুদ্ধে শত্রুসৈন্য পরাস্ত করিয়া অপরিমেয় ধনরত্ন লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

কুবিলা খাঁ লোকান্তরিত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরতান বাহাদুর (পূর্ব্বপুরুষগণের উপাধি খাঁ ছিল, ইনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করেন) রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। বরতান বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অত্যল্পকাল মধ্যেই কাজুলি বাহাদুর দেহপরিত্যাগ করিলেন, এবং পূর্ব্বনিয়মানুসারে তদীয় পুত্র ইরদম মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইদরম মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া বরলাস (বরলাস অর্থ—বীরপুরুষ ও সদ্বংশজাত) উপাধি গ্রহণ করিয়া একটি অভিনব মোগল শাখার (বরলাস বংশের) প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বরতান বাহাদুর কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় পুত্র এয়াসুক

বাহাদুর পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরেই ইরদম-সি-বরলাস প্রাণপরিত্যাগ করিলেন, এবং তদীয় পুত্র সুগুজিজান তৎস্থলাভিষিক্ত হইলেন। এয়াসুক বাহাদুর স্বীয় মন্ত্রী সুগুজিজানের সাহায্যে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চিরশত্রু তাতারদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলোনবুল-দাগে (১) ফিরিয়া আসিলেন। এয়াসুক বাহাদুর প্রধানতঃ এই স্থানে অবস্থান করিতেন। তিনি দিলোনবুলদাগে উপনীত হইলে তদীয় প্রধানা মহিষী উলোনআওকা ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম তমুরচি। কিন্তু উত্তরকালে এই পুত্র চেঙ্গিস খাঁ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুগুজিজান নবজাত শিশুর অঙ্গে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিয়া নির্দ্দেশ করিলেন যে, কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র বহির্গত হইয়া ইঁহারই জন্ম সূচিত করিয়াছিল।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দে এয়াসুক বাহাদুর দেহত্যাগ করিলে তদীয় ত্রয়োদশ-বর্ষবয়স্ক পুত্র তমুরচি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তমুরচির পিতৃসিংহাসনে আরোহণসময়েও সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ মোগলিস্থানে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করে নাই। তখনও তাহারা পশুপালক ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য মোগলিস্থানের এক এক অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহারা শীত গ্রীষ্ম অথবা পালিত পশুর আহার্য্য তৃণের প্রাচুর্য্য বা অল্পতা অনুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবারবর্গ, পশুপাল ও বাসগৃহ সহ স্থানান্তরিত হইত। এজন্য তাহারা পটবাস বা স্থানান্তরিত করিবার উপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। অশ্ব, গো, ও মেষপালই

(১) রুসিয়ার সীমান্তপ্রদেশে উত্তর মঙ্গোলিয়ায় ওনন নদীর তীরে অবস্থিত।

তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি ছিল। দুগ্ধ ও পালিত পশুর মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। কিন্তু মোগলগণ পালিত পশু সহসা হনন করিত না। তাহারা কৃষিকার্য্যের তাদৃশ অনুরাগী ছিল না, বরং যে সকল প্রতিবাসী স্থায়িভাবে অবস্থান করিত, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত। সন্তানপালন, খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ও অন্যান্য গৃহকার্য্যের ভার স্ত্রীলোকের প্রতি ন্যস্ত ছিল। উন্মুক্ত স্থানে বাস করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে অধিকাংশ সময় যাপন করিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া, এবং শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সশস্ত্রভাবে অবস্থান করিয়া তাহারা কষ্ট সহিষ্ণু ও বীর্য্যবান হইয়াছিল। তাহাদের রাজ্যশাসনপ্রণালী patriarchal ছিল ; সমগ্র সম্প্রদায় বা জাতি এক মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাহারা সানন্দে কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে বংশানুক্রমে অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিত। কিন্তু বিভিন্ন শাখার আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন স্বতন্ত্র আচারব্যবহার বা অধিনেতৃগণের ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্যনিবন্ধন স্বতন্ত্র প্রণালী অনুসৃত হইত। কোন কোন অধিনেতা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ অধিনেতৃগণ আপন আপন সম্প্রদায়স্থ বিশিষ্ট পরিবারসমূহের প্রধান ব্যক্তিগণের পরামর্শ-অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার সময় সমগ্র সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করাই নিয়ম ছিল। আত্মকলহ উপস্থিত হইলে অক্‌সক্‌লাসগণ (১) প্রাচীন প্রথানুসারে তাহার বিচার করিতেন।

২।

এই সময় মোগল ও তাতার জাতি বহুশাখায় বিভক্ত ছিল। তুর্কি-

---

(১) The Turks and Afghans call the leading men who form a sort of councillors in the tribe Ak saklas white (grey) beards.

জাতি হইতে মোগল ও তাতার ব্যতীত আরও অসংখ্য বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সকল বংশও আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। মোগল, তাতার ও তুর্কিজাতীয় অন্যান্য বংশে একাত্তর জন হাকিম অথবা অধিনেতা আধিপত্য করিতেছিলেন। প্রত্যেক অধিনেতা এক বা ততোধিক শাখার শাসন করিতেন। মোগলবংশের অন্যতম শাখার নাম নায়রুন ছিল। এয়াসুক বাহাদুরের আধিপত্য নায়রুন মোগলগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এ জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর কেবলমাত্র তাহারাই তদীয় পুত্র তমুরচিকে অধিনেতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অমাত্য সুগুজিজান লোকান্তরিত হইলে তদীয় কিশোরবয়স্ক পুত্র কারসার নোয়ান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। নায়রুন মোগলগণ দুই জন কিশোরবয়স্কের হস্তে তাঁহাদের শাসনভার অর্পিত দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া তানজিউত নামক মোগলগণের সঙ্গে মিলিত হইল। এই সময় নায়রুন মোগলগণ চল্লিশ হাজার পরিবারে বিভক্ত ছিল। ইহাদের অধিকাংশই অপরিণতবয়স্ক তমুরচিকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদলে মিলিত হইল; কেবলমাত্র কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ সহস্র পরিবার তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিল না। চতুর্দ্দিক হইতে বিপদরাশি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। এইভাবে সতের বৎসর অতিবাহিত হইলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। যে সকল নায়রুন মোগল-পরিবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুসঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল পরিবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে তাঁহার দল যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিল। অতঃপর তিনি আরও কতিপয় মোগল শাখার মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু তমুরচির ভাগ্যলক্ষ্মী দীর্ঘকাল সুপ্রসন্ন রহিলেন না। নায়রুন মোগলগণ পুনর্ব্বার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে তানজিউত মোগল-গণের অধিপতি তুরকুতে তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তমুরচি দৈবাৎ শত্রুহস্তে পতিত হইয়া বন্দী হইলেন। তিনি বন্দিভাবে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া সুযোগ-ক্রমে পলায়ন করিলেন, এবং শত্রুগণের আবাসভূমির অনতিদূরবর্ত্তী একটি হ্রদে সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া কেবলমাত্র নাসিকাগ্রভাগ জলো-পরি রক্ষাপূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিলেন। তাঁহার পলায়নবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে তুরকুতে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করি-লেন। সুরগানসিরাহ নামক জনৈক তানজিউত মোগল তমুরচিকে এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় পতিত দেখিয়া দয়াপরবশ হইল, এবং রাত্রি সমাগত হইবামাত্র তাঁহাকে হ্রদ হইতে উদ্ধার করিয়া একখানি মেষ-লোমপূর্ণ শকটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে তুরকুতের প্রেরিত সৈন্যদল সন্দিহান হইয়া সুরগানসিরাহের গৃহে উপনীত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বহু অনুসন্ধা-নেও তমুরচিকে প্রাপ্ত না হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে প্রস্থান করিল। তমুরচি শত্রুদলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে সুরগানসিরাহ-প্রদত্ত অসিতস্কন্ধ অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। এই ঘটনা ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। (১)

তমুরচি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় আধিপত্যবিস্তার করিবার কল্পনায় পুনর্ব্বার যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। ইহার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন শত্রুদল তাঁহাকে সমূলে বিনাশ

---

(১) এই ঘটনা হইতে মোগলগণ অসিত-স্কন্ধ অশ্বকে পূজার্হ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তমুরচি উত্তরকালে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলে স্বীয় প্রাণদাতা সুরগানসিরাহের বংশধরগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

করিবার জন্য একত্র মিলিত হইল। তমুরচি শত্রুপক্ষকে একান্ত প্রবল ও বহুসংখ্যক দেখিয়া তাহাদের গতিরোধ করা অসাধ্য বিবেচনায় পিতৃবন্ধু আওয়াঙ্গ খাঁর শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদীয় অমাত্য কারসার নোয়ান তমুরচির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; তিনিও তাঁহার সঙ্গে আওয়াঙ্গ খাঁর রাজ্যে গমন করিলেন। আওয়াঙ্গ খাঁ করাএয়াত মোগল শাখার অধিপতি ছিলেন। করাএয়াত মোগলগুণ জনসংখ্যায় অধিক ছিল। আওয়াঙ্গ খাঁ সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি ছিলেন। তিনি খিতাধিপতির সঙ্গে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তমুরচি ও কারসার এই রাজ্যে উপনীত হইলে সাদরে গৃহীত হইলেন।

এখানে তমুরচির অবস্থা ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। আওয়াঙ্গ খাঁ প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। তমুরচি তাঁহার এতদূর প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তমুরচি আট বৎসর কাল আওয়াঙ্গ খাঁর অধীনে অবস্থান করিয়াছিলেন; এই সময়ের মধ্যে তিনি আশ্রয়দাতার অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন ও তাঁহার পক্ষে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

এই ভাবে আট বৎসর অতিবাহিত হইলে, তমুরচির সৌভাগ্যসন্দর্শন করিয়া আওয়াঙ্গ খাঁর অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তাঁহারা তমুরচির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উপায়উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন। তমুরচি তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অত্যল্পকালমধ্যেই আওয়াঙ্গ খাঁর পুত্র সনগুণের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আওয়াঙ্গ খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তমুরচি তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন। আওয়াঙ্গ খাঁ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তমুরচির শত্রুদলের এতদূর বিরাগভাজন

হইয়াছিলেন যে, তাহারা আওয়াঙ্গ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল; তথাপি তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। আওয়াঙ্গ খাঁ ঈদৃশ প্রীতিভাজন আশ্রিতকে বিনাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু পুত্র কর্তৃক অনবরত উত্তেজিত হইয়া অবশেষে তমুরচিকে বন্দী করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তমুরচি আসন্ন বিপদের বিষয় দৈবাৎ অবগত হইয়া কারসার নোয়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তদনুসারে পরিবারবর্গকে বানজোনাহুবোনাক নামক নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া রাত্রিকালে অনুচরগণ সহ পলায়ন করিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই আওয়াঙ্গ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বাসভবন শূন্য দেখিয়া একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। আওয়াঙ্গ খাঁ তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। উভয় দলে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল; অনুসরণকারী দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

অতঃপর তমুরচি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় তমুরচির বয়ঃক্রম উনপঞ্চাশ বৎসর তমুরচি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আওয়াঙ্গ খাঁর শরণাপন্ন হইলে নায়রুণ মোগলগণ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা অধিপতিকে প্রত্যাগত দেখিয়া পুনর্ব্বারতাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল। তমুরচি রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে আরও কতিপয় মোগল বংশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

তিনি ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া বিপুল সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক আওয়াঙ্গ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের অবসানকালে কারসার নোয়ান আওয়াঙ্গ খাঁর অশ্বকে শরাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। তখন আওয়াঙ্গ খাঁ ভয়ব্যাকুলচিত্তে রাজমহিষী ও

রাজকন্যাদিগকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র সহ পলায়ন করিলেন। তমুরচি এই ভাবে আওয়াঙ্গ খাঁকে বিধ্বস্ত করিয়া সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আওয়াঙ্গ খাঁর ন্যায় পরাক্রমশালী অধিপতিকে পরাস্ত করাতে তমুরচির যশোরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; এজন্য কতিপয় মোগল শাখা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল, এবং তিনি খাঁ উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তমুরচি পার্শ্ববর্ত্তী মোগল, তাতার ও তুর্কিজাতীয় অন্যান্যবংশীয়দের অধিকৃত স্থানসমূহ হস্তগত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন। ন্যূনাধিক চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি বহুসংখ্যক অধিপতিকে পরাস্ত করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইলেন। তাঁহার উচ্চাশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে তমুরচি যে সকল বিভিন্নশাখাসম্ভূত মোগলগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিলেন। তাহার পর তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট আপনাকে ভবিষ্যদ্দর্শী বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি কখনও কখনও স্বর্গে নীত হইয়া থাকেন। সরল বিশ্বাসী মোগলগণ এ কথায় প্রত্যয় করিল। তমুরচির বক্তব্য শেষ হইলে কুকজু নামক তাঁহার জনৈক অন্তরঙ্গ (১) গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আমি গত রাত্রিতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। একজন রক্তবর্ণ পুরুষ ধূসরবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, তুমি এয়াসুক বাহাদুরের পুত্রকে বলিবে যে,

---

(১) তমুরচির মাতা এয়াসুক বাহাদুরের মৃত্যুর পর মিঙ্গলিক নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ কুকজু জন্মগ্রহণ করেন।

আর কেহ তাঁহাকে তমুরচি নামে সম্বোধন করিবে না; অতঃপর সকলেই তাঁহাকে চেঙ্গিস খাঁ নামে অভিহিত করিবে। তুমি চেঙ্গিস খাঁকে আরও বলিও যে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে পৃথিবীর অধিকাংশ সমর্পণ করিয়াছেন।" সমাগত জনমণ্ডলী এই স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর (১) নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

চেঙ্গিস খাঁ যে গূঢ় উদ্দেশ্যে এই দরবার আহ্বান করিয়া কুকুজু দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট দৈববাণীর প্রচার করেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজ্যময় প্রচারিত হইয়া পড়িলে সরল বিশ্বাসী মোগলগণ বিশ্বাস করিল যে, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্যই চেঙ্গিস খাঁ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ চেঙ্গিস খাঁ নানা স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন, কারণ প্রাগুক্ত কৌশলে তদীয় সৈন্য অমানুষিক সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই সময়ে চেঙ্গিস খাঁ উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। পশ্চিমে ঘোর খাঁর অধিকৃত রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে খিতা অথবা উত্তর চীনের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে তাঁহার আধিপত্য অল্লাধিক স্থাপিত হইয়াছিল।

অধিকাংশ মোগল-বংশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাতে, তিনি পর রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে খিতা রাজ্য তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে তদানীন্তন খিতাধিপতি (২) তাঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ

(১) চেঙ্গিস খাঁ শব্দের অর্থ, সম্রাট।

(২) যিনি চেঙ্গিস খাঁর পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আলতান খাঁ। চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়কালে যিনি খিতারাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার নামও আলতান খাঁ। খিতাধিপতিগণের উপাধি আলতান খাঁ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ভ্রাতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। চেঙ্গিস খাঁ খিতাধিপতির পূর্ব্বপূরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার ব্যপদেশে মোগলগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন। তাহার পর তিনি খিতাধিপতি আলতান খাঁর দরবারে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। খিতাধিপতি চেঙ্গিস খাঁর দূতকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিলেন। রাজদূত প্রত্যাগত হইলে চেঙ্গিস খাঁ খিতারাজ্য মথিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আলতান খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া শত্রুর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোগলাধিপতি খিতারাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রকাশ্য পথ শত্রু কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া গুপ্তপথের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং অচিরাৎ তাদৃশ পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে মোগলপরিবারদিগকে সমবেত করিলেন। এই স্থানে তাঁহার আদেশক্রমে মাতা পুত্র ও স্ত্রীপুরুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল। তিন দিন পর্য্যন্ত কেহই অন্ন জল গ্রহণ করিল না, এবং স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই অনাবৃতমস্তকে অবস্থান করিল। চেঙ্গিস খাঁ স্বয়ং পটগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গলদেশ রজ্জুবদ্ধ করিলেন, তিন দিন পর্য্যন্ত আর বহির্গত হইলেন না। এই তিন দিন সমবেত জনমণ্ডলী ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতেছিল। চেঙ্গিস খাঁ চতুর্থ দিন প্রত্যূষে পটগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, "টিঙ্গরি (ঈশ্বর) আমাকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছেন। এখন আমরা আলতান খাঁকে শাস্তি দিবার জন্য অভিযান করিব।" তাহার পর তিন দিন মোগলগণ ভোজাদি উৎসবে মত্ত রহিল।

এই তিন দিন অতিবাহিত হইলে চেঙ্গিস খাঁ সসৈন্যে গুপ্ত পথে

খিতারাজ্যে প্রবেশ করিয়া তমগজ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। আলতান খাঁ চেঙ্গিস খাঁর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন; কারণ, তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, শত্রুর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য যে ত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। এ দিকে আলতানের প্রেরিত সৈন্যদল তমগজ প্রদেশ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে অবগত হইয়া যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না, তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইল, অথবা জীবন বিসর্জ্জন করিল।

চেঙ্গিস খাঁ তমগজ ও তেঙ্গেত প্রদেশ অধিকার করিয়া খিতারাজ্যের রাজধানী তমগজ নগরের দ্বারদেশে (১) উপনীত হইলেন। তিনি তমগজ নগর অবরোধ করিলে আলতান খাঁ বিপুলবিক্রমে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, আলতান খাঁ নগর রক্ষার জন্য সে সমস্তেরই অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই নগর রক্ষা করিতে পারিলেন না। চারি বৎসর পরে তমগজ নগর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয় ও মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক খিতারাজ্য বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে খারিজমাধিপতি (২) সুলতান মোহাম্মদ প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। রাজদূত আলতান খাঁর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে একটি শুভ্রবর্ণ

(১) He then turned his face towards the Altan Khan's capital and metropolis of Khita which in the Tarikh-i-Jahangir Habib-us-Siyar, &c is named Chingdu or Chinghtu, where the Altan Khan then was. This must be our author's city of Tamghaj, that is to say, the chief city of the country of Tamghaj.—Major H. G. Raverty.

(২) আধুনিক খিভার প্রাচীন নাম খারিজম।

সমুচ্চ স্তূপ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাজদূত উহাকে তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত বলিয়া বিবেচনা করিলেন; কিন্তু তাঁহার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মোগল-সংঘর্ষণে যে সকল সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহাদের কঙ্কালরাশি তাদৃশ সমুচ্চ স্তূপা-কার ধারণ করিয়াছে। রাজদূত তথা হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, রাজপথ বহুদূর পর্য্যন্ত মৃত সৈন্যের বসায় চর্চ্চিত রহিয়াছে! পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়া-ছিল। একজন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মৃতদেহরাশি নিঃশেষ করিতে মাংসাশী পশুপক্ষীর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজদূত রাজধানীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, দুর্গমূলে নরকঙ্কালরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ষষ্টিসহস্র বালিকা ও কুমারী মোগলের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহাদের কঙ্কালরাশি তথায় সজ্জিত রহিয়াছে।

রাজদূত চেঙ্গিস খাঁর দরবারে উপনীত হইলে তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। চেঙ্গিস খাঁ সুলতানকে উপহার দিবার জন্য নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বন্ধুতার প্রার্থী হইলেন, এবং উভয় রাজ্যে অবাধে বাণিজ্য চলিতে পারে, এই মর্ম্মে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তারপর স্বীয় দূত সহ স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম ও অন্যান্য নানাবিধ বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ পঞ্চ শত উষ্ট্র বাণিজ্যার্থ খারিজম রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। খারিজমাধিপতি সুলতান অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই বণিকদলকে সমূলে বিনষ্ট করিলেন। কেবলমাত্র একজন উষ্ট্রচালক দৈবাৎ শত্রু-হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া খিতারাজ্যে গমন করিয়া সুলতান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দুষ্কার্য্যের সংবাদ প্রদান করিল। এই শোচনীয় সংবাদ

অবগত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং উহাতে সমগ্র খারিজম সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া যায়।

চেঙ্গিস খাঁ সুলতানকে শাস্তি দিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চীন, তুর্কিস্থান ও তমগজ হইতে অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খারিজম সাম্রাজ্য ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মহা-সমারোহে যাত্রা করিলেন। (১)

চেঙ্গিস খাঁ সর্ব্বপ্রথমে সুপ্রসিদ্ধ উত্রার নগরীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। মোগল সৈন্য বনসঙ্কুল দুরতিক্রম্য সুদীর্ঘ পথ বহু কষ্টে অতিবাহিত করিয়া মোগল সীমান্ত প্রদেশ পরি-ত্যাগের তিন মাস পরে শক্ররাজ্যে উপনীত হইল। তাহাদের আগমনে রাজ্যের সমগ্র অধিবাসী সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল, এবং স্বদেশ রক্ষা করি-বার জন্য প্রাণপণ করিল। ধর্ম্মবিশ্বাসী অধিবাসিবর্গ ঈশ্বরানুগ্রহলাভ জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। (২) বীর্য্য-

(১) Chengiz Khan issued commands so that the forces of Turkistan, Chin and Tamghaz assembled. Six hundred banners were brought out, and under each banner were one thousand horsemen, and six hundred thousand horses were assigned to the Bahadur : they call a warrior, Bahadur. To every ten horsemen three heads of tukli sheep were given with orders to dry them, and they took along with them, an iron cauldron, and a skin of water, and the host proceeded on its way.

(২) খারিজম রাজ্যের অধিবাসিগণ নাশিইর দুর্গ অধিকৃত হইবার সময় যেরূপ ঈশ্বরবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি। "Three months prior to the occurrence of the capture of fortress. and their attainment of the glory of martyrdom, the whole of them, by mutual consent donned deep blue (mourning) garments, and used to repair daily to the great masjid of the fortress and would repeat the whole Kuran, and condole and mourn with each other ;

শালী সৈন্যগণ পথশ্রমে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হইয়া অমিতপরাক্রমে শত্রু-হননে প্রবৃত্ত হইল। খারিজম রাজ্যের চতুর্দ্দিকে একবারে বেড়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল; তাহাতে অসংখ্য নরনারীর সুখ শান্তি চির-কালের জন্য ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। স্বদেশের জন্য মোসল-মানগণ রণক্ষেত্রে অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, ও শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদ-র্শন করিতে লাগিল। (১ কিন্তু এত করিয়াও তাহারা মোগলের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না; তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যা-চারে ও উৎপীড়নে সৌষ্ঠবশালী অমিতধনধান্যপূর্ণ খারিজম সাম্রাজ্য মরু-ভূমিতে পরিণত হইল। কিরূপে নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ মোগলের অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে ছারখার হইয়াছিল, বিস্তৃতভাবে তাহার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সে কাহিনীর আদ্যন্ত একই রূপ ঘটনায় পরিপূর্ণ। মোগল সৈন্য যে প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই অধিবাসিগণ বালবৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে তরবারিমুখে নিক্ষিপ্ত, যোজন-ব্যাপি শস্যক্ষেত্র শত্রুর তাণ্ডবে তৃণশূন্য, সুদৃশ্য প্রাসাদমালাশোভিত

---

and. after doing all this, they used to pronounce benediction on and farewell to each other, and assume their arms, and engage in holy warfare with the infidels."

(১) মোগলগণ আশইয়ার দুর্গ অবরোধ করিলে দুর্গবাসিগণ সার্দ্ধ এক বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই সময় খাদ্যাভাবে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। তাহারা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা তাদৃশ কষ্ট সহ্য করাও বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত। ক্রমশঃ তাহাদের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহারা মৃত অথবা নিহত ব্যক্তির মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতে বাধ্য হয়। এই সময় দুর্গ মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার মাতা ও একজন ক্রীতদাসী বর্ত্তমান ছিল। তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উক্ত স্ত্রীলোক তাহাদের মাংস বিক্রয়ার্থ শুষ্ক করিয়াছিল; এই শুষ্ক মাংস বিক্রয় দ্বারা আড়াই শত স্বর্ণমুদ্রা (Gold dinirs) লাভ হইয়াছিল। সার্দ্ধবৎসরাধিক কাল গত হইলে কেবল-মাত্র ত্রিশ জন দুর্গবাসী অবশিষ্ট ছিল; তখন তাহারা আর গত্যন্তর না দেখিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করে।

সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত ও অসংখ্য নরনারী দাস-বিপণিতে বিক্রীত হইবার জন্য অবরুদ্ধ হইত। (১) কথিত আছে যে, মোগলের হস্তে অগণ্য মোসলমান বন্দী হওয়াতে তাহারা চেঙ্গিস খাঁর জন্যই বিশেষভাবে দ্বাদশ সহস্র কুমারি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল; ইহারা সৈন্যের পশ্চাতে পদব্রজে গমন করিত।

১২১৮ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ খারিজমাধিপতির দুর্ব্যবহারে বিচলিত হইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য মাওরাওন্নাদার প্রদেশে উপনীত হন; তত্রত্য অধিবাসিগণ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তিনি আমু (আক্সাস্) নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাল্কের বিরুদ্ধে আপনার ভুবনবিজয়ী তরবারি উদ্যত করেন। তদীয় পুত্র তুলি খাঁ বিপুল বাহিনী সহ খোরাসানে প্রেরিত হন, এবং ইরাণ ও তুরাণ বিজিত হইবার পর মোগল সৈন্য বাল্ক হইতে তালিকানে (তালিকান খোরাসানের একটি নগর, বাল্কের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত) পদার্পণ করে। এ স্থান হইতে চেঙ্গিস খাঁ খারিজমের শাহ-জাদা জেলাল উদ্দীন মঙ্গবারিকে সমুলে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার

---

(১) চেঙ্গিস খাঁ কর্ত্তৃক বিশাল ভূখণ্ড বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি; ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ উদ্দীন গল্পটি কাজি ওয়াহিদ উদ্দীনের নিকট শুনিয়াছিলেন। এই কাজি চেঙ্গিস খাঁর অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন; এবং এই গল্পের বিষয় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই সংঘটিত হইয়াছিল। "When he (Chengiz Khau) enquired of me, will not a mighty name remain behind me (in the world through taking vengeance upon Sultan Mahamad, Kharwarazm Shah), I bowed my face to the ground, and said : 'If the Khan will promise the safety of my life I will make a remark.' He replied : 'I have promised thee its security.' I said : A name continues to endure where there are people, but how will a name endure when the Khan's servants martyr all the people and massacre them, for who will remain to tell the tale ?"

পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পথের উভয় পার্শ্বস্থ দেশসমূহকে মন্থন করিতে করিতে ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুনদের তটদেশে উপনীত হন।

চেঙ্গিস খাঁ খারিজম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। লক্ষ্মণাবতী ও কামরূপের পথে চীন দেশে গমন করিবার কল্পনাতেই তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। চেঙ্গিস খাঁ কোনও গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা করিতেন। এবারও তিনি ঈশ্বরের সম্মতিসূচক লক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া যে জয়মাল্যে সুশোভিত হইতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে কোনও নিদর্শন প্রকটিত না হওয়াতে, তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেছিলেন না। এ জন্য ভারতসীমান্তে চেঙ্গিস খাঁর কালবিলম্ব হইতেছিল; এমন সময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার দীর্ঘ-কাল অনুপস্থিতিনিবন্ধন সমগ্র তেঙ্গিত ও তমগজ প্রদেশ সহ চীন রাজ্য বিদ্রোহ-পতাকা উড্‌ডীন করিয়া মোগলের শাসনশৃঙ্খল উন্মোচন করিতে উদ্যত হইয়াছে। চেঙ্গিস খাঁ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাকুল-চিত্তে পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করি-লেন। তাঁহার কুসংস্কার হেতু ভারতবর্ষ অব্যাহতি লাভ করিল।

চেঙ্গিস খাঁ একাদশ বৎসর খারিজম সাম্রাজ্যের বিজয়ে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। রাজধানী হইতে যাত্রাকালে তাঁহার বয়স পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল; তাঁহার সমুন্নত দেহ, বলিষ্ঠ গঠন ও তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী দর্শন করিলে তাঁহাকে যুবাপুরুষ বলিয়াই ভ্রম জন্মিত। কিন্তু বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধে নিরত থাকিয়া অবিরাম পরিশ্রমে তাঁহার লৌহকীলকসদৃশ সুদৃঢ় শরীরও অবশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনাভিলাষী বীরপুরুষ তরবারিহস্তে শনৈঃ শনৈঃ পথ

অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতৃপুরুষ অন্যরূপ বিধান করিয়াছিলেন; স্বদেশে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধপথে তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া শয্যার আশ্রয় লইলেন।

চেঙ্গিস খাঁ স্বপ্নে আপনার আসন্নমৃত্যু দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পুত্রত্রয়কে (১) নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা পিতার আহ্বানে সমবেত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রাণাধিক পুত্রগণ, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত; ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাদের জন্য সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছি। আমার সাম্রাজ্য সুবিশাল, ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে। তোমরা কাহাকে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচনা কর?" তাঁহারা নতজানু হইয়া উত্তর করিলেন, "আমাদের পিতা সাম্রাজ্যেশ্বর, আমরা তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার আজ্ঞা আমাদের শিরোধার্য্য।" চেঙ্গিস খাঁ বলিলেন, "মন্ত্রি কারসার বহুদর্শী ও রাজনীতিবিশারদ; তাঁহার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস, আমি তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার অভিমতানুসারেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিব।" তারপর তিনি কারসারের মত গ্রহণ করিয়া কাবাল খাঁ ও কাজুলি বাহাদুরের মধ্যে যে একরারপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে একরারপত্র আনীত হইলে তিনি বলিলেন, "আমি ওকতাই খাঁকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলাম। পরস্পর সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবে; তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া একরার-পত্রে স্বাক্ষর কর। আমি

(১) চেঙ্গিস খাঁর চারি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে জুজি খাঁ পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন।

চাঘাটাই, তুলি খাঁ এবং জুজি খাঁর পুত্রের জন্য পৃথক পৃথক রাজ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম।” তদনন্তর তাঁহার আদেশে কারসার ও চাঘাটাই পিতাপুত্ররূপে আর একখানি একরার-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। উত্তরাধিকারিনিয়োগ সমাপ্ত হইলে, চেঙ্গিস খাঁ বলিলেন, “আমার মৃত্যুতে তোমরা কেহ শোকাচ্ছন্ন হইয়া বিলাপ করিও না; পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত কাশইনের অধিপতি আমার শিবিরে উপনীত হইলে তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিও; এই কার্য্য সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু সংগোপনে রক্ষা করিও।” [The ruling passion of treachery was strong even in death.—H. G. Raverty.] এই উপদেশবাক্য উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। পুত্রগণ চেঙ্গিস খাঁর মৃতদেহ বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সংগুপ্ত রাখিবার জন্য পথিমধ্যে যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত করিলেন। তারপর যথারীতি অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া তাঁহাকে একটি বৃক্ষমূলে সমাহিত করিলেন। চেঙ্গিস খাঁ একদা মৃগয়া উপলক্ষে এই বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া মৃত্যুর পর তথায় তাঁহার সমাধিনির্ম্মাণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ কালগ্রাসে পতিত হন।

চেঙ্গিস খাঁর জীবনের আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাদৃশ অসাধারণ মনুষ্য পৃথিবীতে অতি বিরল। চেঙ্গিস খাঁ অধ্যবসায়ের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহার প্রথম জীবন বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু তিনি বিপুলবিক্রমে তরবারিহস্তে সমস্ত বিপদের মূলোচ্ছেদ করিয়া উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন।

কিশোরবয়স্ক চেঙ্গিস খাঁ এক দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায়ের অধিনেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায় কিশোরবয়স্ক অধিনেতাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহারা অচিরে স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিল। নবীন অধিপতি বিপদসাগরে পতিত হইলেন। সাধারণ মনুষ্য যে বয়সে ক্রীড়াকন্দুক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তিনি সেই বয়সে সশস্ত্রভাবে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নের অতিক্রম করিয়া স্ব-সম্প্রদায়কে বশীভূত করিয়া তরুণ বয়সেই আপনার ভাবী অত্যুজ্জ্বল জীবনের পূর্ব্বাভাষ প্রদান করিলেন।

তারপর সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় চেঙ্গিস খাঁ আজীবনব্যাপী অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া সুবিশাল সাম্রাজ্য সংগঠিত করিলেন। (১)

যদিও চেঙ্গিস খাঁ শৌর্য্যবীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তিনি লোকসমাজে একজন নৃশংস অত্যাচারিরূপেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় প্রবল মনুষ্যশক্র আর কখনও পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে কি না, সন্দেহের স্থল। চেঙ্গিস খাঁ প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্রূরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাঁহার

---

(১) He acquired sway over all Cathay, Khotan, Northern and Southern China, the desert of Qilecaq, Saqsin (either a place near the Caspian or a country of Turkistan), Bulgaria, As (Crimea or its neighbourhood), Russia, Alan (the country between the Caspian and the Black sea) &c. When he had finished the affairs of Transoxiana he * * turned his world opening reins to-wards Balkh. He despatched * * a large army to Khursan and conquering Iran and Turan he came from Balkh to Taliqan (a towh in Khursan). *Akbar namá.* This (Bulgaria) is not therefore European Bulgaria to the west of the Black sea but great Bulgaria on the Volga. *H. Beveridge.*

প্রত্যেক কার্য্যেই মানবজীবনের প্রতি কঠোর অবজ্ঞা ও তাহাদের হৃদয়বিদারক যন্ত্রণায় অবিচলিত উপেক্ষা জাজ্জ্বল্যমান হইত; তাদৃশ কঠোর অবজ্ঞা ও অবিচলিত তাচ্ছীল্যর দ্বিতীয় প্রমাণ সমগ্র ইতিহাসে একান্ত দুর্ল্লভ। মোগলাধিপতি যে সকল অনুর্ব্বর প্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন তাহাদিগকেই পরদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বিজিত রাজ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে তিনি অনুর্ব্বর দেশের পরিবর্ত্তে শস্যরাজিসুশোভিত জনপদ-সমুহের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। চেঙ্গিস খাঁ এই সকল দেশে উপনীত হইয়া বালবৃদ্ধস্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে অধিবাসীদিগকে নিহত করিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতেন; তাঁহার অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ বিজন অরণ্যে পরিণত হইত। চেঙ্গিস খাঁ এক দেশ মথিত করিয়া তাহার পরবর্ত্তী দেশে উপনীত হইতেন; পূর্ব্ববর্ত্তী দেশের একজন অধিবাসীও যেন জীবিত থাকিয়া বিজয়ী সৈন্যের পশ্চাতে উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে বিজিত শত্রুমাত্রকেই নিহত করিতেন। এই সকল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বধ্য ব্যক্তিদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করা হইত, এবং আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই তাঁহার হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত না। চেঙ্গিস খাঁর এইরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে স্বদেশ বিদেশের সর্ব্বত্র ভয় ও বিষাদের গভীরচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময় মোগলিস্থান অজ্ঞানান্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান অপরিস্ফুট ছিল। এ জন্য তাহারা বিজিত দেশে কোন প্রকার অভিনব ধর্ম্মমত বা জ্ঞানালোক আনয়ন করে নাই;

অবিশ্রান্ত নরশোণিতপাত ও বিনাশকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত শক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছিল; বিজিত দেশ সমূহের একমাত্র শ্মশানদৃশ্যই মোগলবিজয়ের পরিচয় প্রদান করিত।

৩।

চেঙ্গিস খাঁ মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্য পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র জুজি কিপ-চাকের সমতল ভূমি প্রাপ্ত হন। কিন্তু পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পুত্র বটু তাঁহার উত্তরাধি-কারী নির্ব্বাচিত হন। এই রাজকুমারের রাজ্য জাক্সারটিস্ নদী, আরল পর্ব্বত ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাংশে ডন ও ভলগা নদীর তীরবর্ত্তী স্বর্ণপ্রসূ প্রদেশে ও কৃষ্ণসাগরের পার্শ্ববর্ত্তী কিয়দংশে বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাই সুবিস্তীর্ণ দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন; পশ্চিমে দেস্ত কিপচাক, পূর্ব্বে মোগল জাতির আদিম বাসস্থান, দক্ষিণে মেকরান ও উত্তরে সাইবেরিয়া, এই সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমগ্র প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত কাশঘর, খোতেন এবং ওইঘর প্রদেশ, বদক্ষান, বাল্ক, খারিজম, খোরসান, গজনি ও কাবুল প্রভৃতি চেঙ্গিস খাঁর বিজিত প্রদেশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। তৃতীয় পুত্র ওকতাই আদিম মোগল ভূমি ও তৎপর্শ্ববর্ত্তী স্থানের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন, এবং চতুর্থ পুত্র তুলিকে চীনরাজ্য অর্পণ করা হইয়াছিল।

চেঙ্গিস খাঁ রাজকুমারচতুষ্টয়ের রাজ্যশাসনসংরক্ষণের সাহায্য জন্য এক এক দল সৈন্য পৃথকভাবে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন। উলূ, যাযাবর মোগল অথবা অন্যান্য তুর্কিজাতীয় সৈন্য এই সব দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথমতঃ চেঙ্গিস খাঁর বংশধরগণ ওকতাইকে সাম্রাজ্যের অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তদীয় মহিষী তুরখিনা মোগল সাম্রাজ্যের অধিনেতৃ পদ অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে মোগল আমীরগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে চাঘাটাইর পুত্র কৈয়ূকাকে নির্ব্বাচিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অধিনেতৃনির্ব্বাচন সম্বন্ধে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল, এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যেই মোগল অধিপতিগণ অধিনেতার অধীনতাপাশ ক্রমশঃ শিথিল করিতে লাগিলেন; অবশেষে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। চেঙ্গিস-সাম্রাজ্যের ঈদৃশ অবস্থা কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। পারস্য রাজ্যের অধিপতি আরঘুন খাঁ ১২৯১ খৃষ্টাব্দে রাজমুদ্রায় অধিনেতার পার্শ্বে স্বনাম অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এবং কাজান খাঁ ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে অধিনেতার নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বনামে রাজমুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, জুজি এবং চাঘাটাইবংশীয় অধিপতিগণ এই সময়েই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতঃপর চেঙ্গিসবংশীয় অধিপতিগণ স্ব স্ব রাজ্যে আপনাদিগকে সম্রাট নামে পরিচিত করিতেন।

এই আত্মবিচ্ছেদের ফল কি হইয়াছিল? অধিপতিগণ যতদিন সম্মিলিত ছিলেন, তাঁহাদের সুবিশাল সাম্রাজ্য ততদিন ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। চেঙ্গিস সাম্রাজ্যের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ মোগলের কবল হইতে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সশঙ্ক থাকিতেন। চেঙ্গিসবংশীয় অধিপতিগণ দক্ষিণ চীনের বিজয় সম্পন্ন করেন এবং খলিফাদের রাজধানী বোগদাদ নগরের ধ্বংস সাধন করিয়া ধরা পৃষ্ঠ হইতে খলিফার আধিপত্য মুছিয়া

ফেলেন। অন্যদিকে তাঁহারা ডন নদী উত্তীর্ণ হইয়া বালগেরিয়া ও পোলরাজ্যে মোগল-পতাকা উড্ডীন করেন। তার পর তাঁহারা হাঙ্গেরি, বসনিয়া, ডালমেসিয়া ও সাইলেসিয়া আক্রমণ করিয়া এবং ভায়েনা-বিজয়ের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত খৃষ্টজগৎকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলেন। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহারা ইউরোপের বিজিত দেশসমূহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; একমাত্র রুসিয়া দেশে তাঁহাদের আধিপত্য স্থির ছিল। ইহার পর তাঁহারা অন্তর্ব্বিচ্ছেদে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন, এবং কোরিয়া সাগর হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের চেঙ্গিস খাঁ নির্দ্ধারিত বিভাগচতুষ্টয় শতধা বিভক্ত হইয়া যায়। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইলে তৈমুরলঙ্গ আবির্ভূত হন, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত প্রভায় দক্ষিণ এসিয়ার চেঙ্গিস খাঁর বংশীয় অধিপতিগণ দগ্ধীভূত হন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চেঙ্গিস খাঁ মৃত্যুকালে আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্রত্রয় ও পৌত্র বটুকে প্রদান করেন, এবং কৌলিক প্রথানুসারে কারসার নোয়ান তাঁহার (চেঙ্গিস খাঁর) প্রধান অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাই কারসার নোয়ানকে প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে আদিষ্ট হন, এবং তদনুসারে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বংশানুক্রমে চাঘাটাই-শাখার প্রধান মন্ত্রণাদাতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। আমরা চেঙ্গিস খাঁর উত্তরাধিকারিগণের প্রসঙ্গে অপর তিন শাখা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র চাঘাটাই শাখার বিবরণ প্রদান করিব।

চেঙ্গিস খাঁ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট চাঘাটাই রাজ্য বৃহদায়তন এবং তিনটি

বিভিন্ন অংশ লইয়া সংগঠিত ছিল। (১) সির ও কাশঘরের উত্তরাংশস্থিত প্রদেশ ;—এই প্রদেশ দিগন্তবিস্তৃত এবং ইহার অধিকাংশ তৃণগুল্মাদিশূন্য বালুকাময়, কদাচিৎ কোথাও লোকাবাস দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু এই মরুভূমিরও কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, প্রশস্ত হ্রদ, বিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা ও শ্যামল সমভূমি দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু শীতাধিক্যবশতঃ যাযাবর অধিবাসিগণ স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকস্থ উষ্ণতর প্রদেশে আশ্রয় লইত। (২) দক্ষিণে জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহ এবং উত্তরে মরুভূমি; ইহার মধ্যবর্ত্তী কাশঘর ও ইয়ারখণ্ড প্রদেশ ;—যদিও এই দেশ বনসঙ্কুল ছিল, তথাপি বহুজনপূর্ণ কাশঘর, ইয়ারখণ্ড, খোটেন, আকসু ও তারকণ প্রভৃতি নগর এই দেশের শোভা-বর্দ্ধন করিত। (৩) জাক্সারটিস নদীর উত্তর উপকূল হইতে দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও হাজরা পর্ব্বতমালা, তাসখণ্ড, সমরখণ্ড, বোখারা ও বাল্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ ; এই সুসভ্য অমিতধনধান্যপূর্ণ দেশের আদ্যন্ত যোজনব্যাপী শস্যক্ষেত্র ও সৌষ্ঠবশালী নগরমালায় খচিত ছিল।

সুবিস্তীর্ণ চাঘাটাই রাজ্যের অধিবাসিগণ পরস্পরবিরোধী নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। মরুভূমির যাযাবর জাতিই প্রথম অংশের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহারা প্রবল স্বদেশানুরাগবশতঃ আপনাদের দেশকে ভূতলে নন্দনকাননতুল্য জ্ঞান করিত ; পার্শ্ববর্ত্তী নগরসমূহের অধিবাসী ও কৃষকসম্প্রদায় ইহাদের অবজ্ঞাভাজন ছিল। ইহারা আপনাদের উচ্ছৃঙ্খল ও নিরবলম্ব জীবনযাপনপ্রণালীই উন্নত-মনা স্বাধীন জাতির অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচনা করিত। দ্বিতীয় অংশের অধিবাসিগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে আপন আপন সুবিধামত স্থানান্তরিত হইত, এবং অপর সম্প্রদায় তথায় চিরস্থায়িভাবে বাস করিত। তৃতীয় অংশের অধিকাংশ অধিবাসীই

স্থায়ী ছিল। যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বারা চাঘাটাই রাজ্য পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই মোগলবংশসম্ভূত। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কালীমক নামক এক পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ের বসতি ছিল; ইহাদের আবাসস্থল চীনের প্রাচীরাভিমুখে বিস্তৃত ছিল।

এইরূপ নানাপ্রকার বিসদৃশ উপকরণে গঠিত রাজ্য প্রতাপশালী প্রতিভাবান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে দীর্ঘকাল সম্মিলিত থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, অধিপতিগণের একাধিক পুত্র থাকিলে, তাঁহাদের মধ্যে সমভাবে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওয়াই মোগলরাজ-বংশের কৌলিক প্রথা ছিল; তাদৃশ প্রথাও আত্মবিচ্ছেদের অনুকূল। চেঙ্গিস খাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে মোগল-শাসন এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পরও বহু বৎসর পর্য্যন্ত তদ্বংশীয়দের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল।

চেঙ্গিস খাঁর পুত্র চাঘাটাই প্রধানতঃ মরুভূমির মধ্যস্থিত স্বীয় রাজ-ধানী বিশবালিন নগরে বাস করিতেন; কখনও কখনও বা কারাকোরাম নগরে ভ্রাতা ওকটাইর সঙ্গে কালযাপন করিতেন। রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বহু কার্য্যের ভার তদীয় প্রধান অমাত্য কারসার নোয়ানের প্রতি ন্যস্ত ছিল। চাঘাটাইর উত্তরাধিকারিগণও প্রধানতঃ মরুভূমিতেই বাস করিতেন, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা ও আত্মভেদ ক্রমশঃ তাঁহাদিগকেও আক্র-মণ করিয়াছিল। চাঘাটাইর মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর মধ্যে তাঁহারা সির ও আমু নদীর তটবর্ত্তী জনাকীর্ণ জনপদসমূহে বাস করিতে আরম্ভ করেন; ইহার পর তাঁহারা ক্রমশঃ এত নিস্তেজ ও সামর্থশূন্য হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা অবশেষে মন্ত্রিগণের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হন।

যদিও চাঘাটাই রাজ্য বিবাদ বিসম্বাদ ও অন্তর্দ্রোহে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তথাপি প্রথম ইসান বুগা খাঁর রাজত্বের পূর্ব্বে যে উহার

কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইসান বুগা খাঁর রাজত্বকালেই চাঘাটাই বংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়। ইহার এক রাজ্য মোগলভূমি ও কাশঘর প্রদেশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল; অপর রাজ্যের আধিপত্য মাওরাওন্নাহার দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতঃপর চেঙ্গিসবংশীয় যে সকল নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাপালনে অক্ষম বিলাসপটু রাজসিংহাসনাধিকারিমাত্র ছিলেন। তাঁহারা ক্রীড়াকৌতুকেই দিনাতিপাত করিতেন; মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নামে রাজ্যশাসন করিতেন। দুরাকাঙ্ক্ষ মন্ত্রিসমাজের কার্য্যের অনু-মোদন করিয়াই তাঁহারা রাজকীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন। মাওরাও-ন্নাহার প্রদেশে অরাজকতা দৃষ্ট হইতেছিল; অন্তর্ব্বিবাদেই দেশমধ্যে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল; তদুপরি উত্তর প্রদেশ হইতে তাতারগণ প্রবল বন্যার ন্যায় দেশে পতিত হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটসময়ে অসাধারণ তৈমুরলঙ্গ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাস্ত করিয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় এসিয়ার ভাগ্যাকাশে উদিত হন; তাঁহার সমুজ্জ্বল কিরণে সমস্ত কুজ্ঝ-টিকা তিরোহিত হয়, এবং মোগল জাতি পুনরায় নবতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়কালে মোগলসমাজ অজ্ঞতা ও ধর্ম্মহীনতার ঘোর তামসে আচ্ছন্ন ছিল; ঈশ্বরজ্ঞান একান্ত অপরিস্ফুট ছিল। এই সময় তিব্বতে ও চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহাদের সংস্পর্শে মোগল-জাতি কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মোগলসমাজের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় নাই, অথবা তাহাদিগকে ধর্ম্মবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারে নাই।

চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর মোগল জাতির মধ্যে এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। জুজি খাঁর পৌত্র (বতুর পুত্র) উজাবল এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবোৎসাহে আপনার রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন। কিপচাক দেশে উজবেক খাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে সমগ্র কিপচাকবাসী এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

তৎপরে চাঘাটাই বংশের তোগলক তৈমুর খাঁ অধিনেতৃপদে বৃত হইয়া এসলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, এবং তিনি স্বয়ং দীক্ষিত হইয়া আপনার প্রজাবর্গের কিয়দংশকেও কোরাণোক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসী করিতে সমর্থ হন। তৎপরে ক্রমশঃ এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমগ্র মোগলজাতির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তৈমুরলঙ্গের অভ্যুদয়-কালে উহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

তৈমুরলঙ্গ।

—:o:—

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খাঁ দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাইকে স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের একাংশ প্রদান করিয়া অমাত্যশ্রেষ্ঠ কারসার নোয়ানের মন্ত্রণাক্রমে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করেন। চাঘাটাই তদনুসারে কারসার নোয়ানকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তদবধি কারসারের উত্তরাধিকারিগণ বংশানুক্রমে চাঘাটাইবংশীয়গণের প্রধান মন্ত্রণাদাতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

চাঘাটাইর মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণ আত্মকলহে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ইসান বুগা খাঁর রাজত্বকালে চাঘাটাই রাজ্য দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। মোগলভূমি ও কাশঘর প্রদেশে এক শাখার অধিপতিগণ রাজত্ব করিতে থাকেন, এবং মাওরাওন্নাহার প্রদেশ লইয়া অপর শাখার রাজ্য গঠিত হয়। (১)

এই ভাবে চাঘাটাই রাজ্য দ্বিভাগে বিভক্ত হইলে, কারসার নোয়ানের বংশধরগণ মাওরাওন্নাহার প্রদেশে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কারসার নোয়ান রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন; চাঘাটাই তাঁহার হস্তে শাসন-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়া

---

(১) চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুকালে তদীয় তৃতীয় পুত্র ওকতাই পিতৃনির্দ্দেশমত মোগল ভূমির অধিকারলাভ করেন। কোন সূত্রে এই দেশ চাঘাটাই-বংশীয়গণের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওকতাইর সঙ্গে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। যদিচ ওকতাই তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি তিনি পিতৃ-নির্দ্দেশেমত তাঁহাকে অধিনেতা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কারসার নোয়ান রাজ্যমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন, এবং চাঘা-টাইর মৃত্যুর পর আপনার ইচ্ছামত তদীয় বংশধরগণকে রাজ্যচ্যুত অথবা সিংহাসনাভিষিক্ত করেন। কারসার উননবতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পর-লোক গমন করেন ;—এই সময় তিনি পদগৌরবে ও ক্ষমতায় রাজ্যমধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার সমুজ্জ্বল যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

কারসার নোয়ানের পুত্রগণের মধ্যে আইজাল নোয়ান জ্ঞান ও ধর্ম্মে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার বীরত্ব ও শাসনদৈপুণ্যে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু চাঁঘা-টাইর বংশধরগণের মধ্যে প্রবল আত্মকলহ উপস্থিত হইলে, তিনি বিরক্ত হইয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশ নামক নগরস্থ পৈতৃক বাসভবনে গমন করেন।

আইজাল নোয়ানের পর তদীয় পুত্র আমীর আইলনগর মন্ত্রিপদ লাভ করেন। তিনি এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত দক্ষতা ও তেজস্বিতা সহকারে স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হন। আমীর আইলনগরের পরলোকপ্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র আমীর বকরল খাঁ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মসাধনে নিরত থাকিতেন বলিয়া অন্য কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইতেন না। এজন্য তিনি ভ্রাতৃগণের হস্তে সমস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া কেশ নগরে স্বাধীনভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি আপনার যৎসামান্য

আয়ের দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিতেন, এবং তজ্জনিত সমস্ত কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। ফতলঃ তিনি সর্ব্বগুণের আধার ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

আমীর বকরল মানবলীলা সংবরণ করিলে, তদীয় পুত্র আমীর তরাঘাই পিতৃপদে নিযুক্ত হন। তিনিও ধর্ম্মপরায়ণ পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন, এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার গৃহে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ জন্মপরিগ্রহ করেন। তৈমুরলঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টম পুরুষ কাজুলী বাহাদুর স্বপ্নযোগে স্বীয় বংশে এক অপূর্ব্বদীপ্তিসম্পন্ন নক্ষত্ররাজের আবির্ভাব অবলোকন করিয়াছিলেন। মোসলমান ইতিহাসবেত্তৃগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কাজুলী বাহাদুরের স্বপ্নদৃষ্ট নক্ষত্ররাজ তৈমুরলঙ্গের আবির্ভাবেরই পূর্ব্বাভাষ প্রদান করিয়াছিল।

তৈমুরলঙ্গের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল? দিল্লী দরবারের রাজকবি খুসরু ইহার এক শতাব্দী পূর্ব্বে বন্দী হইয়া মোগলভূমিতে নীত হইয়াছিলেন। তৎকালে মোগলগণের আচারব্যবহার পশূচিত ছিল বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। (১) তাঁহার

(১) "There were more than a thousand Tatar (*i. e.* Mughals) infidels and warriors of other tribes, riding on camels, great commanders in battle, all with steel like bodies clothed in cotton, with faces like fire, with caps of sheep skin, with their heads shorn. Their eyes were so narrow and piercing that they might have bored a hole in a brazen vessel. Their stink was more horrible than their colour. There faces were set on their bodies as if they had no neck. Their cheeks resembled soft leathern bottles, full of wrinkles and knots. Their noses extended from cheek to cheeck, and their mouths from cheek-bone to cheek-bone. Their nostrils resembled rotten graves, and from them the hair descended as far as the lids. Their moustaches were of extravagant length. They had

বর্ণনা অতিরঞ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা পাঠে প্রতীত হয় যে, সে সময় মোগল সমাজ সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া পরবর্ত্তী এক শত বৎসরের মধ্যেই মোগল জাতিকে অনেক পরিমাণে জ্ঞানোজ্জ্বল করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গের সময় সমরখন্দ ও বোখারা প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিখ্যাত ছিল। চেঙ্গিস খাঁর সময় হইতে মোগলগণ বহুদেশ ও রাজ্য বিজয় করিয়াছিল। বিজেতা অধিপতি বিজিত শাসকের বিধবা মহিষী অথবা কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতেন। মোগল অধিপতিগণ অপেক্ষাকৃত সভ্য দেশে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে তাঁহাদের আচার ব্যবহার বহুলপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে বিলাসপরায়ণ ও শারীরিক-আরামপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে মোগলজনসাধারণের মধ্যেও অল্লাধিক পরিবর্ত্তন ও বিলাসস্রোত আসিয়াছিল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিত; কিন্তু উহা সাময়িক উত্তেজনার ফলমাত্র ছিল। তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য মিথ্যাকথনে ও ষড়যন্ত্রেই পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু তাহারা প্রত্যেক ব্যাপারেই চতুরতা, উৎসাহ ও সাহসের পরিচয় প্রদান করিত। তাহারা স্বভাবতঃ বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ও অমিতব্যয়ী ছিল। রাজন্যবর্গ পশুপালক-জীবনসুলভ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া সভ্যোচিত

---

but scanty beards about their chins. Their chests, of a colour half black, half white were so covered with lice, that they looked like sesame growing on a bad soil. Their whole body, indeed was covered with these insects, and their skin as rough grained as chagreen leather fit only to be converted into shoes. They devoured dogs and pigs with their nasty teeth.' Kirasm-ssadain of **Amir Khusru.**

আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শিবিরে শিবিরে জীবনযাপনপ্রণালীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু নাগরিক জনের প্রয়োজনীয় অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলায় তখনও সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিবার সমস্ত কৌশলই অবগত ছিলেন; কিন্তু রাজ্যশাসনসম্পর্কে আভ্যন্তরীণ বিষয় সকল নিয়মিত করিবার সম্যক পারদর্শিতা তাঁহাদের ছিল না। যদিচ এসলাম্ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে এবং রাজ্যজয়োপলক্ষে অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতির সহিত সংমিশ্রণে মোগলগণ কিয়ৎপরিমাণে বিলাসোন্মুখ ও নৈতিক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্ববৎ পশুপালক জীবনসুলভ সদগুণরাশিতে শোভিতা ছিলেন। তাঁহারা সাহসিনী, পতির অনুরাগিণী এবং সরলহৃদয়া ছিলেন।

এই সমাজে তৈমুর (১) ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামল নগর নামে প্রসিদ্ধ কেশ সহরে (২) জন্মপরিগ্রহ করেন। তৈমুরলঙ্গ মৃগয়া, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধবিগ্যাশিক্ষায় বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই সময় মাওরাওন্নাহার রাজ্য আত্মকলহে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল; চাঘাটাই-বংশীয় একজন দুর্ব্বলচিত্ত রাজা (তরমাসিরিন খাঁ) সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; আমীরগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি অবাধে তাহাই করিতেছিলেন। এই সকল কারণপরম্পরায় যখন দেশমধ্যে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, তখন কাশঘরের

(১) লঙ্গ শব্দের অর্থ খঞ্জ; তৈমুর খঞ্জ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে তৈমুরলঙ্গ বলিত।

(২) It was called the Green City on account of the verdure of its gardens. It has been described by Babar. * * * It is generally reckoned a day's journey from Samarcand.—*H. Beveridge.*

খাঁ জিটীস এবং কালমাক্স জাতীয় বহুসংখ্যক সৈন্যসহ মাওরাওন্নাহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং পিতৃ-আজ্ঞায় একবিংশবর্ষবয়স্ক তৈমুর স্বদেশ-উদ্ধারার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই দুর্দ্দশার সময়ে দেশবাসিগণ সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া নীরব রহিল; কেহই তৈমুরলঙ্গের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। তৈমুরলঙ্গ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বদেশবাসিগণের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিয়া কেবল-মাত্র ৬০ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ মরুভূমি অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এক সহস্র শত্রুসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সন্নিকটস্থ হইলে, তিনি অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য হত্যা করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার অসম সাহস ও প্রবল পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিল। কিন্তু এই সংঘর্ষণে তাঁহার নিজের অনুচরগণ মধ্যেও অধিকাংশ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল; কেবলমাত্র দশ জন অবশিষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যেও তিনজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তৈমুর সাত জন অনুচর, স্ত্রী ও চারিটি অশ্ব সহ বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় মরুভূমির নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ইহাতেও তৈমুরলঙ্গের দুর্দ্দশার শেষ হয় নাই বলিয়াই যেন শত্রুগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া অন্ধকূপতুল্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিল। তৈমুর স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে এই কারাভবনকে মক্ষিকামশকসমাকুল গোশালা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি সেই কারায় ত্রিপঞ্চাশৎ দিন অতিবাহিত করিয়া অসাধারণ সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। সুপ্রশস্ত বেগবতী অক্সাস নদী সন্তরণপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের প্রান্তদেশে তিনি ভিক্ষুকবেশে কতিপয় মাস অতিবাহিত করিলেন; এই সময় তিনি রাজদ্রোহিরূপে পরিগণিত

ছিলেন। প্রতিকূলাবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

তৈমুর নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দলে দলে স্বদেশবাসিগণ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হইল, এবং তিনি অচিরে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময় আমীরগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আপনাদের সুখ দুঃখ এক সূত্রে গ্রথিত করিলেন। আমিরগণ তাঁহার সঙ্গে কিরূপ সুদৃঢ়ভাবে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা এ স্থলে একটি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। তৈমুরলঙ্গ লিখিয়াছেন, "যখন তাঁহাদের (তিন জন আমীরের) দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল, তখন তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমার সন্নিধানে উপনীত হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, এবং আমার জীনের রেকাব চুম্বন করিলেন। আমিও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলাম। প্রথম আমীরের মাথায় আমার পাগড়ী স্থাপন করিলাম, দ্বিতীয় আমীরের কোমরে আমার মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণনির্ম্মিত কোমরবন্ধ বাঁধিয়া দিলাম, তৃতীয় আমীরকে আমার অঙ্গরক্ষা পরিধান করাইলাম। তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন; আমার চক্ষুও বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। নমাজের সময় উপস্থিত হইলে আমরা প্রার্থনা করিলাম, এবং তারপর অশ্বারোহণে আমরা ভবনে উপনীত হইলাম। আমি স্বগৃহে পঁহুছিয়া লোকজন সংগ্রহ করিয়া ভোজ প্রদান করিলাম।"

তৈমুরের বিশ্বস্ত সৈন্যদল শীঘ্রই রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষগণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইল; তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং রণক্ষেত্রে

কিছুদিন জয়পরাজয়ের পর তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তৈমুর পঞ্চবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বদেশের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইলেন, এবং জনসাধারণ তাঁহাকে স্বদেশের হিতার্থ উৎসৃষ্টজীবন বীরপুরুষ বলিয়া হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল।

যদিও তৈমুর আপনার প্রতিপত্তির জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি তখনও তিনি রাজ্য মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি অচিরেই বাহুবলে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বশীভূত করিলেন, এবং এসিয়ার ভাগ্যাকাশে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। চতুস্ত্রিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে তৈমুর শক্তি ও প্রতিপত্তিতে রাজ্যমধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন, এবং সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা অধিকৃত করিলেন।

তৈমুরলঙ্গের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে মাওরাওন্নাহার রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এজন্য মোগলগণ তাঁহাকে প্রভুদ্রোহী বলিয়া মনে করিত। মন্ত্রি কারসার চাঘাটাইর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তৈমুরের শরীরেও রাজরক্ত প্রবাহিত ছিল। যদিও তিনি সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা গ্রাস করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার নিজের নামে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত না। তৈমুরলঙ্গ রাজবংশীয় সায়েরঘাটমিস খাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার নামেই সমস্ত রাজবিধি প্রচারিত করিতেন। কিন্তু এই খাঁর কোনও ক্ষমতাই ছিল না ; তিনি নামমাত্র রাজা ছিলেন। তৈমুর কখনও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই ; বংশানুগত উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার উপাধি আমীর গুরগান ছিল। এই সব কারণে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যদিও তৈমুর রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা নিজে গ্রাস করিয়া-

ছিলেন, তথাপি আপনাকে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী বলিয়াই বিবেচনা করিতেন।

অতঃপর তৈমুরলঙ্গ নিঃশত্রু হইয়া এবং রাজ্যশাসন জন্য শৃঙ্খলা-স্থাপন করিয়া পররাজ্যহরণ ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ কাশঘরের খাঁর আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য তদীয় রাজ্য তুর্কিস্থান আক্রমণ করিলেন। জেটিস সৈন্য তৈমুরের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না; তিনি সসৈন্যে সিহুন নদী উত্তীর্ণ হইয়া কাশঘর রাজ্য (তুর্কিস্থান) অধিকার করিলেন, এবং ক্রমান্বয়ে সাত বার এই দেশ মন্থন করিলেন। এই যুদ্ধে ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

কাশঘর যুদ্ধ অবসানের পূর্ব্বেই তৈমুরলঙ্গ পারস্য দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই দেশের অধিপতি আবু সৈয়দের মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং শান্তি ও ন্যায়-বিচার চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; রাজ্যের সামন্তবর্গ স্ব স্বপ্রধান হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। পারস্য দেশ আক্রমণ করিবার জন্য ইহাই সুযোগ মনে করিয়া তৈমুরলঙ্গ সসৈন্যে দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ সকলে স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু পরে একে একে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। প্রথমতঃ আন বেনিয়ার অধিপতি ইব্রাহিম বশ্যতা-স্বীকার করিয়া নানাবিধ উপহার দ্রব্য সহ তৈমুরের শিবিরে উপনীত হইলেন। প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার আনীত প্রত্যেক দ্রব্য সংখ্যায় নয়টি ছিল। কিন্তু একজন দর্শক বলিয়া উঠিলেন, "আট জন মাত্র ক্রীতদাস দেখিতেছি।" ইব্রাহিম এইরূপ মন্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; সুতরাং তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি স্বয়ং নবম সংখ্যার পূরণ করিতেছি।" তাঁহার তোষামোদবাক্যে তৈমুর ঈষৎ হাস্য করিলেন,

এবং ইহাতেই ইব্রাহিম আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তার পর তৈমুর ক্রমশঃ সিরাজ, ওরমাজ, বোগদাদ, এডিসা প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিয়া সমগ্র পারস্থ দেশ বশীভূত করিলেন। সমগ্র দেশে আধিপত্যস্থাপন করিতে তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

পারস্থবিজয় সম্পূর্ণ করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩৯০খৃষ্টাব্দে, তৈমুরলঙ্গ কিপচাক (পশ্চিম তাতার) রাজ্য আক্রমণ করেন। তক্তামিস নামক জনৈক রাজকুমার স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তৈমুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে তাঁহার সৈন্যের সাহায্যে কিপচাকের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর তক্তামিস পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হইয়া নবতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ সিহুন নদী উত্তীর্ণ হন, এবং তৈমুরের প্রাসাদাবলী ভস্মীভূত করেন। তক্তামিসের প্রবল আক্রমণে বিব্রত হইয়া তৈমুর সমরথন্দ ও নিজের জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, এবং সামান্য সংঘর্ষণের পর সমর-ক্ষেত্রে জয়লাভ করেন।

এইবার তৈমুরলঙ্গের প্রতিশোধ লইবার পালা উপস্থিত হইল। তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিক হইতে ক্রমান্বয়ে দুইবার কিপচাক রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাহার সমাবেশ করিবার জন্য এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সার্দ্ধ এক যোজনব্যাপী স্থানের আবশ্যক হইত। তৈমুর-সৈন্যের আগমন-সংবাদে অধিবাসিগণ স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; তৈমুরের সৈন্যগণ পাঁচ মাসের অভিযানেও শত্রুর সাক্ষাৎ পাইল না, এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানকালে তাহাদিগকে কখনও কখনও কেবলমাত্র মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। যাহা

হউক, অবশেষে উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শত্রুপক্ষের পতাকাধারীর বিশ্বাসঘাতকতায় তৈমুর সমরক্ষেত্রে জয়লাভ করিলেন, এবং তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারে সমগ্র কিপচাক-ভূমি ছারখার হইল। তক্তামিস বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং তৈমুর পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রুষিয়ার করদ প্রদেশে উপনীত হইলেন। শত্রুর আমগনে মস্কো নগর কম্পিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তৈমুর রুষিয়ার রাজধানী আক্রমণ না করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথা হইতে তৈমুর ভলগা নদীর তীরে পঁহুছিলে সমৃদ্ধিশালী আজপ নগরের বণিকগণ সসম্ভ্রমে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু ধনরত্নপূর্ণ নগর লুণ্ঠন করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি সসৈন্য তথায় উপনীত হইলেন, এবং অগ্নিসংযোগে সুদৃশ্য অট্টালিকাসমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সেরাই ও অষ্ট্রাকান নগরদ্বয় ভস্মীভূত করিয়া সগৌরবে সমরখন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইবার তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। পৌত্তলিক জাতিকে কোরাণোক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত অথবা বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা এসলাম-ধর্ম্মের অনুশাসনানুসারে মোসলমানের অবশ্য-অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি তাদৃশ ধর্ম্মযুদ্ধে পৌত্তলিকদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, তিনি গৌরবজনক গাজি উপাধি লাভ করিয়া মোসলমান সমাজে সম্মানিত হন। তৈমুরের মোসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; সুতরাং তিনি পৌত্তলিকদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়া গৌরবজনক গাজি উপাধি লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় ভারতবর্ষ ও চীনদেশ পৌত্তলিক জাতির আবাসভূমি ছিল। এ জন্য এই রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি আক্রমণ করিবেন, তাহার

মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী বলিয়াই দুর্ভাগিনী। ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য্যের জনশ্রুতি তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। (১) তৈমুর স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "প্রভূত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও আমি দুই কারণে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি। প্রথমতঃ, এসলাম ধর্ম্মের শত্রু পৌত্তলিকগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে পরলোকে পুরস্কারলাভ করিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, এসলাম সৈন্য পৌত্তলিকদিগের ধন রত্ন লুণ্ঠন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে। যে সকল মোসলমান ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ করে, তাহাদের পক্ষে লুণ্ঠনকার্য্যে নিরত হওয়া মাতৃদুগ্ধপানের ন্যায় শাস্ত্রসঙ্গত।" তৈমুর ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের তদানীন্তন সম্রাট এসালমধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং তথাকার মোসলমান অধিবাসীর সংখ্যাও নগণ্য ছিল না।

তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বৃক্ষপত্রের ন্যায় অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে (২) ভারতবিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে

---

(১) তৈমুরের পৌত্র মীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি মুলতান নগর আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পিতামহের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন; এমন সময় পৌত্রের আবেদনপত্র তাঁহার হস্তগত হয়। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হন এবং পৌত্র মীর মোহাম্মদকে সাহায্য করিবার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি মুলতান নগরের দ্বারদেশে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই জাহাঙ্গীর অর্দ্ধবৎসরব্যাপী অবরোধের পর উহা হস্তগত করেন। এই আত্মরক্ষা ব্যাপারে দুর্গবাসিগণের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল, দুর্গমধ্যে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল; এমন কি, একটি বিড়াল অথবা মূষিকও জীবিত ছিল না।

(২) With an army as numerous as the leaves of trees.—*Zafarnama*.

ইন্দরাব নামক স্থানের মোসলমান অধিবাসিগণ কাটোর জাতির বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল।

কাশ্মীর রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ হইতে কাবুলের গাত্রসংলগ্ন পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত কাটোর জাতির আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কাটোরভূমিতে এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়াছিল না। তৈমুর ইন্দরাবের অধিবাসীদিগকে তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তথায় গমন করেন। কাটোর দেশ প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত। মোগল সৈন্যকে এই স্থানে উপস্থিত হইতে বরফময় ও তুষারমণ্ডিত সমুচ্চ পর্ব্বত লঙ্ঘন, সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম ও দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গ পরিক্রমণ করিতে হইয়াছিল। তাহারা কষ্টসহিষ্ণুতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া এই সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া তথায় উপনীত হইল; এবং সমগ্র কাটোরভূমি মন্থন করিয়া নিহত কাটোর অধিবাসীদিগের কঙ্কালরাশির দ্বারা তথায় স্মৃতিস্তম্ভস্থাপনপূর্ব্বক সগৌরবে পুনরায় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আটক নগরের নিকট সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদার্পণে ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল। এই সময় দিল্লীর রাজশক্তি গৃহকলহ ও অন্তর্বিপ্লবে সাতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তদানীন্তন সম্রাটের এমন শক্তি ছিল না যে, তিনি তাদৃশ বিপুল সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। সুতরাং তৈমুরলঙ্গ অবাধে নগরলুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতে করিতে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও সামন্তগণ একে একে অবনতমস্তকে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং রক্ষকহীন অধিবাসিগণ

প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। তৈমুরলঙ্গ অগণিত সেনা লইয়া যে যে স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহা দাবদগ্ধ বনভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পঞ্চনদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ মোগল সেনার পদস্পর্শে বিধ্বস্ত হইয়া গেল; মোগল সৈন্য সহস্র সহস্র গৃহদগ্ধ, উদরপূর্ত্তির জন্য শস্যভাণ্ডারলুণ্ঠন, কামানলে অসংখ্য হিন্দু রমণীকে আহুতিপ্রদান ও নিরপরাধ ভারত-বাসীর রক্তস্রোত প্রবাহিত করিল। মোগল সৈন্যের কবল হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইল না; যাহারা তরবারি-মুখে নিহত হইল না, তাহারা স্ত্রীপুরুষবালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে শত্রুহস্তে বন্দী হইল। এই ভাবে বিপাশা নদীর তীরস্থ নশরৎখোক্করের শাসিত প্রদেশ, ভতনির দুর্গ, সরস্তি নগর (১) ও ফতেবাদ প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী স্থান বিনষ্ট করিয়া তৈমুর এক লক্ষ বন্দী লইয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে দিল্লীর দ্বার-দেশে উপনীত হইলেন।

তৈমুরলঙ্গ দিল্লীর অদূরে শিবিরসংস্থাপন করিলে নগরবাসীরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমনে বাধাপ্রদান করিতে উদ্যত হইল। তৈমুর এক লক্ষ বন্দী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; উভয় সৈন্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে এই বন্দীর দল মোগল সৈন্যকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, তিনি এক লক্ষ নরনারীকে পশুর ন্যায় বধ করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। যে সকল মোগল এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, তাহারাও কঠোর রাজাজ্ঞায় ভীত হইয়া নররক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিল। মৌলানা নাশিরউদ্দীন ওমর নামক একজন সুবিখ্যাত কোমলহৃদয় ধর্ম্মবেত্তা এই সময় মোগল-শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। যদিচ তিনি

(১) Surusti.

জীবনে কখনও একটি মেষশাবককেও হত্যা করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন নাই, তথাপি এবার স্বহস্তে পঞ্চদশটি বন্দীর প্রাণ বিনষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন। ফলতঃ বোধ হয়, জগতের আর কোন রাজাই ঈদৃশ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন নাই। (১)

১৭ই ডিসেম্বর দিল্লীর সম্রাট সুলতান মাহমুদ দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী, চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ও শতাধিক রণনিপুণ হস্তী লইয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে সমাগত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে মোগল সৈন্য শত শত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা আর কখনও রণনিপুণ হস্তীর সম্মুখীন হয় নাই। এ জন্য তাহারা এতদূর ভীত হইয়া পড়িল যে, তৈমুরলঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজপুরুষগণের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যখন সমবেত শাস্ত্রবেত্তা পারিষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কোথায় অবস্থান করিবেন, তখন তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমরা মহিলাগণের সঙ্গে একত্র অবস্থান করিব।" তৈমুরলঙ্গ স্বীয় সৈন্যদিগকে ভীতিবিহ্বল দেখিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখভাগে palisades স্থাপন ও পরিখা খনন করিলেন, এবং তার পর বহুসংখ্যক মহিষকে গলদেশ চর্ম্মপটী দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া উহার পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিলেন।

শত্রুসৈন্য সম্মুখীন হইলে তৈমুরলঙ্গ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরোপাসনায় নিরত হইয়া জয়কামনা করিলেন। প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে তিনি শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। মোগলসৈন্য কালান্তক যমের ন্যায় শত্রুর উপর পতিত হইল। প্রতিপক্ষ

(১) ইহার সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পরে পারস্যের অধিপতি নাদির শাহ দিল্লীতে এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার নিকট সে হত্যাকাণ্ডও পৈশাচিকতায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

তাদৃশ প্রবল পরাক্রম সহ করিতে না পারিয়া ঝঞ্ঝাবায়ুতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; বিজয়লক্ষ্মী তৈমুরের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

সুলতান মাহমুদ পরাজিত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্বরাজ্যরক্ষার জন্য তৈমুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া গুজরাটে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

তৈমুরলঙ্গ দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার আদেশে দিল্লীর মস্‌জিদে তদীয় নামে খোতবা পঠিত হইল। তৈমুর মহাসমারোহে সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দিল্লীর প্রধান প্রধান সামন্ত ও রাজপুরুষগণ রাজসভায় সমাগত হইলে তৈমুরলঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সুমধুর তুর্ক ও তাজিক সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে তাঁহার গৌরবপূর্ণ নাম চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। সমবেত সভ্যবৃন্দ একে একে তৈমুরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। নবাভিষিক্ত সম্রাট তাঁহাদিগকে পরমসমাদরে গ্রহণ করিয়া নানাবিধ মহার্ঘ দ্রব্য উপহার দিলেন, এবং অবশেষে সুরা ও সরবত বিতরণ পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিলেন।

ইহার এক সপ্তাহ পরে দিল্লীতে ভয়ঙ্কর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড আরব্ধ হইল। মোগলসৈন্য দিল্লীর উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেছিল; কেবলমাত্র পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এই দুর্দ্দান্ত সৈন্যদল আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দলে দলে বিজয়োন্মত্ত মোগলসৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা ও লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত

হইল। সহস্র সহস্র হিন্দু মোগল-হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার জন্য স্বগৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া স্ত্রীপুত্র সহ অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিল। মোগলসৈন্য শোভা ও সম্পদের আধার দিল্লীনগরী পাঁচ দিন পর্য্যন্ত মন্থন করিল। উন্মত্ত মোগল সৈন্য সিরি ও জাহান পান্নার সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী ভূমিসাৎ করিল; অসংখ্য নরনারী শত্রুহস্তে বন্দী হইল; প্রত্যেক সেনানী অন্ততঃ বিংশতি জন নগরবাসীকে বন্দী করিল; কাহারও কাহারও হস্তে ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ বন্দী পতিত হইল; লুণ্ঠনলোলুপ সৈন্যগণ বন্দিনী হিন্দুরমণীর বহুমূল্য গাত্রালঙ্কার অপহরণ করিল। মৃতদেহরাশিতে রাজপথ এমন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল যে, যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ দিন পরে এই প্রচণ্ড অনল আর ভোগ্য বস্তু না পাইয়া আপনা-আপনি নির্ব্বাপিত হইল। (১)

---

(১) আমরা এই বিবরণ তৈমুরের স্বরচিত জীবনবৃত্ত ও তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস জাফরনামা হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি। এই অমানুষিক অত্যাচারের মূলে তৈমুরের আদেশ ছিল কি না, তাহা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কোথাও স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বরং কোন কোন সৈন্যদল অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাহার নিবারণ করিয়াছিলেন, স্বরচিত জীবনবৃত্তে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তৈমুর বিজয়োৎসবে মত্ত ছিলেন, এ দিকে তদীয় সৈন্যবৃন্দ এই অমানুষিক অত্যাচারে লিপ্ত হইয়াছিল। অত্যাচারের পঞ্চম দিনে নগরের ধুমরাশি দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এ বিষয়ে ইতিহাস-বেত্তা ফেরিস্তা যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"Then followed a scene of horror much easier to be imagined than described. * * * * This massacre is in the history of Nizam, otherwise related. The collectors of the ransom, says he, upon the part of Timur, having used great violence, by torture and other means, to extort money, the citizens fell upon them and killed some of the Moguls. The circumstances being reported to the Mogul king he ordered a general pillage and, upon resistance, a massacre to commence. This account carries greater appearance of truth along it, both from Timur's general character of cruelty,

তৈমুরলঙ্গ আত্মজীবনবৃত্তান্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমি দিল্লী-বিজয়ের পর আমোদ আহ্লাদে ১৫ দিন অতিবাহিত করিলাম। আমি বিধর্ম্মীদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিবার জন্য ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখানে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছি; লক্ষ লক্ষ বিধর্ম্মী ও পৌত্তলিককে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছি, এবং আমার অসি ধর্ম্ম-বিদ্বেষীদের রক্তে অনুরঞ্জিত করিয়াছি। অতএব এখন আমোদ আহ্লাদে সময়যাপন না করিয়া বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাই কর্ত্তব্য।" তদনুসারে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মিরাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৈমুরলঙ্গের দিল্লী পরিত্যাগ করিবার পর দুই মাস পর্য্যন্ত দিল্লী জনশূন্য ছিল।

তৈমুরলঙ্গ মিরাটে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যরক্তে সমস্ত নগর প্লাবিত করিয়া তথায় বিজয়-নিশান উড্ডীন করিলেন। অতঃপর তৈমুরলঙ্গ সেনাপতি আমীর জাহান শাহকে যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উত্তর মুখে অনুগাঙ্গ ভূমি বিধ্বস্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি দেশধ্বংস, নগরলুণ্ঠন ও নর-হত্যা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু এবার তাঁহার

---

and the improbability of his being five days close to the city without having intelligence of what passed within the walls. But the imperial race of Timur take, to this day, great pains to invalidate this opinion, nor they want arguments on their side. The principal one is this: that in consequence of a general plunder the king would have been deprived of the ransom, which must have been exceedingly great, and for which he only received elephants and regalia. Neither have we any account of his taking any part of the plunder from his army afterwards though it must have been very immense." *Dowe's History of India, Vol. II.*

গতি তাদৃশ সহজসাধ্য হইল না। তদ্দেশবাসিগণ তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতেছিল। অবশেষে তৈমুর হরিদ্বারে উপনীত হইলে তত্রত্য হিন্দুগণ তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই স্থান হইতে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তথা হইতে তৈমুর শিবালিক নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। এইখানে আমীর জাহান শাহ সসৈন্যে তাঁহার সহিত পুনর্মিলিত হইলেন।

অতঃপর তৈমুরলঙ্গ সমগ্র শিবালিক প্রদেশ, নগরকোট, জম্বু নগর ধ্বংস করিয়া কাশ্মীরে গমন করিলেন। তত্রত্য অধিপতি তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। তৈমুর তাঁহার ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিয়া রাজদূতকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও নানাবিধ উপহার দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিলেন। তথা হইতে তৈমুর অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে সিন্ধুনদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৈমুর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই, লাহোর নগর বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল, স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া তাহারা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। তার পর তৈমুর চেনাব উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে আপনার বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ এবং দরবার আহ্বান করিয়া বিজয়ী রাজপুরুষগণকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিলেন। এইরূপে তৈমুরের ভারতবিজয় সম্পন্ন হইল। তিনি তথা হইতে, যে পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কঙ্কালসার ভারতবর্ষ হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইতে লাগিল। (১)

---

(১) তৈমুর দেশবিজয়ের উৎকট আনন্দলাভ ও বিধর্ম্মীদিগকে হত্যা করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্যই ভারতবাসীর রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগকালে বিজয়লব্ধ দেশ রক্ষা করিবার জন্য তিনি সৈন্য নিযুক্ত অথবা

দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষ হইতে সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় তৈমুর ত্রিষষ্টিবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মানসিক ও শারীরিক তেজ কিছুমাত্র খর্ব্ব হইয়াছিল না; তিনি ভারত-অভিযানের দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও অক্লান্ত ছিলেন, এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কতিপয় মাস সমরখণ্ডের প্রাসাদে শান্তিসুখে বাস করিয়া এসিয়ার পশ্চিমখণ্ডের দেশসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভারতবিজয়কালে যে সকল সৈন্য গমন করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে স্বেচ্ছামত যুদ্ধে গমন অথবা গৃহে অবস্থান করিবার আদেশ করিলেন।

এই সময় এসিয়ার পশ্চিম অংশে অটম্যান সাম্রাজ্য (১) সংস্থাপিত ছিল। ইউপ্রেটীস নদীর তীরে অটম্যান ও তৈমুর সাম্রাজ্য পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল। এজন্য সীমানা লইয়া উভয় অধিপতির মধ্যে অচিরে বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সময় সুলতান বায়জিদ অটম্যান সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই বিবাদ উপস্থিত হইলে তৈমুরলঙ্গ সুলতান বায়েজিদকে একখানি তেজোব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।— "আপনি কি জানেন না যে, পৃথিবীর অধিকাংশ আমাদের অনুগত হই-

---

হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তৃপদ কাহাকেও প্রদান করেন নাই। তবে ভারতবর্ষের যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে বাহাল রাখিয়াছিলেন।

(১) আর্ত্তুগাল নামক জনৈক মোসলমান সেনাপতি এই অভিনব সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। এই সাম্রাজ্য কালক্রমে ইয়োরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আর্ত্তু-গালের পুত্র ওসমান বা ওসমানের সময় এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ওসমান বা ওসমানের সেনাগণ ওসমান লী বা ওসমানলী নামে পরিচিত ছিল; ইয়োরোপীয়গণ ওসমানলী বা ওসমান শব্দ সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে অটম্যান বলিত। ইহা হইতেই এই সাম্রাজ্য অটম্যান সাম্রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

য়াছে ? আমাদের অপরাজেয় সৈন্যবৃন্দ সমুদ্র সৈকতস্থ বালুকারাশির ন্যায় অসংখ্য। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ আমাদের দ্বারদেশে শ্রেণীবদ্ধ। আমরা সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে আমাদের সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইতে বাধ্য করিয়াছি। এ সব কি আপনি জানেন না ? আপনার এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা ও দাম্ভিকতার কারণ কি ? আপনি এনাটোলিয়ার জঙ্গলে কয়েকটি যুদ্ধ করিয়াছেন ; তুচ্ছ বিজয়চিহ্ন ! আপনি ইউরোপের খৃষ্টানদিগকে কয়েকবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছেন ; আপনার অসি পয়গম্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে। আপনি কোরাণের আদেশমত বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন ; এই একমাত্র কারণেই আমরা মোসলমান জগতের দ্বারস্বরূপ আপনার রাজ্য বিনষ্ট করি নাই। সময় থাকিতে সুপরামর্শ গ্রহণ করুন, বিবেচনা করুন, অনুশোচনা করুন, আপনার মস্তোকোপরি পতনোন্মুখ বজ্র নিবারণ করুন। আপনি পিপীলিকা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী নহেন ; আপনি কেন হস্তিযূথকে উত্তেজিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ? আহা ! তাহারা আপনাকে পদমর্দ্দিত করিবে।" সুলতান বায়েজিদ এই লিপিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন, এবং তৈমুরকে তিরস্কার করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি আমি আপনার অস্ত্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করি, তাহা হইলে যেন আমার মহিষীগণ তিনবার পরিত্যক্ত হয় ; আর যদি আপনার আমার বিরুদ্ধে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সাহস না থাকে, তাহা হইলে তিনবার পরপুরুষসহবাসের পরও আপনার রমণীদিগকে যেন আপনি গ্রহণ করেন।" (১) মোসলমান-সমাজে মহিলা সম্বন্ধে কোনরূপ কটু

(১) According to the Koran a Musalman who had thrice divorced a woman (who had thrice repeated the words of a divorce) could not take her again till after she had been married to and repudiated by another husband.

কথা বলা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সুলতান বায়েজিদের অবিমৃষ্যকারিতায় রাজনৈতিক বিবাদ ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হইল। তৈমুর সসৈন্যে সুলতানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

তিনি অটম্যান সাম্রাজ্যে উপনীত হইয়া এনাটোলিয়ার প্রান্তবর্ত্তী সুদৃঢ় সিবাষ্টি নগর অবরুদ্ধ এবং বিপর্য্যস্ত করিলেন। চারি সহস্র প্রভুভক্ত আর্ম্মেনিয়ান সৈন্য এই অবরোধকালে নগররক্ষা-কল্পে প্রাণপণে কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছিল; তৈমুর তাঁহাদিগকে জীবন্ত ভূপ্রোথিত করিয়া সুলতান বায়েজিদের অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিফল দিলেন। এই সময় সুলতান বায়েজিদ কনষ্টাণ্টিনোপলের খৃষ্টান রাজ্য বিলুপ্ত করিয়া তথায় মোসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইয়ূরোপের সমস্ত খৃষ্টান নরপতি তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মোসলমান সৈন্যের প্রতিরোধ জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। তৈমুরলঙ্গ গোঁড়া মোসলমান ছিলেন, এবং বিশ্বাস করিতেন যে, বিধর্ম্মীদিগকে বিনষ্ট করিলে পারলৌকিক মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। এ জন্য তিনি মনে করিলেন যে, বায়েজিদ ধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত আছেন, এবং এক্ষণে সমগ্র অটম্যান সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিলে তাদৃশ ধর্ম্মকার্য্যের অন্তরায় উপস্থিত হইবে। সুতরাং তিনি সিবাষ্টি নগরের ধ্বংস করিয়াই এবার নিবৃত্ত হইলেন, এবং সিরিয়া ও মিশরবিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ১৪০০খৃষ্টাব্দে তৈমুর সিরিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং সমস্ত রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া আলিপো নগর অবরুদ্ধ করিলেন। তিনি নগরবিজয় সম্পন্ন করিয়া শোণিতপাতে পৃথিবী অনুরঞ্জিত করিলেন, এবং অসংখ্য নরনারীকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন।

তৈমুর এই বন্দিগণের মধ্যে কতিপয় মোসলমান শাস্ত্রবেত্তা দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মোসলমান

ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন; পারসিকগণের শিক্ষামত কেবলমাত্র আলী ও হাসন হোসেনকে ভক্তি করিতেন, এবং পয়গম্বরের কন্যা ও দৌহিত্রের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া সিরিয়ার অধিবাসীদিগের প্রতি বিরূপ ছিলেন। (১) তিনি ছল গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে সমবেত শাস্ত্রবিদ্‌দিগকে প্রশ্ন করিলেন, "প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য কাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে? আমাদের পক্ষীয় সৈন্যগণ? অথবা তোমাদের পক্ষীয়

(১) এস্‌লাম ধর্ম্মের মূল সুদৃঢ় করিবার জন্য মহাপুরুষ মোহাম্মদকে বাধ্য হইয়া এক অভিনব রাজ্যেরও গঠন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার তিরোভাবের পর মোসলমানগণ সমবেত হইয়া তদীয় শিষ্য ও প্রচারবন্ধু আবুবেকরকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন যে, উত্তরাধিকার বংশানুক্রমিক হইবে না। তদনুসারে আবুবেকরের পর পরস্পরসম্পর্কবিহীন ওমর, ওসমান ও আলী ক্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারী অর্থাৎ খলিফা পদপ্রাপ্ত হন। আলী মহাপুরুষের জামাতা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মাবিয়া নামক মোহাম্মদ জনৈক শিষ্য বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। মাবিয়া এসলাম সাম্রাজ্যের অধিকাংশ গ্রাস করেন। এই অবস্থায় আলী হঠাৎ লোকান্তর প্রাপ্ত হন। আলী কাহাকেও খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান নাই। আলীর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসন খলিফা হন। মাবিয়ার সঙ্গে হাসনের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়, হাসন স্বজাতির শোণিতপাতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার(মাবিয়ার) মৃত্যুর পর তিনিই পুনরায় খলিফা নিযুক্ত হইবেন সর্ত্ত করিয়া তাঁহাকে খলিফা-পদ প্রদান করেন। তদনুসারে মাবিয়া সিরিয়ার অন্তর্গত ডামাস্কস নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। হাসন জীবিত থাকিতে মাবিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র এজিদের খলিফা-পদ প্রাপ্ত হইবার কোন আশা নাই দেখিয়া, তিনি (এজিদ) কৌশলে বিষপ্রয়োগে হাসনকে নিহত করেন। মাবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ খলিফা-পদ অধিকার করেন ও হাসনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এজিদের চক্রে হোসেন ও তাঁহার পরিজনগণ নৃশংসভাবে নিহত হন। এই ঘটনা হইতে মোসলমান-সমাজে তিনটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে,—শিয়া, সুন্নি ও খারেজী। শিয়াগণের মতে আলীই মোহাম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, এবং তাঁহার পূর্ব্বতন খলিফাত্রয় বলপূর্ব্বক খলিফা-পদ অধিকার করিয়াছিলেন। পারস্যের অধিবাসিগণ এই মতাবলম্বী। সুন্নিগণ আবুবেকর, ওমর, ওসমান ও আলী চারি জনকেই প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন। খারেজীগণ আলী ও তাঁহার বংশধরগণের বিরুদ্ধবাদী, এবং মাবিয়া ও তৎপুত্র এজিদের পক্ষপাতী। সিরিয়ার অধিবাসিগণ এই মতাবলম্বী। তৈমুরলঙ্গ শিয়া-মতাবলম্বী ছিলেন।

সৈন্যগণ?” একজন কাজি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “উদ্দেশ্য লইয়াই বিচার; কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক ধ্বজা দেখিয়াই কে ধর্ম্মার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।” কাজির এই উত্তরে তৈমুর সন্তুষ্ট হইয়া আর কিছু বলিলেন না। তারপর তিনি আর একজন কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত?” কাজি বলিলেন, “পঞ্চাশ বৎসর।” তিনি বলিলেন, “আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও এই বয়স। তোমরা এখানে একজন অক্ষম ও খঞ্জ বৃদ্ধকে দেখিতেছ। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অবলম্বন করিয়াই ইরাণ, তুরাণ এবং ভারতবর্ষের রাজ্য সকল অধিকার করিয়াছেন। আমি রক্তপিপাসু নহি। আমি কাহাকেও প্রথমে আক্রমণ করি নাই। আমার শত্রুগণ নিজেরাই আপনাদের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে।” যে সময় এইরূপ শান্তিপূর্ণ আলাপ চলিতেছিল, তখন রাজপথে রক্তস্রোত প্রবাহিত এবং নগরবাসীর কাতরক্রন্দনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছিল। পরস্বলোলুপ সৈন্যগণ ধনরত্নলোভে লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল; কিন্তু বিজয়োৎসবের জন্য উপযুক্তসংখ্যক নরমুণ্ড সংগ্রহ করিবার জন্যই তৈমুরের আদেশমত সৈন্যগণ তাদৃশ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

অতঃপর তিনি ডামাস্কস নগরের অবরোধ করিলেন। ডামাস্কসের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ মোহাম্মদের দৌহিত্রের পক্ষাবলম্বী ছিল না। মোহাম্মদের বংশের ভক্ত তৈমুরলঙ্গ এই অপরাধের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বংশধরগণকে বালবৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন। এক ব্যক্তি সসম্মানে মোহাম্মদের দৌহিত্র হোসেনের ছিন্ন মস্তক কবর দিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধরগণ নিষ্কৃতিলাভ করিল। তৈমুর একজন শিল্পীকে ডামাস্কস হইতে সমরখণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন; তাহাদের পরিবারবর্গও তাঁহার কোপানল হইতে রক্ষা পাইল।

তদ্ব্যতীত সমস্ত নগরবাসী নিহত হইল; এবং সাত শত বৎসরের বৃদ্ধিশালী নগর শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল।

এই যুদ্ধব্যাপারে মোগল সৈন্য পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে তৈমুর মিশর পেলেষ্টাইন বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে তৈমুর আলিপো নগর ভস্মীভূত করিলেন, এবং নবতি সহস্র নরমুণ্ড দ্বারা বোগদাদ নগরের ভগ্নাবশেষের উপরে একটী স্তূপ নির্ম্মিত করাইলেন। তারপর পুনরায় জর্জ্জিয়াতে উপনীত হইয়া অটম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। তিনি সমগ্র অটম্যান সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য বিপুল সৈন্য (৮ লক্ষ) সহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুলতান বায়েজিদও বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তিনিও চারি লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে মোগলের গতিরোধজন্য অবতীর্ণ হইলেন। আঙ্গোরা নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুলতান মোগল সেনার প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বন্দী হইলেন।

সুলতান বায়েজিদ বন্দী হইয়া তৈমুরের শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে তৈমুর তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহাকে আপন পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট করাইয়া তিরস্কারমিশ্রিত সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিলেন। সুলতান বায়েজিদ শত্রুর সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া অনুশোচনার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর তৈমুর তাঁহাকে খেলাৎ প্রদান করিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া অবনতমস্তক হইলেন। এই সময় তদীয় পুত্র মুসা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি তাঁহাকে বাষ্পাকুললোচনে আলিঙ্গন করিলেন। বিজয়োৎসবসম্পর্কিত ভোজসভায় তৈমুর সুলতানকে আমন্ত্রণ করিলেন, এবং তদীয় মস্তকে রাজমুকুট ও হস্তে রাজদণ্ড প্রদান করিয়া তাঁহাকে

পিতৃরাজ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু অপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুলতান বায়েজিদ আট মাস কাল বন্দিভাবে যাপন করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। (১)

এই সময় তৈমুরের বিজয়নিশান ইরটিস ও ভলগা নদী হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত এবং অনুগাঙ্গ প্রদেশ হইতে ডামাস্কস পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্য অপরাজেয়। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। তিনি এনাটোলিয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া ইয়ুরোপ-বিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন। বিপুল সৈন্যের অধিপতি তৈমুরের নৌবল ছিল না। তিনি এসিয়া ও ইয়ুরোপের মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায়োদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী মোগল বীরের নামে সমগ্র ইয়ুরোপে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার ইয়ুরোপ-বিজয়ের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া রাজন্য-বর্গ কম্পিতকলেবরে বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক নানাবিধ মহার্ঘ্য দ্রব্য সহ দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার বিজয়লালসা প্রশমিত করিবার প্রয়াসী হইলেন।

ইয়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ সফলকাম হইলেন; তৈমুর ইয়ুরোপ-বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহাদের শঙ্কাকুল মস্তিষ্কে জনরব উদ্ভূত হইল যে, তৈমুরলঙ্গ আফ্রিকার দেশসমূহ জয় করিতে করিতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী হইয়া জিব্রাল্টার প্রণালী উত্তরণ পূর্ব্বক ইয়ুরোপে প্রবেশ করিতে এবং তারপর খৃষ্টান রাজ্যসমূহ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রুষিয়া ও তাতারের মরুভূমির

(১) তৈমুরের স্বরচিত জীবনবৃত্ত অবলম্বন করিয়া সুলতান বায়েজিদের প্রতি তাঁহার সদ্ব্যবহারের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। পারসীক ইতিহাসবেত্তৃগণও এই মতাবলম্বী। কিন্তু ফরাসী, ইটালিয়ান, আরব্য, গ্রীক ও তুর্কি ইতিহাসবেত্তৃগণ তৈমুর-লঙ্গ সুলতান বায়েজিদকে লৌহ-খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ

পথে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিয়াছেন। মিশরের সুল-তান সময় থাকিতেই বশ্যতাস্বীকার করিয়া সুদূরপরাহত এবং সম্ভবতঃ কাল্পনিক বিপদের কারণ দুরীভূত করিলেন।

এই সময় চীনরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৈমুর অসংখ্য মোসলমানের রক্তপাত করিয়াছিলেন; তদনুরূপসংখ্যক বিধর্ম্মী পৌত্ত-লিকের বিনাশেই মোসলমাননিপাতরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। তৈমুর এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনের সায়াহ্নকালে চীনবিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন। স্বীয়সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য তিনি বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া এনাটোলিয়া হইতে সমরখণ্ডে ফিরিয়া আসি-লেন।

চীন-বিজয়ের আয়োজনে দুইমাস অতিবাহিত হইয়াছিল। এই দুইমাস তিনি সমরখণ্ডে অবস্থান করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া-

---

করিয়াছেন। মোহাম্মদ ইবণ আরব শাহ নামক জনৈক ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সুলতান বায়েজিদ তৈমুরলঙ্গের রমণীদিগকে উপলক্ষ করিয়া কটুকথা বলিয়াছিলেন, তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিজয়োৎসবসম্পর্কিত ভোজসভায় সুলতানের অন্তঃপুরবাসিনীদিগের দ্বারা অনবগুণ্ঠনাবস্থায় মদ্য পরিবেশন করাইয়া তাঁহাদিগকে সুরামত্ত অতিথিগণের নিকট 'বে-আবরু' করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্ মত গ্রহণীয়? ঐতিহাসিককুলতিলক গিবন সাহেব মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ তৈমুর বিজয়ানন্দে বিভোর ও উদারচিত্ত হইয়া বিজিত-শত্রুর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এনাটোলিয়ার রাজ্যচ্যুত রাজকুমারগণ সুল-তানের বিরুদ্ধে তৈমুরের নিকট নানাপ্রকার গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি কিয়ৎপরিমাণে বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে সগৌরবে সমর-খণ্ডে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় সুলতান বায়েজিদ স্বীয় পটা-বাসের নীচে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করেন। ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তৈমুর তাঁহাকে লৌহ-খাঁচায় আবদ্ধ করেন। এই অবস্থায় সুলতান বায়েজিদ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তৈমুর সুলতানের পুত্র মুসাকে এনাটোলিয়ার কিয়দংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশে তত্রত্য প্রাচীন অধিপতির বংশধরগণকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন।

ছিলেন, এবং এই অল্পকালমধ্যেই স্বীয় অসাধারণ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন; অপরাধীকে শাস্তি দিতেন, এবং গুণীকে পুরস্কৃত করিতেন; আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্য সুদৃশ্য প্রাসাদ ও মসজিদনির্ম্মাণে ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হন; (১) এবং মিশর, আরব, ভারতবর্ষ, তাতার, রুষিয়া ও স্পেনের রাজদূতগণকে দর্শন দেন।

এই সময় তৈমুরলঙ্গ স্নেহবশে ও ধর্ম্মানুরোধে আপনার ছয় জন পৌত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে প্রাচীন খলিফাদের অনুষ্ঠিত জাঁক জমকের পুনরভিনয় হইয়াছিল। অসংখ্যপট্টাবাসশোভিত কালিঘোলার উদ্যানে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। পট্টাবাসসমূহে বৃহৎ নগরের বিলাস সামগ্রী এবং বিজয়ী শিবিরের লুণ্ঠিত দ্রব্য একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছিল। রন্ধনশালার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য একটি বনের সমগ্র বৃক্ষ কর্ত্তন করা হইয়াছিল। মিষ্টান্নের মঠ ও সুরার ভাণ্ড সংস্থাপিত করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ভোজন জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ভোজসভায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর সামন্তবর্গ এবং পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন; এমন কি, ইয়ুরোপের রাজদূতগণও বর্জ্জিত হয়েন নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ আলোকমালায় নগর সুসজ্জিত করিয়া আপনাদের আনন্দের পরিচয় প্রদান করে। কাবিন নামা কাজি কর্তৃক অনু-

(১) Timur had enriched Samarkand with the spoils of his universal conquests; he had brought skilled craftsmen and artists from the utmost parts of Asia to build him 'Stately pleasure domes' and splendid mosques, and his capital became one of the most beautiful as it had been one of the most cultivated cities of the East.—*Stanley Lane-Poole.*

যোদিত হইলে, বরকন্যাগণ বাসরগৃহে গমন করেন, এবং প্রচলিত প্রথামত তাঁহাদিগকে নয় বার পরিচ্ছদ পরিধান ও পরিত্যাগ করান হয়। প্রত্যেকবার বস্ত্রপরিবর্ত্তনের সময় তাঁহাদের মস্তকোপরি মণিমুক্তা বর্ষিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সেই মণিমুক্তারাশি অবজ্ঞাভরে পার্শ্ব-বর্ত্তী অনুচরবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জকে সর্ব্ববিষয়ে প্রশ্রয় প্রদান করা হইয়াছিল; প্রত্যেক প্রকার অনুশাসন শিথিলিত হইয়াছিল; সর্ব্বপ্রকার আমোদে লিপ্ত হইবার জন্য অনুমতি প্রদত্ত হই-য়াছিল; জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল; তৈমুর নিজে নিষ্কর্ম্মা ছিলেন। ইতিহাসবেত্তৃগণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন যে, তৈমুর যুদ্ধকার্য্যে জীবনের অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া যে দুই মাস আপ-নার ক্ষমতা পরিচালিত করেন নাই, তাহাই তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্যে একমাত্র সুখের কাল।

কিন্তু তৈমুর দীর্ঘকাল এই শান্তিসুখ ভোগ করিলেন না; দুই লক্ষ সৈন্য একত্রিত করিয়া চীন রাজ্য জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং শীত ঋতু সমাগত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্য অথবা দারুণ শীত, কিছুতেই তিনি দমিত হইলেন না; পররাজ্যহরণলালসায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু সমরখণ্ড হইতে তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়াই সমগ্র পৃথিবীর ভীতিস্থল বীরপুরুষ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ভবলীলা সংবরণ করি-লেন।

তৈমুর এসিয়ার সুবিশাল অংশে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া-ছিলেন। তিনি এক দেশ বিজয় করিতে না করিতেই অন্যদেশ আক্র-মণ করিতেন; এ জন্য তাঁহার দেশবিজয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, এবং বিজিত দেশের শাসনশৃঙ্খলা বিধান করিবার অবসর ঘটিত না;—

তৈমুরলঙ্গের বিজয়লব্ধ দেশসমূহে এই কারণে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই। তৈমুর দেশবিজয় করিয়া এক প্রকার উৎকট আনন্দ অনুভব করিতেন। এই উৎকট আনন্দের জন্যই তিনি অনেক সময় দেশবিজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন; দেশবিজয় করিয়া স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার অনেক স্থলেই আদৌ ছিল না। ফলতঃ, তাঁহার দেশ-আক্রমণ দাবাগ্নির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। বিজয়লোলুপ যোদ্ধৃপুরুষ যে দেশে উপনীত হইতেন, সে দেশের তৃণ শস্য পর্য্যন্ত দগ্ধীভূত হইয়া যাইত; কিন্তু তাঁহার দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে দেশ শস্যশ্যামল হইয়া উঠিত। তৈমুরলঙ্গের অভিযানরূপ প্রবল বাত্যায় যে সকল নরপতি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার অন্য দেশে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্বরাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করেন। কেবলমাত্র পারস্যের কিয়দংশে ও মাওরাওন্নাহার দেশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল।

তৈমুরলঙ্গ বিকলাঙ্গ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার শারীরিক গঠন বলদৃপ্ত ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল। তাঁহার সুবিশাল বপু, তাঁহার সমগ্রপৃথিবীব্যাপিনী প্রতিষ্ঠার সমতুল ছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য অনবদ্য ছিল বলিয়াই তিনি আজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও অক্লান্ত ছিলেন। পরিমিতাচার ও ব্যায়ামচর্চ্চার জন্যই আজীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ছিল। তিনি সভাস্থলে একাধারে বাঙ্ময়, গম্ভীর ও বিনীত ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানবিৎ ও ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহাতে সামাজিক গুণেরও অভাব ছিল না; তিনি বন্ধুদিগকে ভালবাসিতেন, এবং কখনও বা শত্রুদিগকেও ক্ষমাপ্রদর্শন করিতে পারিতেন।

তৈমুর আপনার রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন;

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিতেন, কাহারও মন্ত্রণায় তাহা হইতে এক তিলও বিচলিত হইতেন না। এসলাম ধর্ম্মে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল; ধর্ম্মের নামেই তাঁহার কৃত অধিকাংশ অত্যাচারস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তৈমুরের জীবনের আরম্ভকালে এসিয়ার অধিকাংশ রাজ্যে অরাজকতা রাজত্ব করিতেছিল; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র দেশ শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল, এক জন বালকও স্বর্ণ-থলি লইয়া উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারিত। এইরূপ কাল্পনিক বা যথার্থ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া আপনার দেশবিজয়, নরহত্যা ও পরস্বলুণ্ঠনের সমর্থন করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অত্যাচার ও লুণ্ঠনে প্রকৃতিপুঞ্জ যন্ত্রণা পাইতেছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু শান্তিসংস্থাপকের পদতলে সমগ্র জাতি মর্দ্দিত হইয়াছিল; সম্পদ ও শোভার আধার নগরসমূহ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে সৈন্যগণ অষ্ট্রাকান, খারিজম, দিল্লী, ইস্পাহান, বোগদাদ, আলিপো ও ডামাস্কস প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থান বিপর্য্যস্ত ও ভস্মীভূত করিয়াছিল। পারস্যের কিয়দংশে ও মাওরাওন্নাহার দেশে তৈমুর আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া সুশাসনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দূরবর্ত্তী বিজিত দেশসমূহে শাসনশৃঙ্খলাস্থাপনে অবহিত হন নাই; একমাত্র দেশবিজয়ের উৎকট আনন্দ লাভ করিবার জন্যই সেই সকল দেশের প্রচলিত শাসনপ্রণালী ভগ্ন করিয়াছিলেন। বিজিত দেশসমূহের বিকলাঙ্গ শাসনযন্ত্রও সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে অভিনব শাসনযন্ত্র নির্ম্মিত না হওয়াতে অত্যাচারস্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি যে দেশের শাসনকার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য মনোযোগী

ছিলেন, তাহাতেও দেশবিজয়ের অনুরোধে তাঁহার সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি-নিবন্ধন নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তৈমুরলঙ্গের শাসনপ্রণালী প্রজাসাধারণের হৃদয়গত প্রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; এ জন্য তাঁহার রাজত্বের সুফল যাহাই কেন হউক না, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৈমুরের জীবনা-বসানের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার অরাজকতা বিরাজ করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিল। ফলতঃ, "the two great Scourages of Asia Chingiz and Timur."

তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তদীয় সুবৃহৎ সাম্রাজ্য বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াস উদ্দীন জাহাঙ্গীর মিরজা পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদীয় পুত্র পীর মোহাম্মদ গজনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ পীর মোহাম্মদকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দ্বিতীয় পুত্র মিরজা ওমরশাহ পারস্য দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনিও পিতার জীবদ্দশাতেই লোকান্তর প্রাপ্ত হন। তৃতীয় পুত্রের নাম মিরাণ শাহ মিরজা; আজর বিজান, সিরিয়া ও ইরাকের শাসনভার ইঁহার হস্তে অর্পিত ছিল। চতুর্থ পুত্র মিরজা শাহ রুক খোরসানের শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার জীবিত পুত্রদ্বয় ও মৃত পুত্রদ্বয়ের বংশধরগণ তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তদীয় তৃতীয় পুত্র মিরাণ শাহ মিরজা নিজের শাসিত প্রদেশসমূহে স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রধানতঃ তাব্রিজ নগরে অবস্থান করিতেন। স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে

আরম্ভ করিবার অল্প পরেই ইনি ইউসুফ নামক জনৈক তুর্কি সামন্তের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

মিরাণ শাহ মিরজার পরলোকপ্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র সুলতান মোহাম্মদ মিরজা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (১) সুলতান মোহাম্মদ মিরজার পর তদীয় পুত্র মিরজা আবুসৈয়দ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিয়া মাওরা-ওন্নাহার অধিকার করিলেন। ইহাতেই তাঁহার উচ্চাশার পরিতৃপ্তি হইল না; তিনি খোরাসান ও ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিলেন। এই সময় মিরজা জাহান শাহ আজর বিজানের অধিপতি ছিলেন। উজান হোসেন নামক জনৈক সামন্ত আজর বিজানের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন। আবু সৈয়েদ মিরজা জাহান শাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন; কিন্তু আরদি বিলের নিকট সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য-পথে শত্রুসৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অধিকাংশ সৈন্য সহ নিহত হইলেন। আবুল ফজল আবুকে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

ক্ষমতাশালী অধিপতির মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য বহুধা

---

(১) ইতিহাসবেত্তা এস্কাইন সাহেব মিরাণ শাহ মিরজার পরই আবু সৈয়েদের নামনির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেবও এই মতাবলম্বী। মোহাম্মদ মিরজা পিতামহ তৈমুরের জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ মিরজার পিতা মিরাণ শাহের মৃত্যু ঘটিয়াছিল; সুতরাং তিনি কখনও পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব করিতে পারেন না। তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রে ছত্রিশ জন বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া সমসাময়িক ইতিহাসলেখক জাফরনামার গ্রন্থকার সরফউদ্দীন উল্লেখ করিয়াছেন। জাফরনামার গ্রন্থকার তাঁহাদের নামের এক তালিকাও প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকায় মোহাম্মদ মিরজার নাম নাই। একমাত্র আবুল ফজল মোহাম্মদ মিরজার রাজত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিভক্ত হইয়া পড়িল। কতক অংশে বা তাঁহার পুত্রগণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কতক অংশ বা বিদেশীয়ের হস্তে পতিত হইল। আবুসৈয়দের পুত্রগণের মধ্যে চারি জন স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান আহম্মদ মিরজা সমরখণ্ড ও বোখারা অধিকার করিলেন। তৃতীয় পুত্র সুলতান মোহাম্মদ মিরজা বদকসা ও খুতাম প্রভৃতি প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। চতুর্থ পুত্র ওমর শেখ মিরজা পিতার জীবদ্দশায় জাক্সারটিস্ নদীর উভয়কূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র ফারগনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজের শাসিত প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। ওমর শেখ বিজয়লিপ্সু কর্ম্মঠ নরপতি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমরখণ্ড রাজ্য করতলগত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বারংবার তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই মোগলিস্থানের অধিপতি চাঘাটাইবংশজাত জুনিস খাঁর (১) কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ওমর শেখ জুনিসের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার (ওমরের) সাহায্যার্থ অনেকবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যাহা

(১) জুনিস খাঁ সুরূপ, অমায়িকস্বভাব ও মধুর ব্যবহারে মোগল সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাতে তৎকালের মোগল সমাজের রূঢ়তা কিছুমাত্র ছিল না। জনৈক সাধুপুরুষ তাঁহার যে জীবন্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"I had heard," said a holy man sent to Yunis Khan, when he ruled in Mughalistan, "I had heard that Yunis Khan was a Mughal, and I concluded that he was beardless, with the rude ways of an inhabitant of the desert. But I found a handsome man, with a fine bushy beard, of elegant address, most agreeable and refined manners and conversation, such as are seldom to be met with even in the most polished society."

হউক, অবশেষে জুনিস খাঁর যত্নে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। কিন্তু "খলের পীরিতি জলের বাঁধ"; ভ্রাতৃদ্বয়মধ্যে পুনরায় মনোবাদ উপস্থিত হইল। এই সময় জুনিস খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, এবং তদীয় পুত্র মোহাম্মদ খাঁ তৎপদে অভিষিক্ত ছিলেন; তিনি সুলতান আহম্মদ মিরজার সঙ্গে মিলিত হইয়া ওমরকে রাজ্যচুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং এই সম্মিলন সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিবার মানসে মিরজার কন্যাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিলেন। ফারগনা রাজ্য দুই পার্শ্ব হইতে এককালে আক্রমণ করিলে আপনাদের অভীষ্ট সহজে সিদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া মিরজা নদীর বামকূলবর্ত্তী প্রদেশ ও খাঁ উত্তরকূলবর্ত্তী প্রদেশ যুগপৎ আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। এই দুঃসময়ে মিরজা ওমর শেখের অপঘাত সংঘটিত হইল। (১)

১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু হইয়াছিল; ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসরের পরে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তদীয় অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ওমর সেখ মিরজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে তৈমুরলঙ্গের দিগন্তপ্রসারিত সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? এই সময় উহা

---

(১) আবুল ফজল ওমর সেখকে একজন ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবুল ফজল তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করিবার জন্য যে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহা বর্ণনা করিতেছি। একবার চীনের একখানি বাণিজ্য-শকট ফারগনাতে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তুষারপাতে সঙ্গীয় লোকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কেবলমাত্র দুইজন অবশিষ্ট থাকে। এই সময় ওমরের অত্যন্ত অর্থের অনটন ছিল। তিনি এই ঘটনা অবগত হইয়া অর্থের অনটন সত্ত্বেও বাণিজ্য-শকটে হস্তক্ষেপ না করিয়া চীন দেশ হইতে প্রকৃত মালিকদিগকে আনাইয়া উহা প্রদান করেন। ওমর-পুত্র বাবরও স্বরচিত জীবনবৃত্তে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধুতামূলক এই সামান্য ঘটনাকে উচ্চস্থান প্রদান করাতে মনে হয় যে, তৎকালে মোগল সমাজে নীতিজ্ঞান বড় প্রবল ছিল না।

শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের পারস্পরিক সংগ্রামে দেশব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হয়। উজবেগগণ উত্তর প্রদেশ হইতে মাওরাওন্নাহার ও পারস্য দেশে বন্যার জলের ন্যায় পতিত হইয়া তৈমুরলঙ্গের বংশধরগণকে নিমজ্জিত করিয়াছিল। যদি ওমরের পুত্র বাবর এক অভিনব সাম্রাজের সূত্রপাত না করিতেন, তাহা হইলে, এই সময়েই তৈমুরের বংশধরগণের রাজনাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

বাবর।

তৈমুরলঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ওমর শেখ মিরজা ক্ষুদ্র ফারগনা (বর্ত্তমান কোকন) রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ফারগনা প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত এবং অমিত ফলশস্যে পূর্ণ। ইহার চতুষ্পার্শ্ব শৈলমালায় পরিবেষ্টিত। এই পর্ব্বতাবলীর অধিকাংশ কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তুষারমণ্ডিত থাকে।

ওমরের রাজত্বকালে মোগলসমাজে জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত ছিল। এই সময়ের শিক্ষা দীক্ষা কুসংস্কারদুষ্ট থাকিলেও তাহা বুদ্ধি মার্জ্জিত ও চরিত্র উন্নত করিবার পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ ছিল না। বিদ্বৎসমাজে কোরাণ, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, ন্যায়দর্শন ও কাব্যশাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল। সুশিক্ষিতগণ জ্যোতিষ, ইতিহাস ও চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলনে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। যদিও মোগলসমাজে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাই আলোচিত হইত, তথাপি কাব্যালোচনা জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সাদির কাব্যরাজি তাহাদের একান্ত প্রিয় পদার্থ ছিল। তাহারা কথায় কথায় উহার শ্লোক আবৃত্তি করিত; এমন কি, রাজকীয় কাগজপত্রেও সাদির কাব্যের প্রভাব দৃষ্ট হইত।

নানা শ্রেণীর সাধুগণ দেশের সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরভক্ত ও অলৌকিকক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, এই বিশ্বাসে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ভয় ও ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিত। এই সাধুর দল সমাজের যথেষ্ট হিতসাধনও করিতেন। সমগ্র দেশ তাঁহাদের অনুরক্ত শিষ্য সেবকে পরিপূর্ণ ছিল। এজন্য দেশমধ্যে তাঁহাদের অখণ্ড প্রতাপ

ও প্রতিপত্তি ছিল। এবং তাঁহারা অনায়াসেই দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। লোকে এই সাধুসম্প্রদায়কে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিত; ইহার ফলে কোন অত্যাচারী রাজা বা সেনাপতি অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিলে তাঁহারা সহজেই উৎপাতকারীকে সন্ত্রাসিত করিতে পারিতেন। এবং অনেক সময়ে তাঁহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে সমস্ত অত্যাচারস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইত। কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীরই বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা ছিল। অবিরত রাজবিপ্লবের নিমিত্ত জনসাধারণের শিক্ষালাভের কোন বন্দোবস্ত হইতে পারিয়াছিল না; এজন্য তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সময়ের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচারমূলক ছিল, এবং রাজদরবার দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষগণে পূর্ণ থাকিত। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহ নিবন্ধন বাণিজ্য ও শিল্পও যথোচিত স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল না।

ফারগনা রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক তৈমুর-বংশধর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিবাদে দেশ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ওমর শেখের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান আহম্মদ মিরজা ও শ্যালক মোহাম্মদ খাঁ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমরানলে ফারগনা রাজ্য ভস্মীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং বিপুল বাহিনী সহ বিভিন্ন পথে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই দুঃসময়ে হঠাৎ ওমর শেখ মিরজার অপঘাত সংঘটিত হইল, এবং তদীয় একাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র বাবর বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষণের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই বালক শৈশবেই সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি সিংহাসনারোহণের পর হইতে আমরণ অসিহস্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছেন, বিদ্যালোচনার অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি উত্তরকালে তুর্কি ও পারসীতে

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শৈশবকালে সুশিক্ষা না পাইলে তিনি কখনও তাদৃশ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার শৈশবশিক্ষার বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। তবে রাজমহিলাগণ যে তাঁহার সুশিক্ষার সহায়-স্বরূপা ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মোগল-মহিলাগণ বিলাসিতার সংস্পর্শে আসিয়াও আপনাদের কৌলিক সদ্গুণে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না। তাঁহারা সরলহৃদয়া বীররমণী ছিলেন।

বাবরের সহায়স্বরূপা রাজমহিলাগণের মধ্যে তদীয় মাতামহী ইসান-দৌলত বেগম সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, এই রমণীর বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত ; তাঁহার প্রস্তাবমতেই অনেক কার্য্যের সূত্রপাত হইয়া-ছিল। তিনি একবার স্বামী সঙ্গে বিজয়ী শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া-ছিলেন। তৎকালে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তেজস্বিনী বীররমণীরই যোগ্য। যদিও তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন, তথাপি বিজয়ী অধিপতি তাঁহাকে জনৈক অমাত্যের হস্তে অর্পণ করেন। তিনি নীরবে এই অবমাননা সহ্য করিয়া নূতন স্বামীকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অমাত্যপ্রবর তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন, এবং তাহার পর পরি-চারিকাগণের সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করিয়া মৃতদেহ পাজপথে নিক্ষেপ করেন। রাজদূত এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে বীররমণী সগর্ব্বে উত্তর করেন, "আমি জুনিস খাঁর মহিষী, শেখ জামাল শাস্ত্র-বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া আমাকে অন্য ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিয়া-ছিলেন, এজন্য আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি ; শেখ ইচ্ছা করিলে আমাকেও মারিয়া ফেলিতে পারেন।" জামাল তাঁহার সতীত্বে মুগ্ধ

হইয়া তাঁহাকে সসম্মানে জুনিস খাঁর নিকট প্রেরণ করেন, এবং তিনি সানন্দে পতি সহ এক বৎসর কাল কারাকষ্ট ভোগ করেন। এই মহীয়সী মহিলা বাল্যকালে বাবরের প্রধান অবলম্বন ছিলেন।

বাবর সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই দুই পার্শ্ব হইতে রাজ্যের দ্বারদেশে প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতান আহম্মদ মিরজা ও মোহাম্মদ খাঁ উভয়েরই সঙ্গেই তাঁহার শোণিতসম্বন্ধ ছিল। তিনি শত্রুর গতি প্রতিরোধ অসম্ভব দেখিয়া পিতৃরাজ্যেও তাঁহাদের প্রতিনিধিভাবে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে সম্মত হইয়া কৃপাভিক্ষার্থীর ন্যায় সন্ধিসংস্থাপন জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা অবজ্ঞাভরে সন্ধিসংস্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ফারগনা অভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাবরের সৌভাগ্যবশতঃ আহম্মদ মিরজার পথিমধ্যে বেগবতী নদী পতিত হইল। নদীর উপর একটি সঙ্কীর্ণ সেতু বিদ্যমান ছিল। সেতু উত্তীর্ণ হইবার সময় জনতানিবন্ধন অনেকে নদীগর্ভে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ইহার পূর্ব্বেও একবার এক দল সৈন্য এই সেতুর উপর এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; এই ভূত ঘটনা কুসংস্কারাপন্ন সৈনিকগণের স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র তাহারা ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল, এবং কোন প্রলোভনেই আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। ইহার পর শিবিরমধ্যে অচিরে মড়ক উপস্থিত হইল। আরামপ্রিয় আহম্মদ মিরজার আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি অধীরচিত্তে, যে সকল নগর অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাই নিজের অধীনে রাখিয়া, বাবরের সঙ্গে সন্ধিসংস্থাপন করিয়া, কলঙ্কের ভার মস্তকে লইয়া, স্বরাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই ভাবে এক পার্শ্বের শত্রুর বিষদন্ত ভগ্ন হইল।

অপর দিকের শত্রু মোহাম্মদ খাঁ কাসান নগর স্বাধিকারে আনয়ন করিয়া আখসি (ফারগনার রাজধানী) নগর অবরোধ করিলেন। নগরাভ্যন্তরের সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে নগররক্ষা করিতে লাগিল; দীর্ঘকাল অবরোধের পরও মোহাম্মদ খাঁ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশ্রান্তচিত্তে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ভাবে বাবরের বিপদরাশি কাটিয়া গেল। তাঁহার আধিপত্য আন্দিজান ও আখসির মধ্যবর্ত্তী ৪০ ক্রোশ ব্যাপী স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল; রাজ্যের অবশিষ্টাংশ শক্তিশালী প্রতিবাসী রাজন্যবর্গের হস্তগত হইয়াছিল; বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও পুনর্ব্বার স্বাধিকারভুক্ত করিবার উপায় ছিল না। বাবর অপহৃত রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করিবার জন্য কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল না। তৈমুরের রাজধানী সমরখণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বাবর পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সমরখণ্ড করতলগত করিয়া জীবনের সর্ব্বোচ্চ কামনা সিদ্ধ করিলেন। বাবরের অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব ছিল, কিন্তু তদনুরূপ সৈন্যবল ও যুদ্ধোপকরণ ছিল না। সুতরাং তিনি এক সময়ে ফারগনা ও সমরখণ্ড উভয় রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সমরখণ্ডজয়ের পর অবিলম্বে তম্বল নামক তাঁহার একজন সেনাপতি ফারগনা অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া বাবর অবিলম্বে তথায় যাত্রা করিলেন। ফারগনার উদ্ধার হইল না, কিন্তু তাঁহার সমরখণ্ড-পরিত্যাগের পর সমরখণ্ডবাসী শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এই ভাবে বাবর উভয় রাজ্য হারাইলেন।

এই সময়ে তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "আমি বড় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম, এবং অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিলাম।" কিন্তু ইহাতেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রকৃতি দমিত হয় নাই। তিনি অগৌণে ফারগনা রাজ্যে আধিপত্যসংস্থাপন করিয়া সমরখণ্ডের দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন।

এই সময় সমরখণ্ড উজবেগ জাতির করতলগত ছিল। তাহারা প্রজাপ্রিয় ছিল না। এজন্য বাবর বিবেচনা করিলেন যে, একবার কৌশলে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই সমরখণ্ডবাসীরা দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইবে। এই বিশ্বাসে তিনি একদা রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে অশীতিসংখ্যক পরাক্রান্ত সৈন্য সহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নগর তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। কেবলমাত্র কতিপয় দোকানদার গবাক্ষপথে এই ঘটনা দেখিতে পাইয়া ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল। বাবরের কৌশলে সার্দ্ধ দুই শত সৈন্যের সাহায্যে সমরখণ্ডবিজয় সম্পন্ন হইল। কিন্তু ইহার পরে তাঁহার অদৃষ্টচক্র পুনর্ব্বার নিম্নগামী হইল। উজবেগ-অধিপতি সইবানি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বাবরকে সমরখণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এবং ইহার সমসময়েই পৈতৃক রাজ্য ফারগনা শত্রুহস্তে পতিত হইল।

অতঃপর বাবর অবলম্বনশূন্য তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইয়া উরাটপিয়ার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য মেষপালকগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে তিনি নগ্নপদে পশুচারণের মাঠে ভ্রমণ করিয়া গ্রামবাসীর মেষপাল ও অশ্বিনীসমূহের তত্ত্বাবধানে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময় একজন বৃদ্ধা মেষপালিকা গল্প করিয়া তাঁহাকে আমোদিত করিত। বৃদ্ধা তৈমুরলঙ্গের ভারতবিজয়ের অনেক কাহিনী অবগত ছিল, এবং বাবরের

চিত্তবিনোদনের জন্য তাহার বর্ণনা করিত। সম্ভবতঃ এই সকল কাহিনী উত্তরকালে বাবরের বীরহৃদয়ে ভারতবিজয়ের লালসা উদ্দীপিত করিয়া তাঁহার মানসনয়নে ভারত সাম্রাজ্যের সৌষ্ঠব ও ঐশ্বর্য্যের চিত্র প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যাহা হউক, এত কষ্টেও তাঁহার উৎসাহ উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই। তিনি মাতুলগণের সাহায্যে বহু কষ্টে পুনর্ব্বার ফারগনা রাজ্যে অধিকার-সংস্থাপন করিয়া মেঘনির্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কিন্তু উজবেগ অধিপতি সইবানি তাঁহার উন্নতি দর্শনে শঙ্কিত হইয়া বহু রক্তপাতের পর ফারগনা রাজ্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। বাবর নিরুপায় হইয়া মোগলিস্থানে পলায়ন করিলেন।

বাবর বৎসরাধিক পরে মোগলিস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদমাতে আগমন করিলেন, এবং তারপর তথা হইতে বাল্কের নিকটবর্ত্তী তরমুজে উপনীত হইলেন। তত্রত্য অধিপতি বাখর উজবেগের পরাক্রম ও উন্নতি দর্শনে শঙ্কাকুল হইয়াছিলেন বলিয়া বীরশ্রেষ্ঠ বাবরকে সানন্দে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিলেন। এই সময় বাবর তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় একবার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে গৃহীত হইতেছি, এবং তাহার পরক্ষণেই দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। আমি এত দিন নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়াছি, কিন্তু একবারও স্থায়িভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অতএব ভবাদৃশ আত্মীয়ের পরামর্শলাভ করিতে পারিলে আনন্দিত হইব।" বাখর প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "সইবানি এক্ষণে আপনার সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যেও প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া প্রভূত-ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব অন্য স্থানে ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে কাবুলে

অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে; কাবুল আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির উপযুক্ত ক্ষেত্র।" এই সময় উজবেগগণই দেশমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল; তৈমুরবংশীয় অধিপতিগণ নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাওরাওন্নাহার তৈমুরবংশীয়গণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সেখানে আর তাহাদের স্থান ছিল না। উজবেগগণ হিসার ও কুন্দেজ অধিকারের আয়োজন করিতেছিল। কেবলমাত্র উত্তর পারস্যে অর্থাৎ খোরসানে তৈমুরবংশীয়গণের আধিপত্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তত্রত্য অতিপতি সুলতান হোসেন কখনও বাবরের সাহায্যপ্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে কাবুলের অধিপতি বাবরের পিতৃব্য উলুগবেগ কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আব্দুর রজক পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। একজন বালককে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া কাবুলীরা বিদ্রোহী হয়, এবং মুকিমবেগ নামক একজন দুরাকাঙ্ক্ষ আরগুণ মোগল বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া বাবর বাখরের পরামর্শ ই গ্রহণ করিলেন।

তদনুসারে বাবর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। আমরা সে বিবরণ তাঁহার নিজের ভাষায় বিবৃত করিতেছি। "এই সময় আমি একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলাম। এখনও যে সকল অনুচর আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক ও তিন শতের ন্যূন ছিল। ইহাদের অধিকাংশই পদাতিক সৈন্য; ইহাদের পদে নিকৃষ্ট চর্ম্মপাদুকা, হস্তে বংশদণ্ড এবং স্কন্ধদেশে শততালিবিশিষ্ট অঙ্গরাখা। আমরা এমন নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমাদের সঙ্গে দুইটীমাত্র তাম্বু ছিল। আমারটি মাতাকে দিয়াছিলাম।" বাবর পথিমধ্যে কুন্দেজের অধিপতি খসরু খাঁর রাজ্যে উপনীত হইলে তিনি

তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বাবর তাদৃশ অভ্যর্থনার প্রতিদানস্বরূপ খুসরুর দরবারে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া নিজের জন্য সাত সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করেন।

যাহা হউক, বাবর এই সৈন্যদল সহ কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কাবুল রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী হইলে মুকিমবেগ তাঁহার গতিরোধ জন্য সসৈন্যে আগমন করিলেন। কিন্তু কতিপয় দিন পরেই তিনি সন্ধিসংস্থাপন করিয়া বাবরের অনুমতি অনুসারে নিজের ধনরত্ন সমভিব্যাহারে কান্দাহারে স্বীয় ভ্রাতা শাহবেগের নিকট গমন করিলেন। অনায়াসে কাবুল রাজ্য বাবরের হস্তগত হইল।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে উজবেগ অধিপতি সইবানি বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খোরসান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করেন। খোরসানের তৈমুরবংশীয় বৃদ্ধ নরপতি সুলতান হোসেন মিরজা যৌবনোচিত উৎসাহসহকারে তাঁহার গতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, এবং তৈমুরবংশের শত্রুর বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্য তদ্বংশীয়মাত্রকেই আহ্বান করেন।

তদনুসারে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বাবর খোরসান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি খোরসানে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সুলতান হোসেন মিরজা কালগ্রাসে পতিত হইলেন; এবং তদীয় পুত্রদ্বয় সম্মিলিত হইয়া মুরঘাব নদীর তীরস্থ নগরে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (১) বাবর

---

(১) সুলতান হোসেন মিরজার পুত্রদ্বয় সম্মিলিতভাবে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করাতে আবুল ফজল তাঁহাদিগকে অজ্ঞানী বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। "The folly consisted in the dual appointment for Abul Fazl and his school held that kingship, being the shadow of God head must be single. Babar referring to the joint appointment says. "This is a strange arrangement. A joint kingship was never before heard of. Sheik Sadi Khan in the Gulistan are very applicable to it. Ten

মুরঘাব নদীর তীরস্থ নগরে উপনীত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে হিরাটে গমন করিতে অনুরোধ করেন। এই সময় হিরাট নগর সমস্ত প্রাচ্য দেশের শিক্ষা ও বিলাসের কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহার বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি ও কারুকার্য্যখচিত ধর্ম্মমন্দিরসমূহ মোসলমান জগতের সর্ব্বত্র প্রশংসালাভ করিত। তত্রত্য অসংখ্য বিদ্যালয়ে অগাধধীসম্পন্ন পণ্ডিতগণ শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। খান্দমীর লিখিয়াছেন, "হিরাট নগর প্রদীপস্বরূপ,— ইহা অন্যান্য নগরকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছে। হিরাট পৃথিবীর আত্মা। লোকে খোরসানকে পৃথিবীর বক্ষঃস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে হিরাট নিশ্চয়ই উহার হৃৎপিণ্ড।" বাবর হিরাট নগরে উপনীত হইলে যুগল নরপতি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

বাবর অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধনই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু হিরাটে আগমন করিবার পূর্ব্বে তিনি কখনও মদ্যস্পর্শ করেন নাই। এই স্থানেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে সুরাপান করিতে শিক্ষা করেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি সুরাপানে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে চিত্তজয় জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু চতুর্দ্দিকেই প্রলোভনে পরিবেষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্তিদমন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাবর স্বহস্তে যে বিষবৃক্ষের রোপণ করেন, শেষ কালে তাহাই তাঁহার জীবনের সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে অকালে শুষ্ক করিয়াছিল।

বাবর হিরাটে গমন করিয়া স্বহস্তে আপনার মৃত্যুর বীজ বপন করিলেন; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না। তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়া-

---

Dervishes sleep in one covelet (galin) but two kings have not room in one clime (iqlim)." *H. Beveridge.*

ছেন, "তাঁহাদের (সুলতান হোসেন মিরজার পুত্রদ্বয়ের) রাজকীয় পট্টবাস, মূল্যবান গালিচা, পরিপাটী পরিচ্ছদ এবং স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত পানপাত্র দেশরক্ষার হেতুস্বরূপ ছিল না, বরং শত্রুর লালসাগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিত। মিরজাগণ প্রমোদক্ষেত্রে অত্যন্ত সমজদার ছিলেন, এবং সামাজিক ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় অতিশয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন। কিন্তু যুদ্ধপরিচালন সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত অজ্ঞ ছিলেন; কি ভাবে যুদ্ধায়োজন করিতে হয়, তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং সামরিক জীবনের বিপদ ও বীর্য্যে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন।" উজবেগদিগকে দমন করিবার জন্য এরূপ বিলাসপটু যুগল নরপতির নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির কোন আশা নাই দেখিয়া বাবর হিরাট পরিত্যাগ করিয়া কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময় শীতকাল সমাগত হইয়াছিল, অনবরত তুষারপাত হইতেছিল; কোন কোন স্থানে তুষাররাশি দুই হাত পর্য্যন্ত পুরু হইয়া জমাট বাঁধিয়াছিল। বাবরের পথভ্রম হইল; পথপ্রদর্শক বহু অনুসন্ধানেও প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিল না। চতুষ্পার্শ্ব জনশূন্য ছিল; কোন স্থানে আশ্রয় পাইবার উপায় ছিল না। বাবর ও তাঁহার অনুচরগণের দুর্দ্দশার একশেষ ছিল। আমরা এখানে এক রাত্রির বিবরণপ্রদান করিতেছি। তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে বাবর খাওয়ানকুঠি নামক গুহার পার্শ্বে উপনীত হইলেন। তখন প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল। তাঁহারা গুহার নিকট উপস্থিত হইলে রাত্রি সমাগত হইল। এ স্থানের পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; সঙ্কীর্ণ তুষারাবৃত পথে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বলিয়া বাবরের অনুচরগণ অশ্বপৃষ্ঠে রাত্রিযাপন করিবে বলিয়া অবধারণ করিল। গুহাটি এরূপ স্বল্পায়তন বলিয়া বোধ হইতেছিল যে, উহার অভ্যন্তরে সকলের স্থান সঙ্কুলন হইবে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না।

অনুচরগণ বাবরকে গুহার অভ্যন্তরে গমন করিয়া রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি অনুচরবর্গকে বাহিরে ফেলিয়া নিজে আরামে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা কষ্টভোগ করিবে, আর আমি আরামে থাকিব, তাহা হইতে পারে না। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টের ভাগ গ্রহণ করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। পারস্য ভাষায় প্রবচন প্রচলিত আছে যে, বন্ধুর সংসর্গে মৃত্যু ভোজের তুল্য।" বাবর অনাবৃত স্থানে বসিয়া রহিলেন, তাঁহাব মস্তকে, কর্ণে ও ওষ্ঠে চারি ইঞ্চি পুরু হইয়া তুষার পতিত হইল। এমন সময় তাঁহার অনুচরবর্গ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিল যে, গুহাটি প্রকাণ্ড ও উহার ভিতরে সকলেরই স্থান হইতে পারে। তখন বাবর হৃষ্টচিত্তে অনুচরগণ সহ গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে রাত্রিযাপন করিলেন। বাবর সৈনিকগণের সুখ দুঃখের সঙ্গে আপনার সুখ দুঃখ এইরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা তাদৃশ প্রভুভক্ত ছিল, এবং প্রভুর কার্য্যে জীবন তুচ্ছ বোধ করিত।

বাবর বহুকষ্টে কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, তদীয় পিতৃব্যপুত্র খান মিরজা (১) কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, এবং বহুসংখ্যক মোগলকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু বাবরের আগমনসংবাদ শ্রুত হইয়া তাঁহার বিপক্ষগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে লুক্কায়িত হইল। বাবর কাবুলে পঁহুছিয়া সর্ব্বপ্রথমে তদীয় মাতামহী শাহবেগমের (২) নিকট গমন করিয়া নতজানু হইয়া কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, "যদি মাতা এক সন্তানকে বিশেষরূপে ভালবাসেন,

(১) ইহাঁর মাতা সুলতানা নিগার বেগম বাবরের মাতার বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন।

(২) বাবরের মাতার বিমাতা; খান মিরজার মাতার মাতা।

তবে অপর সন্তান কেন ব্যথিত হইবে? মাতার স্নেহের সীমা নাই। আমি অনেকক্ষণ হইল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছি, এবং অনেক পথ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার কোলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। বাবরের আগমনসংবাদে শাহবেগম উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন; এ জন্য তিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে তাদৃশ সদ্ব্যবহার করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিদ্রাভিভূত হইবার পূর্ব্বেই মিহির নিগার খানম (৩) সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বাবর তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর মিহির নিগার খান মিরজাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন, “হে মাতৃপ্রাণ বাবর, আমি তোমার অপরাধী ভ্রাতাকে আনয়ন করিয়াছি। তোমার কি ইচ্ছা?” বাবর তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সস্নেহে কথাবার্ত্তা কহিলেন। তাঁহার স্নেহময় ব্যবহারে খান মিরজা লজ্জিত হইয়া কাবুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কান্দাহারে গমন করিলেন।

বাবর এই ভাবে অতি সহজে শত্রুকে বশীভূত করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং পাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে চক্রবর্ত্তী রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও শান্তি ভোগ করিতে পারিলেন না;—সর্ব্বদা নানা স্থানে খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন।

ইহার চারি বৎসর পরে বাবর পুনরায় সমরখণ্ডের রাজসিংহাসন উজবেগগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন। তাহাদের অত্যাচারে

(৩) মিহির নিগার বাবরের মাতার সহোদরা ভগিনী। ইনি বিমাতা শাহবেগমের অনুরাগিণী ছিলেন, এবং তাঁহার (শাহবেগমের) কন্যা সুলতানা নিগার বেগমের গর্ভজাত খান মিরজাকে অপত্যস্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বাবরের সঙ্গে কোন কারণে তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না।

দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। এজন্য সমগ্র দেশ একবাক্যে নব বিজেতাকে সাদরে গ্রহণ করিল। এই সময়ে বাবরের আধিপত্য বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। তাতার দেশের সীমান্তবর্ত্তী তাসখণ্ড ও সৈরাম হইতে কাবুল ও গজনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূখণ্ড ও সমরখণ্ড, হিসার, কুন্দেজ ও ফারগনা তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল।

কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী দীর্ঘকাল বাবরের অঙ্কশায়িনী রহিলেন না। তারিখ-ই-রসিদি গ্রন্থ ও বাবরের শিক্কা দেখিয়া অনুমিত হয় যে, তিনি পারস্যের শাহের করদ-রাজ-রূপে সমরখণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পারস্যের শাহ শিয়া-মতাবলম্বী ছিলেন। বাবরও বাধ্য হইয়া শিয়া ধর্ম্ম ও রীতি নীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার স্থন্নিমতাবলম্বী প্রকৃতিপুঞ্জের প্রাণে সহে নাই। তাহারা আর বাবরের পক্ষপাতী রহিল না; সইবানির ন্যায় সুন্নিধর্ম্মাশ্রিত দুরন্ত শাসনকর্ত্তাও তাহাদিগের নিকট স্পৃহনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সমরখণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জের তাদৃশ মানসিক অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এক জন উজবেগ সেনাপতি পুনরায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাবর সম্মুখযুদ্ধে বারংবার পরাভূত হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; বাবর আর কোন স্থানে মাথা রাখিবার স্থানপ্রাপ্ত না হইয়া অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ কাবুলে পুনরাগমন করিয়া শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

সমরখণ্ডে তৈমুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্রবর্ত্তিত্ব করাই বাবরের জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। তদীয় পিতার অপমৃত্যুকালে ফারগনার রাজসিংহাসন একান্ত বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। বাবর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই প্রবল বিঘ্নরাশি হইতে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সে বিঘ্নরাশি দূরীভূত হইতে না

হইতেই তিনি সমরখণ্ডে তৈমুরের পরিত্যক্ত সিংহাসনের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। এবং তাঁহার মহিমাচ্ছায়ায় অভিনব সাম্রাজ্যের সংগঠন করাই আপনার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য বলিয়া স্থির করেন। এ জন্ত বাবর ক্রমান্বয়ে দুইবার সমরখণ্ড বিজয় করেন; কিন্তু বিধিচক্রে এক-বারও তথায় স্থায়িভাবে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাহার পর বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানা স্থানে সঞ্চালিত হইয়া কোথাও দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া অবশেষে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে বাবর কাবুলে আধিপত্য সংস্থাপন করেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পারেন যে, তৈমুরের সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার মহিমাচ্ছায়ায় অভিনব সাম্রাজ্যের সংগঠন করিবার আশা সুদূরপরাহত। বাবরের প্রকৃতি কখনও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিত না। কাবুলের ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া তাঁহার প্রকৃতি নিরস্ত হইতে পারে নাই। বাবর ভারতবিজয় করিয়া স্বীয় হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার ভারতবিজয়ে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব হইতেছিল; এ দিকে পুনরায় অনুকূল বাতাস বহিতে আরম্ভ করে, এবং বাবর ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য্য করতলগত করিবার কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বাতাসে ভর করিয়া আপনার লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইয়া সমরখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করেন। কিন্তু কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ বৎসর গত হইতে না হইতেই তাঁহার ক্ষমতা পুনর্ব্বার ক্ষুদ্র কাবুল রাজ্যে সীমাবদ্ধ হয়। তৃতীয় বার অকৃতকার্য্য হইবার পর সমরখণ্ডে চক্রবর্ত্তিত্ব করিবার শেষ আশা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "৯১০ হিজিরী অব্দে

(১৫০৪—৫ খৃঃ) কাবুলবিজয়ের সময় হইতে আমি সর্ব্বদাই হিন্দুস্থান বশীভূত করিবার জন্য অভিলাষী ছিলাম। কিন্তু কোনও সময়ে বা আমার আমীরবর্গের দুর্ব্ব্যবহার এবং আমার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের অনভিপ্রায়বশতঃ, কোনও সময়ে বা আমার ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধাচরণ ও ষড়যন্ত্র নিবন্ধন আমি সে দেশে সৈন্য সমভিব্যাহারে গমন করিতে পারি নাই; তাই তত্রত্য রাজ্যসমূহ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। অবশেষে এই সমুদয় বাধা বিপত্তির অবসান হইয়াছিল। কি ছোট, কি বড়, কি সামন্ত, কি সাধারণ ব্যক্তি, কেহই এই দুরূহ কার্য্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে সাহস করেন নাই। ৯২৫ হিজিরী অব্দে আমি সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে দুর্গ অধিকার করিয়া তত্রত্য নিযুক্ত সৈন্যদিগকে তরবারিমুখে সমর্পণ করিয়াছিলাম। তদনন্তর আমি অগ্রসর হইয়া বাহবাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম; এখানে লুণ্ঠন ও লুণ্ঠন জন্য পরিভ্রমণ নিবারণ করিয়া অধিবাসীদিগকে নির্দ্দিষ্ট হারে অর্থপ্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম, এবং নগদ অর্থে এবং নানাবিধ দ্রব্যে চারি লক্ষ শাহরুখি আদায় করিয়া আমার কর্ম্মাধীন সৈন্যবৃন্দের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তার পর কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই সময় (৯২৫) হইতে ৯৩২ হিজিরী (১৫২৬ খৃঃ) পর্য্যন্ত আমি হিন্দুস্থানের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে নিরত ছিলাম, এবং সাত আট বৎসরে সসৈন্যে পাঁচ বার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। পঞ্চমবার মহান্ পরমেশ্বর করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সুলতান এব্রাহিমের ন্যায় প্রবল শত্রুকে পরাভূত করিয়া আমাকে গৌরবপূর্ণ হিন্দু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন।”

বাবরের চতুর্থবার ভারত অভিযানকালে সুলতান এব্রাহিম হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এব্রাহিম দুর্ব্বলচিত্ত শাসনকর্ত্তা

ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজত্বকালে রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ হইতে-ছিল। তদীয় ভ্রাতা বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলে কতিপয় আমীর ওমরাহ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। এব্রাহিম অবাধ্য ভ্রাতাকে দমন করিবার জন্ম রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এব্রাহিম রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী ধারণ করিয়া আমীরবর্গের সঙ্গে নৃশংস ব্যবহার করাতে সমগ্র দেশে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে, এবং সেই সুযোগে পঞ্চনদ প্রদেশের ক্ষমতা-শালী শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করেন।

হিন্দুস্থানের এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সময় দিল্লীর রাজবংশসম্ভূত আলাউদ্দীন ওরফে আলম খাঁ (সম্পর্কে এব্রাহিমের পিতৃব্য) পলায়ন করিয়া কাবুলে বাবরের নিকট উপনীত হন, এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকারকল্পে নির্ব্বন্ধসহকারে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আলম খাঁর কাবুল দরবারে উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলতখাঁ বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে আহ্বান করিলেন। দিল্লীর রাজসিংহাসন অধিকার করিবার সর্ব্বোত্তম অবসর উপস্থিত দেখিয়া বাবর রণসাজে সজ্জিত হইলেন। এব্রাহিমের কঠোর ব্যবহারে প্রকৃতিপুঞ্জ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল, এবং অন্তর্দ্রোহে রাজশক্তি ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের ঈদৃশ মানসিক গতির সময় হিন্দুস্থানের একজন রাজকুমার সহযোগী থাকিলে অতি সহজে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া, বাবর আলম খাঁকে সাহায্য প্রদান করি-বার ব্যপদেশে বিপুল সৈন্য সহ অচিরে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন। বাবর তথায় উপনীত হইয়া সমগ্র প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক আলম খাঁকে দিবলপুরের শাসনকর্ত্তৃপদে বরণ করিলেন; কিন্তু দৌলত খাঁর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সঙ্গে তাদৃশ সদ্ব্যবহার করিলেন না।

দৌলত খাঁ বাবরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

বাবর কতিপয় বিশ্বস্ত সৈনিক পুরুষকে পঞ্জাব রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং কোন গুরুতরকারণবশতঃ কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার পঞ্জাব পরিত্যাগের পর দৌলতখাঁ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আলম খাঁকে দিবলপুর হইতে তাড়াইয়া দিলেন, এবং মোগল রাজ-পুরুষদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। আলম খাঁ দিবলপুর হইতে তাড়িত হইয়া কাবুলে গমন করিলেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বাবর পাদশাহ আলম খাঁকে সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন। দৌলত খাঁ চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু মোগলের আক্রমণে তাঁহার বিপুল সৈন্য বায়ুমুখে কার্পাসতুলার ন্যায় উড়িয়া গেল। অতঃপর বাবর শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে সসৈন্যে শিবিরসংস্থাপন করিলেন।

বাবর পাণিপথে শিবিরসংস্থাপন করিলে এব্রাহিম তথায় সসৈন্যে উপনীত হইলেন। আমরা বাবরের স্বরচিত জীবনবৃত্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"আমাদের বিরুদ্ধে সমবেত শত্রুসৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, এইরূপ অনুমিত হইয়াছিল। সম্রাটের সেনানায়ক ও হস্তীর সংখ্যা এক সহস্র ছিল। তিনি পিতা ও পিতামহের সঞ্চিত ধনরাশির অধিকারী ছিলেন। এই ধনরাশি প্রচলিত মুদ্রায় আবদ্ধ ছিল, এজন্য উহা অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারিত। শত্রুগণ যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তদনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে যে সকল যুদ্ধব্যবসায়ী বেতন গ্রহণ করিয়া কাজ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিবার রীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত

আছে। এই সৈন্যদিগকে 'বধিন দি' (Badhin di) বলে। যদি এব্রাহিম এই রীতির অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আরও এক লক্ষ কি দেড় লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রত্যেক বিষয় মঙ্গলের জন্যই পরিচালিত করিয়াছিলেন। এমন কি, নিজের সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না; তিনি আপনার ধনরাশি ব্যয় করিতেন না। তিনি যতদূর সম্ভব কৃপণ ও ধনসঞ্চয়ে অপরিমিত প্রয়াসী ছিলেন; এরূপ অবস্থায় সৈন্যদিগকে কিরূপে সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর? তিনি অপরিণতবয়স্ক, অনভিজ্ঞ এবং সৈন্যপরিচালনা সম্বন্ধে অমনোযোগী ছিলেন; তিনি বিশৃঙ্খলভাবে অভিযান অথবা প্রস্থান করিতেন, এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি না করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। যে সময় সৈন্যগণ পাণিপথ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আপনাদের অবস্থানভূমি কামান, বৃক্ষশাখা ও পরিখা দ্বারা সুদৃঢ় করিতেছিল, তখন দরবেশ মোহাম্মদ সারবান আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদের অবস্থানভূমি এরূপ সুদৃঢ় করিয়াছেন যে, ইহা সম্ভবপর নহে যে, তিনি কখনও এখানে আসিতে উদ্যত হইবেন'।"

উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত নীরব রহিল; কেহই অগ্রসর হইয়া প্রথমে আক্রমণ করিল না। ন্যূনাধিক এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে ২০শে এপ্রিল তারিখে রাত্রিযোগে বাবর আকস্মিক আক্রমণে শত্রুশিবির অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অন্ধকারবশতঃ সৈন্যশ্রেণী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়াতে তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না। মোগল সৈন্য অতি সহজে পরাস্ত হওয়াতে এব্রাহিম তাহাদের সামরিক বল নগণ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং তজ্জন্য আশ্বস্তচিত্তে পর দিবস প্রাতে সসৈন্যে গড়বন্দী পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ

হইল ; দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে বিজয়শ্রী বাবরের গলদেশে জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। আফগান সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় পঞ্চদশ সহস্র আফগান সৈন্য স্বীয় প্রভুর কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। এবং স্বয়ং এব্রাহিম শত্রুহস্তে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। (১) মোগল সৈন্য সগৌরবে তাঁহার ছিন্ন শির বাবরের নিকট আনয়ন করিল। বাবর লিখিয়াছেন, "সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও কৃপায় এই দুরূহ কার্য্য আমার নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল, এবং সেই বিপুল বাহিনী অর্দ্ধদিবামধ্যেই ধূলবিৎ উড়িয়া গিয়াছিল।" সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার জন্য বাবর দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এবং পর দিবস প্রাতে স্বয়ং আগ্রার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার রাজধানীর মসজিদে মসজিদে নূতন সম্রাটের নামে খোতবা পঠিত হইল।

বাবর দিল্লী ও আগ্রার রাজকোষ করতলগত করিয়া স্বপ্নাতীত ধনরাশি লাভ করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রথমেই এই বিপুল ধনরাশি অর্থ-

(১) পাণিপথের সমরক্ষেত্রে আফগান গৌরবের সমাধি হইয়াছিল। তাহারা শোকাবেগে অকর্ম্মণ্য এব্রাহিমকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তির উচ্চাসন প্রদান করে। পাণিপথের যুদ্ধের বহু পরেও আফগানগণ এব্রাহিমের সমাধিস্তম্ভের নিকট উপনীত হইয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত। পাণিপথ লোকের ভীতিস্থল ছিল, রাত্রিতে কেহই সে স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে সাহসী হইত না। লোকের বিশ্বাস ছিল,—তথায় রাত্রিকালে ক্রন্দনধ্বনি, আর্ত্তনাদ ও নানাপ্রকার অস্বাভাবিক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসবেত্তা বদায়ূন সত্যপ্রিয় বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি একদিন রাত্রিযোগে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সে স্থান দিয়া গমনকালে অস্বাভাবিক শব্দ শুনিয়া ভীতিবিহ্বল হন, এবং বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের নাম জপ করেন।

লোলুপ সৈন্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে তিনি অসামান্য দানশীলতা প্রদর্শন করেন। রাজকুমার হুমায়ুন রণক্ষেত্রে অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে সতর লক্ষ দাম (বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিন লক্ষ টাকা) প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করেন। তাঁহার প্রধান প্রধান বেগ-গণের প্রত্যেকে স্ব স্ব পারদর্শিতানুসারে ছয় লক্ষ হইতে দশ লক্ষ দাম (বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৫ হাজার হইতে ৪২ হাজার টাকা) প্রাপ্ত হন। সৈনিক পুরুষমাত্রেই গুণানুসারে অল্লাধিক অর্থলাভ করেন; এমন কি, শিবিরসঙ্গী ও দোকানদারগণও এই অদৃষ্টপূর্ব্ব "খয়রাতের" সময় বঞ্চিত হইয়াছিল না। এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত রাজকুমার ও আত্মীয় স্বজনকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও ক্রীতদাস দাসী, ফারগনা, খোরসান, কাশঘর ও পারস্যের বন্ধুগণকে আপ্যায়িত করিবার জন্য নানাবিধ উপঢৌকন এবং হিরাট, সমরখণ্ড, মক্কা ও মদিনার সাধুপুরুষ-গণকে সম্মানিত করিবার জন্য মহার্ঘ দ্রব্য প্রেরিত হয়। অবশেষে বিজয়োৎসব উপলক্ষে বাবর স্ত্রী পুরুষ, বাল বৃদ্ধ, স্বাধীন পরাধীন নির্ব্বিশেষে কাবুলিদিগকে এক একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করেন। এইরূপে মুক্তহস্তে দান করিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা রাজ্যশাসনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজকোষে সঞ্চিত হয়। বাবর নিজে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিয়াছিলেন না। তিনি কখনও অর্থলোভী ছিলেন না; তাঁহার সংস্কার ছিল, বিতরণেই অর্থের সার্থকতা; তাহাতেই তিনি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। (১)

---

(১) বিজয়ী মোগল সৈন্য আগ্রাতে প্রবেশ করিলে জনৈক হিন্দু রাজার অবরুদ্ধ বিধবা মহিষী রাজকুমার হুমায়ুনকে এক খণ্ড বহুমূল্য হীরক উপহার প্রদান করেন। বাবর লিখিয়াছেন, ইহার মূল্য সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধ দিবার ব্যয়। রাজকুমার বাবরকে এই হীরকখণ্ড প্রদান করিলে তিনি উহা নিজে না রাখিয়া তাঁহাকেই

বাবর বিশ্ববিশ্রুত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু ভারতের স্ব স্ব প্রধান স্বাধীন অধিপতিগণ (বাবরের ভারতবিজয়কালে বহুসংখ্যক স্বপ্রধান স্বাধীন রাজ্য ছিল) তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন; দিল্লীর শাসনাধীন প্রদেশসমূহ সহজে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না। এই সময়ে দিল্লীর আধিপত্য পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ হইতে অনুগাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত ও হিমালয়ের পাদদেশ হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগ্রার চতুষ্পার্শ্বে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জলিত ছিল। অন্যান্য প্রদেশের প্রজাবর্গ ও নবাগত মোসলমান সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন,—"আমার আগ্রায় আগমনকালে গ্রীষ্মঋতু সমাগত হইয়াছিল। ভীতিবিহ্বল হইয়া সমগ্র অধিবাসী পলায়ন করাতে আমাদের আহার্য্য শস্য ও অশ্বের জন্য ঘাসের অভাব হয়। পল্লীবাসীরা আমাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতাবশতঃ বিদ্রোহী হইয়া চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তিতে নিরত হইয়াছিল। রাজকোষের ধনরাশি বণ্টন করিয়া দিবার পর বিভিন্ন পরগণা ও মহকুমা অধিকার ও রক্ষা

পুনর্ব্বার অর্পণ করেন। সুবিখ্যাত বেভারিজ সাহেব ব্রিটীশ মিউজিয়মে রক্ষিত এক খানি হস্তলিখিত গ্রন্থে দেখিয়াছেন যে, হুমায়ূন এই অত্যুজ্জল হীরকখণ্ড পারস্যের শাহকে অর্পণ করেন, এবং পারস্যের শাহ তাহা তত দূর মূল্যবান মনে না করিয়া দক্ষিণাপথের নিজাম শাহকে দান করেন। বেভারিজ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মীরজুম্লা মোগল সাম্রাজ্যের সেনাপতি-পদে বৃত হইয়া শাহজাহানকে যে মহামূল্য হীরকখণ্ড উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন, তাহা এই হীরক। মীরজুম্লা মোগল সাম্রাজ্যের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে গোলকুণ্ডার সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। বাবর হুমায়ূনের প্রাপ্ত হীরকের ওজন আট মিস্কাল অর্থাৎ ৩২০ রতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মোগল দরবারের বিশেষজ্ঞ ট্যাভারনিয়ারও স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কোহিনূরের ওজন ৩১৯৷৹ রতি। অতএব উভয় হীরক এক হওয়া অসম্ভব নহে।

করিবার জন্য উপযুক্ত লোক পাঠাইবারও অবসর পাই নাই। ঘটনা-ক্রমে এই বৎসরই অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল ; এই সময় অনেক লোক সাইমনবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় পঞ্চত্ব লাভ করে।

"এই সব কারণে আমার অনেক বেগ ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা উৎসাহহীন হইয়া হিন্দুস্থানে অবস্থান করিতে আপত্তি প্রদর্শন করেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আয়োজনেও প্রবৃত্ত হন। (১) সৈন্যগণের এইরূপ অসন্তোষের বিষয় শুনিবামাত্র আমি সমস্ত বেগকে দরবারে আহ্বান করি। * * * আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি আমার প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিয়াছি, এবং বহুসংখ্যক দেশ ও রাজ্য বিজয় করিয়াছি ; এই সব দেশ এক্ষণে আমাদের অধীনে রহিয়াছে। বাঞ্ছিত-ফললাভের জন্য সমস্ত জীবন ক্ষয় করিয়া প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত কোন দুঃখে আমরা বিজিত দেশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিরাশা ও পরাজয়ের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কাবুলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইব ? যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা যেন অতঃপর আর কখনও এমন প্রস্তাব না করে। কিন্তু তোমাদের

(১) বেগ-গণ ভারতবর্ষের প্রতি কিরূপ বিরূপ হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা এ স্থানে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। বাবর হিন্দুস্থান বিজয়ের পর খাজে কনান নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বেগকে গজনীর শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষ-পরিত্যাগের প্রাক্কালে খাজে দিল্লীর প্রাচীরগাত্রে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি লিখিয়া যান।

If safe and sound I pass the Sind,
Damned if I ever wish for Hind.

বাবর ইহার উত্তরে লিখেন,

Babar ! Give all thanks that the favour of God Most High
Hath given the Sind and High and wide spread royalty.
If the heat of India make thee long for the mountain cold,
Remember the frost and ice that numbed thee in Ghazni of old.

মধ্যে যদি এমন কেহ থাকে যে, এখানে অবস্থান করিতে অনিচ্ছুক হয়, অথবা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তবে তাহাকে যাইতে দাও।' তাহাদের নিকট এইরূপ সঙ্গত প্রস্তাব করিবার পর, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ যতই অনিচ্ছায় হউক না কেন, বাধ্য হইয়া স্ব স্ব অশান্তিজনক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে।"

হিন্দুস্থানের সিংহাসনাধিকারের পর বাবর চতুর্দ্দিকে বিপদাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহাকে বিপন্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হয় নাই। বালসূর্য্যের কিরণের ন্যায় বাবরের গুণাবলী দেশের সর্ব্বত্র অচিরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং বহু কালের অত্যাচারদগ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে দয়া দাক্ষিণ্যে অলঙ্কৃত দেখিয়া মোগলের সিংহাসনতলে শান্তিচ্ছায়া লাভ করিবার আশায় একে একে বশ্যতা স্বীকার করিল। সুবিখ্যাত ম্যালিসন লিখিয়াছেন, "The difficulty of Babar in conquering India arose from independent Musalman Kings and Hindus who considered Babar as an intruder and oppressor of their rights and an discontented army." বাবর হিন্দুদিগকে সদ্ব্যবহারে প্রীত করিয়া, স্বাধীন অধিপতিদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া, এবং সৈন্যবৃন্দকে কৌশলে বশীভূত করিয়া, পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুকুলসদৃশ সাম্রাজ্য উত্তরকালে পূর্ণ বিকশিত হইলে উহার সৌরভ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার শোভায় মুগ্ধ হইয়া বৈদেশিক বণিকগণ দলে দলে মধুলোভে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বাবর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাবরের সমসাময়িক রাজন্যবর্গ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর

হইয়াছিলেন। তাঁহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কোন চিহ্নই ধরণীপৃষ্ঠে অঙ্কিত নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমায় বাবর অমরত্ব লাভ করিয়া আজও শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন। ফলতঃ, বাবর যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যদি আমাকে বিনাশ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় না থাকে, তবে সমগ্র পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও আমার একটি শিরাও কর্ত্তন করিতে পারিবে না। (১)

বাবর নিষ্কণ্টক হইয়া হিন্দুস্থানের শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। (২) রত্নপ্রসূ হিন্দুস্থানের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াও তাঁহার হৃদয় হইতে সমরখণ্ডের আশা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এজন্য দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি শাহজাদা হুমায়ুনকে সমরখণ্ড বিজয়ার্থ প্রেরণ করেন।

বাবরের ভারতবর্ষে আগমনের পর ন্যূনাধিক পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত

---

(১) একজন ইংরেজ কবি বাবরের এই মহাকাব্য নিম্নলিখিত ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন,—

Brandish the sword of the world as you may,
It can cut no vein if God says, 'nay'

(২) বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষে যে সকল যুদ্ধে লিপ্ত হন, আমরা এখানে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(ক) চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহ অতিশয় পরাক্রান্ত অধিপতি ছিলেন। বাবর তাঁহাকে সিক্রির যুদ্ধে পরাভূত করেন। সংগ্রাম সিংহ এত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি বাবরের হস্তে পরাজিত না হইলে সম্ভবতঃ দিল্লীর অধীশ্বর হইতে পারিতেন।

(খ) বাবর চান্দেরী দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। দুর্গের অবরোধকালে দুর্গবাসীরা অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন। রমণিগণ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করেন। এই সময় রাজপুতকুলোদ্ভব মেদিনী রায় দুর্গাধিপতি ছিলেন।

(গ) বাবরের রাজত্বের প্রারম্ভে বিহারে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। বাবর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিহারে শান্তিসংস্থাপন করেন।

হইলে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ সমাগত হইল, এবং হুমায়ূন অভীষ্ট বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া জনকজননীকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পূর্ব্বে কোন সংবাদ প্রেরণ না করিয়াই হঠাৎ আগ্রাতে উপনীত হইলেন। বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "আমি হুমায়ূনের মাতার সঙ্গে তাঁহার বিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম, এমন সময় হুমায়ূন আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার আগমনে আমাদের হৃদয় গোলাপ মুকুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত ও আমাদের নয়ন বর্ত্তিকার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভোজনের সময় আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা আমার নিয়ম; কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ ভোজের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলাম; আমরা পরম ঘনিষ্ঠতায় কিয়দ্দিবস একত্র বাস করিয়াছিলাম।"

বাবর তাঁহার পুত্রকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা ইহার কতিপয় মাস পরে প্রকাশিত হয়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হুমায়ূন প্রবল জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে নিরাময় করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন যে, ঈশ্বরের নিকট কোন মহান উৎসর্গ ব্যতীত হুমায়ূন এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। এ কথা বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি পুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মৌলবীগণ তাঁহাকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে রাজকোষের সঞ্চিত ধনরাশি, এমন কি, তাঁহার নিজের জীবন ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই উৎসর্গ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন। বাবর কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না; তিনি বলিলেন, "আমার পুত্রের সঙ্গে কোন্ রত্নের তুলনা হইতে পারে?" তিনি পুত্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকের সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং তাহার পর রুগ্ন পুত্রের চতুর্দ্দিকে বারত্রয় পরিক্রমণ করিতে করিতে

বলিতে লাগিলেন, 'ইহার সমস্ত ব্যাধি আমাতে ন্যস্ত হউক।' ইহার পর হুমায়ূন সুস্থ হইলেন। কিন্তু বাবর ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। (১) তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া হুমায়ূনকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ কাবুলের শৈলমালার গাত্রদেশে অবস্থিত একটি রমণীয় উদ্যানবাটিকার মধ্যস্থলে মহাসমারোহে সমাহিত হয়। বাবর এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তথায় মৃত্যুর পর সমাহিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিমন্দির প্রকৃতির রম্য স্থানে অবস্থিত; উহার চারিদিকে সুরভি কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত ও সম্মুখভাগে নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। বাবর কত দিন এই নির্ঝরিণীর তটে উপবেশন করিয়া রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইতেন। এখনও যাত্রিগণ দলে দলে এই স্থানে আগমন করিয়া মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত সমাধিমন্দিরে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়া থাকে। বাবর ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিগাথা এখনও গীত হইতেছে।

> "Death makes no conquest of this Conqueror.
> For now he lives in Fame."

বাবর দুই কারণে মানবজাতির মনোমন্দিরে স্থানলাভ করিয়াছেন। প্রথম, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়, আত্মজীবনবৃত্ত

---

(১) "The frequent illness from which he had suffered in India, culminating in the nervous prostration that succeded his anxiety for his son had undermined his great strength."—*Stanley Lane Poole*

রচনা (১) এই গ্রন্থে "একটি অকৃত্রিম আদর্শ চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ" করিতেছে। এই জীবনবৃত্ত অবলম্বনে লিখিত স্কাইনের গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া আমরা তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাবর সাহসী, তেজস্বী ও প্রতিভাশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা "মানব সাধারণের মনের উপর বিশাল শক্তি সহকারে কার্য্য করিয়াছে।" এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই সাধারণ মানবগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিয়াছে। বাবর সরলহৃদয়, সদাপ্রফুল্ল ও আত্মীয় স্বজনে বিশ্বাসবান ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় দুঃসহ কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা এক দিনের জন্যও বিনষ্ট হয় নাই। কি দুঃসহ ক্লেশভোগের সময়, কি প্রৌঢ়াবস্থায়, তিনি আজীবন যুবকের ন্যায় প্রফুল্লচিত্ত ও উদ্যমশীল ছিলেন। বাবর পারিবারিক গুণের আধারস্বরূপ ছিলেন;—তিনি আত্মীয় স্বজনে একান্ত প্রীতিবান ও ধনী নির্ধন বালবৃদ্ধস্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী ছিলেন। অধিকাংশ মোসলমান নরপতি বাহাড়ম্বরপ্রিয় ও আত্মপরায়ণ; বাবর সরলহৃদয় বন্ধুবৎসল। প্রৌঢ় বাবর বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছেন, এবং তাহা অকপটচিত্তে আত্মজীবনবৃত্তে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তকের নানাস্থানে মাতা ও অন্যান্য পুরমহিলার সম্বন্ধে এরূপ গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে

(১) "His permanent place in History rests upon his conquests which opened the way for an imperial line."—*Stanley Lane Poole.*

"His autobiography is one of those treasures which are for all time and is fit to rank with the confessions of St. Augustine and Rousseau and the memoirs of Gibhon and Newton—In Asia it stands almost alone."—*H. Beveridge.*

মনে হয়, যেন তিনি তাঁহাদের অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কখনও বহির্ভাগে গমন করেন নাই। বন্ধুবর্গের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার সংস্রব ছিল বলিয়া আত্মজীবনবৃত্তে তাঁহার নিজের চিত্রের ন্যায় তদীয় বন্ধুবর্গের চিত্রও পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। বাবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা হাইদার আলি লিখিয়াছেন, "তিনি (বাবর) নানা গুণে অলঙ্কৃত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে সদাশয়তা ও দানশীলতাই সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল।" তাঁহার আদেশে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নিহত হইয়াছে। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক প্রাণদণ্ডেও তিনি আপনার প্রবৃত্তিবশে কোন কার্য্য করেন নাই; সে সময়ের রীতি নীতির অনুগত হইয়াই তাদৃশ কঠোর আদেশ প্রদান করিতেন। বাবরের কোন ভ্রাতাই হউন, কিম্বা তাঁহার কোন সামন্তই হউন, যিনিই বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া অথবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে আত্মাপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতেন, তাঁহাকেই তিনি আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আরব্য, পারস্য ও ভারতবর্ষের রাজনীতি উপেক্ষা করিয়া অকপটচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষশূন্য হইয়াছেন। বাবর কেবলমাত্র পুরুষোচিত গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন না, নানাবিধ সুকুমার বিদ্যাতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পারসী ও তুর্কি ভাষায় বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কবিতা ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে অতি প্রসিদ্ধ। এমারত ও কৃষিকার্য্যেও তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরাঙ্মুখ ছিল না। তিনি উদ্যানবাটিকা ও প্রাসাদনির্ম্মাণকালে সমস্ত কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে ভালবাসিতেন। বাবর কৈশোর হইতে আমরণ অসিহস্তে যাপন করিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রামসুখ অল্পই ঘটিয়াছে। রণকোলাহল হইতে অতি অল্প সময়ের

জন্যই দূরে থাকিতে পারিয়াছেন। এরূপ অবস্থাতেও তিনি যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ মেধা ও প্রবল জ্ঞানলিপ্সার পরিচায়ক। বাবরের অসাধারণ শারীরিক বল ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি আমোদের জন্য গঙ্গানদী সন্তরণ পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়াছি। অভিযানকালে যে সকল নদী আমার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক গঙ্গা ব্যতীত আর সকল নদীই সন্তরণপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়াছি।" তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ ক্রোশ অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারিতেন! তাঁহার দ্রুতগতি বিস্ময়কর ছিল।

বাবর ঈদৃশ নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার সমসাময়িক তৈমুরবংশীয় রাজন্যবর্গ জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া গেলেও তিনি ধরণীপৃষ্ঠে পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া ইহজীবন শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। যে সময় কিশোরবয়স্ক (একাদশ বৎসর) বাবর ক্ষুদ্র ফারগনার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎকালে ফারগনার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে তৈমুরবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা বিলুপ্ত হইয়াছিলেন। বৈদেশিক আক্রমণে অথবা রাজপুরুষগণের বিশ্বাসঘাতকতায় এই রাজন্যবর্গ স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিলেন। বাবরও এই প্রবল বন্যায় ভাসমান হইয়াছিলেন, এবং উহা তাঁহাকে দূরদেশে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল; কিন্তু সন্তরণপটু বাবর আপনার উদ্যমে কূলপ্লাবী তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া তটদেশ প্রাপ্ত হন। যদি তিনিও তৈমুরবংশীয় অন্যান্য রাজগণের ন্যায় এই বন্যায় নিমগ্ন হইতেন, তাহা হইলে সেই বিপুল বংশের রাজনাম চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু বাবর আত্মরক্ষা করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে আমু হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবর জীবনের অধিকাংশই সমরকোলাহলের মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি রণক্ষেত্র হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেই যে বিশ্রামকালে স্বভাবসুলভ উদ্যম ও উৎসাহসহকারে রাজ্যশাসনের শৃঙ্খলা ও প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতিবিধান করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাবর জীবনের সায়াহ্নকালে হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ন্যূনাধিক পঞ্চবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে অনবরত সন্ধিবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

বাবর সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। এই সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের কোন সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল না। নরপতির অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক বিভাগ, এমন কি পল্লী পর্য্যন্তের শাসনকার্য্য সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে স্থানীয় আচার ব্যবহারের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য দেশে নিয়মবদ্ধ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে গ্রাম্য অথবা বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ তাহার বিচার করিতেন; কোন কোন স্থলে পঞ্চায়েত প্রথামতেও বিবাদের মীমাংসা হইত। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার নিকট অভিযোগ করা চলিত; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিয়মবদ্ধ প্রণালী ছিল না। কাজিগণ মোসলমান প্রজাপুঞ্জের বিচার করিতেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। তাঁহারা কেবলমাত্র বিবাহ অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিতেন। ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদ গ্রাম্য কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক মীমাংসিত না হইলে বিভাগীয় কর্ম্মচারী,

জমীদার অথবা জায়গীরদার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমায় (যত দূর গুরুতর ব্যাপারই হউক না কেন) অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচালন করিতেন।

বাবর অষ্টচত্বারিংশত্তম বর্ষে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। অপরিমিত সুরাপানই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ। যদি তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইতেন, তাহা হইলে এই অসাধারণ যোদ্ধা হয় ত রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের অভিনব সুপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া জনসমাজে একজন রাজনীতিচূড়ামণি বলিয়াও প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। বাবর দ্বাবিংশ বৎসরের পূর্ব্বে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু এই সময় হইতে সুরাপানে আসক্ত হন। তিনি বন্ধুগণ সহ সুরাপানে কিরূপ প্রমত্ত হইতেন, তাহার অনেক বর্ণনা তদীয় স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াও যেরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, সুরাপানসভার বর্ণনাতেও তাঁহার তদনুরূপ আনন্দ ছিল। কিন্তু কার্য্যকাল সমাগত হইলে তিনি সর্ব্বদাই আত্মসংযমে সমর্থ হইতেন। তিনি সুরামত্ত হইয়া কখনও কোন কার্য্য পণ্ড করেন নাই। তিনি যে ভাবে এই বদ্ধমূল অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মানসিক বলের পরিচায়ক। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবর রাণা সঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ন্যায় প্রবল শত্রুর সহিত তিনি আর কখনও আপন শক্তির পরীক্ষা করেন নাই। সুরাপান এসলামশাস্ত্রবিরুদ্ধ, এই যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার মনে সহসা উদিত হয় যে, এসলাম শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী মোসলমানের প্রতি কখনও রণদেবতা প্রসন্ন হইতে পারেন না। রণদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ মদ্যপান

পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পান-পাত্রসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন; তাহার পর সুরাভাণ্ডসমূহ মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিয়া কথায় দাতব্যগৃহ নির্ম্মাণ করেন। বাবর এই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য সমস্ত মোসলমান প্রজাকে তমঘা (Stamp tax) হইতে মুক্তি প্রদান করেন। বাবর লিখিয়াছেন, তিনি মন পবিত্র করিবার জন্য সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

হুমায়ূন ও শের শাহ।
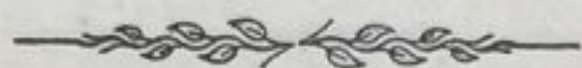
১

মোগলকুলতিলক বাবর পরলোকগমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নাশের উদ্দীন মোহাম্মদ হুমায়ূন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে হুমায়ূনের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল; তিনি ফলিত জ্যোতিষের আলোচনায় অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার জন্য সাতটি কক্ষ সুসজ্জিত করিয়া সপ্ত গ্রহের নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই সকল কক্ষের গৃহসজ্জা, চিত্রাবলী ও ভৃত্যগণের পরিচ্ছদ অধিষ্ঠাতা গ্রহগণের চিহ্ন (emblem) দ্বারা বিশেষিত ছিল। যে দিন যে গ্রহের প্রভাব বিদ্যমান থাকিত, সেদিন সেই গ্রহের নামানুসারে কল্পিত কক্ষে হুমায়ূন দরবার করিতেন। রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার যে গুণের প্রাধান্য থাকিত, তাঁহাকে তদ্রূপগুণবিশিষ্ট গ্রহের নামে কথিত কক্ষে উপস্থিত হইতে হইত। কবি, পরিব্রাজক ও বিদেশীয় রাজদূত সোমকক্ষে, বিচারক, শাস্ত্রবেত্তা ও কার্য্যাধ্যক্ষ বুধকক্ষে, এবং সৈনিক পুরুষ বৃহস্পতিকক্ষে রাজদর্শন লাভ করিতেন। (১)

হুমায়ূন রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য চতুর্ভূতের নামানুসারে চারিটি বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—আতসী, হাওয়াই, আবি ও খাকি। এই বিভাগ চতুষ্টয়ের কার্য্যসম্পাদনের জন্য চারি জন মন্ত্রী নিযুক্ত

(১) বৃহস্পতি নামক গ্রহের পাশ্চাত্য নাম Mars. পাশ্চাত্য পুরাণশাস্ত্রে (mythology) mars রণ-দেবতা বলিয়া বর্ণিত।

ছিলেন। যে সকল দ্রব্য (যথা, নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র ও যন্ত্র প্রভৃতি) প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নির আবশ্যক হইত, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য আতসী বিভাগের অন্তর্ভুক্তছিল। পরিচ্ছদগৃহ, পাকশালা ও আস্তাবল প্রভৃতি হাওয়াই বিভাগের অধীন ছিল। সরবতখানা, সুজিখানা ও খাল (canal) প্রভৃতির কার্য্য আবি বিভাগের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইত। কৃষি, পূর্ত্ত, খালসা ভূমি ও কোন কোন গৃহকার্য্যের জন্য খাকি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অখণ্ড শান্তির সময়েই এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদের উপভোগ সম্ভবপর। হুমায়ূন দীর্ঘকাল এইরূপ নির্দ্দোষ খেয়াল লইয়া অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। নানাবিধ গুরুতর রাজকার্য্যে বিব্রত হইয়া তাঁহাকে এ সব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বাবরের আর তিন পুত্র ছিল; কামরান, হিন্দাল ও মিরজা আস্করী। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র হুমায়ূনকেই দিল্লীর সাম্রাজ্যভার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অপর রাজকুমারগণের রাজসিংহাসনে কোনও দাবী ছিল না। কিন্তু কামরান রাজ্যলালসা দমন করিতে না পারিয়া পঞ্জাবের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি বীরপ্রসূ সুদৃঢ় আফগানভূমির শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে তথায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, হুমায়ূন নববিজিত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। সুতরাং সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা কামরানের অধিক সুবিধা ছিল। হুমায়ূন এই সকল বিবেচনা করিয়া কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশ কামরানকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার উচ্চাশা চরিতার্থ করিলেন। কাবুল রাজ্যকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সমীচীন হইয়াছিল না। অনুরক্ত কাবুলী সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত নববিজিত দেশরক্ষা দুঃসাধ্য ছিল। হুমায়ূনের রাজত্বের প্রারম্ভ-

কালে হিন্দুস্থানের মোগল সৈন্য অনুরক্ত কাবুলী যোদ্ধাদের দ্বারাই গঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সকল যোদ্ধার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করার কুফল দেখা যায়, এবং বাদশাহ অনুরক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন। কামরানকে পরিতৃপ্ত করিয়া বাদশাহ অন্তর্বিদ্রোহের আশঙ্কায় হিন্দালকে সম্বলের ও মিরজা আস্করীকে মেওয়াতের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

কিন্তু হুমায়ূন অন্তর্বিপ্লবনিবারণের জন্য এত করিয়াও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। সিংহাসনারোহণের অল্প দিন পরেই বাদশাহের জনৈক অন্তরঙ্গ তাঁহার প্রাণবিনাশ ও সাম্রাজ্য অপহরণ করিবার কল্পনায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই দুরাকাঙ্ক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া গুজরাটের স্বাধীন মোসলমান অধিপতি বাহাদুর শাহের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ূন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাহাদুর শাহকে অনুরোধ করিলেন। বাহাদুর শাহ আশ্রিত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে উভয়ের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল।

ইহার পর দিল্লীর আফগানবংশীয় শেষ নরপতি এব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলাউদ্দীন বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাহাদুর শাহের পূর্ব্বপুরুষগণ লোদীবংশের রাজত্বকালেই উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি আলাউদ্দীনের উত্তেজনায় হুমায়ূনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার অর্থসাহায্যে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুত্র তাতার খাঁকে সৈনাপত্যে বরণ পূর্ব্বক হুমায়ূনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ শত্রুসৈন্য অনায়াসে পরাজিত করিলেন; সেনাপতি তাতার খাঁ শত্রুহস্তে নিহত হইলেন।

অতঃপর হুমায়ূন বাদশাহ এই শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। (১) বাহাদুর শাহ মন্দিসুর নামক স্থানে গড়বন্দী শিবির সংস্থাপন করিয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাদশাহ অর্দ্ধ বৎসর কাল তাঁহার শিবির অবরোধ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি শত্রুশিবিরে রসদপ্রেরণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এই উপায় অবলম্বনের পর অচিরে বাহাদুর শাহের সৈন্যমধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। বাহাদুর শাহ বীরপুরুষের ন্যায় আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া ভয়ব্যাকুল ও নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমে এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, তিনি একদা রাত্রিযোগে পাঁচ জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। বাহাদুর শাহের পলায়নবার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র আপামর সাধারণ সকলেই প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হুমায়ূন বাদশাহ প্রাতঃকালে এই সংবাদ অবগত হইয়া বাহাদুর শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুজরাট রাজ্য অধিকার করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। হুমায়ূন অচিরে সমতলভূমি অধিকার করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ হস্তগত করিবার কল্পনায় চাম্পানার দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি একদা রাত্রিকালে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিবার জন্য অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল দুর্গদ্বার আক্রমণ করিলে দুর্গরক্ষক সসৈন্যে তথায় উপনীত হইলেন। অন্য দিকে বাদশাহ কেবলমাত্র তিন শত সৈন্য লইয়া লৌহকীলকের সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন

(১) গুজরাটযাত্রার পূর্ব্বে তিনি জৌনপুরাধিপতি সুলতান মাহমুদকে সমূলে উচ্ছিন্ন এবং চুণার দুর্গাধিপতি শেরকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করেন; তদ্বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াও সহজে দুর্গজয় করিতে পারিলেন না। দুর্গরক্ষক শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আত্মসমর্পণকালেও শত্রুকে সুবিধাজনক সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। ফলতঃ, হুমায়ূন তুমুল যুদ্ধের পর বহুকষ্টে দুর্গজয় করিতে সমর্থ হইলেন। চাম্পানর দুর্গের দুর্ভেদ্য অবস্থান, শত্রু-সৈন্যের সংখ্যাধিক্য ও বাদশাহের অসমসাহসিকতার বিষয় চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, তিনি এই দুর্গবিজয় সম্পন্ন করিয়া তদানীন্তন বীরেন্দ্র-সমাজে অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

দুর্গাভ্যন্তরে প্রচুর ধনরত্ন প্রোথিত ছিল। কোন্ স্থানে এই প্রচুর ধনরাশি নিহিত ছিল, তাহা কেবল বাহাদুর শাহের একজন কর্ম্মচারী অবগত ছিলেন। মোগল রাজপুরুষগণ ধনরাশি কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে যন্ত্রণা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে সদ্ব্যবহারে বশীভূত করিবার আদেশ দিলেন। তিনি মোগলের সদ্ব্যবহারে একান্ত প্রীত হইলেন, এবং রাত্রিকালে তাঁহাদের কৌশলে সুরাপানে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গুপ্ত ধনের তথ্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। হুমায়ূন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অসংখ্য ধন রত্ন প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রত্যেক সৈনিকপুরুষকে এক এক ঢাল পরিমিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন।

হুমায়ূন গুজরাট-বিজয় সম্পন্ন করিয়া তথায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারিলেন না। রাজধানীতে শাসনযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়াতে তিনি ভ্রাতা মিরজা আস্করীর হস্তে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গুজরাট পরিত্যাগ করিলে

মোগল রাজপুরুষগণ আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাতে তাঁহারা ক্রমশঃ এতদূর হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন যে, বাহাদুর শাহ অচিরে বিনা যুদ্ধে পুনর্ব্বার গুজরাট রাজ্য অধিকার করিলেন।

হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন,—বিহারের শাসনকর্ত্তা আফগানবংশোদ্ভব শের খাঁ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় ক্রমশঃ সমুজ্জ্বল হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

২

শের অধ্যবসায়ের অবতার। তাঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। তিনি একটি ব্যাঘ্র স্বহস্তে বধ করিয়া শের উপাধি প্রাপ্ত হন। শেরের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস আফগানভূমির অন্তর্গত রো নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে ছিল। তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ শূরবংশোদ্ভব বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট একান্ত গৌরবভাজন ছিলেন। শেরের পিতামহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্য দিল্লীতে আগমন করেন। শের খাঁর পিতা হোসেন স্বীয় ক্ষমতাবলে সাসেরাম ও তাণ্ডার জায়গীর প্রাপ্ত হন।

বীর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই সিংহশাবকের সহিত বল পরীক্ষা করিয়া থাকে। কর্ম্মী শেরও শৈশবকালেই আপনার কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশু শের একদা পিতার প্রভুর অধীনে কর্ম্মপ্রার্থী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাদৃশ অল্পবয়স্ক বালক কখনও রাজকার্য্যের উপযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া হোসেন তাঁহাকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিতে বলেন। শের খাঁ পিতার নিষেধবাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করেন। এবং তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হোসেন পুত্রকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার জন্য স্বীয় প্রভুর নিকট লইয়া যান। তদীয়

প্রভু শিশুর এই ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে একখানি গ্রাম পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহাতে শিশু শেরের আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

হোসেন একাধিক রমণীতে অনুরক্ত ছিলেন; সুতরাং একমাত্র বিবাহিতা পত্নী শেরের মাতার সঙ্গে তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। এ জন্য তিনি তাঁহার গর্ভজ সন্তানদিগকে সযত্নে লালনপালন করিতেন না। শের পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া অভিমানভরে সাসেরাম পরিত্যাগ করিয়া জৌনপুরে গমন করেন। পিতা পুত্রকে পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিবার জন্য জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তদনুসারে শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে গৃহে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "যদি আমার জ্ঞানতৃষ্ণানিবারণের জন্যই পিতা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিব। জৌনপুর বিদ্বজ্জনপূর্ণ।" এই সময় জৌনপুরে জামাল খাঁ শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক জন উদারহৃদয় বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শের খাঁ অচিরে তাঁহার প্রসাদভাজন হইয়া সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। এই স্থানে তিনি প্রবল উৎসাহে জ্ঞানোপার্জ্জনে নিরত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ ও কাব্য প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। (১) দানশীল জামালের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া তিনি অধিকাংশ সময়ই কাব্য,

---

(১) "He also studied thorougly the Kafia (a work on grammar) * * *. He had got by heart the Sikandarnama, the Gulistan, and Bostan, &c. and was also reading the works of Philosophers." Tarikh-i SherShahi.

ইতিহাস ও মহৎ জীবনের আখ্যায়িকার আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। (১)

এই ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে শেরের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। জৌনপুর হইতে প্রত্যাগত আত্মীয় স্বজনের মুখে পুত্রের অনন্য সাধারণ গুণরাশির বিষয় অবগত হইয়া হোসেন তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর পিতা পুত্রে পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল।

শের খাঁ গৃহে প্রত্যাগত হইলে হোসেন তাঁহার হস্তে জায়গীরের শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বলেন, "ন্যায়-বিচারই রাজ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়; নির্দ্দোষ দুর্ব্বলের পীড়ন ও অত্যাচারী সবলের সমর্থন করিয়া আমি কখনও ন্যায়পথভ্রষ্ট হইব না।" এখানেই তাঁহার অসাধারণ শাসনশক্তি ও কার্য্যতৎপরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তিনি পৈতৃক জায়গীরের অভিনব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার এই কঙ্কালসদৃশ বন্দোবস্তের আদর্শেই আকবরের তাদৃশ সুফলপ্রদ রাজস্বনীতি গঠিত হইয়াছিল। শেরখাঁ তহশীলদার, পাটওয়ারী (accountant) ও সীকদারবর্গকে আহ্বান করিয়া

(১) উত্তরকালে শের খাঁ একদা বাল্যকাহিনী বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে আত্মোন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেন; শিকার উপলক্ষে প্রত্যহ পনর ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। একদা এইরূপ ভ্রমণকালে তিনি দস্যুহস্তে পতিত হইয়া সংসর্গদোষে লুণ্ঠন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তিনি এক দিন সদলে নৌকায় উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জল-গর্ভে পতিত হন, এবং তিন ক্রোশ সন্তরণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইহার পর তিনি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেন। তারিখ-ই-দাউদী নামক গ্রন্থে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত ডোসন এই বর্ণনায় আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, মোগলের আশ্রিত প্রত্যেক ইতিহাসবেত্তাই শেরের বাল্যজীবন লুণ্ঠনানুরক্ত ছিল বলিয়া বর্ণনা করিতে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।

ভূমির যথার্থ পরিমাপ দ্বারা রাজস্বনির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রজার অভিপ্রায়মত নগদ অর্থ অথবা শস্য গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমি রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিবার সময় প্রজার হিতপক্ষে যত্নশীল হইব, কিন্তু তাহার পর কঠোর হস্তে রাজস্ব সংগ্রহ করিব। তোমরা রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে আমি তোমাদের নালিশ গ্রহণ করিব। কেহ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কৃষককুলের সন্তোষবিধান করিতে পারিলেই কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া থাকে।" বস্তুতঃ শের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুগত হইয়াই শাসনসংরক্ষণ কার্য্যে নিরত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে অত্যাচারী জমিদারবর্গের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছিল; দুর্ব্বল কৃষকশ্রেণী নিরুপদ্রবে বাস করিত। তরুণবয়স্ক শের অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন এবং নিয়মিতরূপে রাজস্বসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রত্যেক বিষয়েই কার্য্যপটুতা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন; তাঁহার যশঃপ্রভা অচিরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু শেরের সৌভাগ্যোদয়ে হোসেনের প্রিয়তমা উপপত্নীর হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হয়। তদীয় গর্ভজাত পুত্রগণের হস্তে শাসনভার প্রদান করিবার জন্য হোসেন খাঁ নানাভাবে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হন। অবশেষে তিনি তাহার বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শেরখাঁকে শাসনকার্য্য হইতে অপসৃত করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি পিতৃসঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া বিনা আপত্তিতে শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া আগ্রাতে গমন করেন।

শের খাঁ আগ্রাতে গমন করিবার কিয়দ্দিবস পরেই পিতার মৃত্যু-সংবাদ বিদিত হন, এবং তদানীন্তন সম্রাটের নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির ফারমাণ গ্রহণ করিয়া শেশারামে প্রতিগমন করেন। এখানে

উপনীত হইলে হোসেনের প্রিয়তমা উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয়।

ভ্রাতৃবিরোধ মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র হিন্দুস্থান রাজবিপ্লবে আলোড়িত হইয়াছিল। মোগলকুলতিলক বাবর সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপনীত হন। পাণিপথের বিশাল ক্ষেত্রে মোগল আফগানের তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সুলতান এব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করেন, এবং দিল্লীর দুর্গে মোগলের রাজপতাকা উড্ডীন হয়। এই রাজবিপ্লবের সুযোগে শের একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি আপন ভাগ্যপরীক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত ক্ষেত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বিহারাধিপতির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় সুলতান মাহমুদ স্বাধীনভাবে বিহারের শাসনকার্য্যে নিরত ছিলেন। শের অসাধারণ কার্য্যপটুতা ও প্রতিভা বলে ক্রমশঃ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন; এমন কি, তিনি রাজকুমার জালালের শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত হন। কিন্তু সুলতানের শুভদৃষ্টি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তিনি কোন কারণে শেরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

বিপদ কখনও একাকী আইসে না। এই সময় শেরের গৃহকলহও প্রবলাকার ধারণ করে। তাঁহার জ্ঞাতিশত্রু মোহাম্মদ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাকে পৈতৃক জায়গীর হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্নশীল হন। কিন্তু শের বাহুবলে গৃহকলহ প্রশমিত করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। গৃহকলহ প্রশমিত হইলে তিনি আত্মোন্নতিসাধনের জন্য আগ্রায় গমন করেন, এবং অচিরে পাদশাহ বাবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে পাদশাহ চিন্দির বিরুদ্ধে অভিযান করিলে

শেরও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। এই সুযোগে তিনি সাম্রাজ্যের শাসনসংরক্ষণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় রহস্য অবগত হন, এবং রাজ্যলালসা তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। একদিন তিনি তদীয় জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলেন, "মোগলদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সহজসাধ্য। পাদশাহ নিজে একজন রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা; কিন্তু তিনি নবাগত বলিয়া ভারতবর্ষের শাসননীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন; তিনি নিজের স্বার্থসংসাধনার্থ রাজ্যের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। অতএব আমরা গৃহকলহ বিস্মৃত হইয়া ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিলেই রাজলক্ষ্মী মোগলকে পরিত্যাগ করিয়া আফগানের অঙ্কশায়িনী হইবেন। এ কার্য্য এক্ষণে যতই স্বপ্নবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলে আমি সফলকাম হইতে পারিব।" কোন ঘটনাসূত্রে বাবর তাঁহার মনোভিলাষ অবগত হওয়াতে তিনি পলায়ন করিয়া পৈতৃক জায়গীরে উপনীত হন। (১)

শের খাঁ মোগল-শিবির পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিহারে উপনীত হইলে সুলতান মাহমুদ তাঁহাকে আবার সাদরে গ্রহণ করেন। ইহার

(১) যে সূত্রে শের খাঁ জানিতে পারেন যে, বাবর তাঁহার মনোভিলাষ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। একদা পাদশাহের সঙ্গে একত্র আহারকালে শেরখাঁকে মাংস প্রভৃতি কঠিন ভোজ্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট কেবল চামচ ছিল। এজন্য তিনি ভৃত্যাদিগকে ছুরি দিতে আদেশ করিলে তাহারা বাবরের ইঙ্গিতে ছুরি দিল না। শেরখাঁ ইহাতে অপ্রতিভ না হইয়া নিজের ছোরা কোষোন্মুক্ত করিয়া মাংস কর্ত্তন করিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার এই বিসদৃশ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তাঁহার আহার শেষ হইলে বাবর বলিয়াছিলেন,—"এই যুবক কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, এবং কালে এক জন বড় লোক হইবে।"

অব্যবহিত পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তদীয় অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র জালাল খাঁ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজমাতা সুলতানা দাহ্ প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া শেরকে অধিকাংশ কার্য্যভার সমর্পণ করেন। সুলতানা দাহ্ ইহার অত্যল্প কাল পরেই প্রাণপরিত্যাগ করেন, এবং শের খাঁ বিহার রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন।

এই সময় সুলতান মোহাম্মদ বঙ্গ সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা মকদুম আলম বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া শের খাঁর সঙ্গে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। এজন্য সুলতান মোহাম্মদ বিহার জয় ও মকদুম আলমকে বিনাশ করিতে সেনাপতি কুতুবকে নিযুক্ত করেন। বঙ্গসৈন্যের সঙ্গে তুলনায় শের খাঁর সৈন্য-সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিয়া তিনি সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য যত্ন-শীল হন; কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন না। শের সন্ধিসংস্থাপন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া আপন নগণ্য সৈন্যের সাহায্যেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে মনন করেন। সমরক্ষেত্রে তাঁহার অপূর্ব্ব রণ-কৌশল ও বীরত্ব পুরস্কৃত হয়; তিনি জয়মাল্যে বিভূষিত হন; এবং সেনাপতি কুতুব শত্রুহস্তে পাণপরিত্যাগ করেন। লোহানী-বংশজাত কতিপয় সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে শেরের সহকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি লুণ্ঠিত ধনরাশির অংশ তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া নিজেই সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক ধনশালী হইয়া উঠেন।

বিহারাধিপতি জালাল খাঁর লোহানী আত্মীয়স্বজনগণ শের খাঁর সৌভাগ্যসন্দর্শনে পূর্ব্ব হইতেই ঈর্ষান্বিত ছিলেন; এজন্য লুণ্ঠিত ধন-রাশির অংশলাভ করিতে না পারিয়া ঈর্ষ্যাবিষে আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার অনিষ্টসাধনের জন্য যত্নশীল হন। প্রথমতঃ তাঁহারা শের খাঁর প্রাণসংহার করিবার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঘটনাক্রমে

তাঁহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতে শের খাঁ বুঝিতে পারেন যে, আপন ক্ষমতা অপ্রতিহত না রাখিলে অন্য কোন উপায়ে নিরাপদ হইতে পারিবেন না। এজন্য তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া বিপক্ষকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলেন। জালাল খাঁ পূর্ব্ব হইতেই গোপনে শের খাঁর বিপক্ষ দলের সঙ্গে সম্মিলিত ছিলেন। সুতরাং তিনি শেরের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে বঙ্গ দেশের সুলতান মোহাম্মদের শরণাপন্ন হন। শের অনায়াসে বিহার রাজ্য গ্রাস করেন।

জালাল খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুলতান মোহাম্মদ শেরকে বিনাশ করিবার জন্য বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। শের খাঁ দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হন। শত্রুসৈন্য দুর্গাবরোধ করিলে শের খাঁ সাহস ও কৌশলের একশেষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার কৌশলে ও বীরত্বে বঙ্গসৈন্য পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ইহার পর তিনি চুণার দুর্গ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন, এবং সমগ্র বিহারে তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

এই সময় জৌনপুরাধিপতি সুলতান মাহমুদ বাবরের পুত্র হুমায়ূন পাদশাহের হস্তে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয় নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিপুল সৈন্য সহ বিহারে উপনীত হন। শের খাঁর জৌনপুরী সৈন্যপ্রবাহের গতি রুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে সসৈন্যে মিলিত হন। সুলতান মাহমুদ শের খাঁর ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিয়া জৌনপুর পুনর্ব্বার অধিকৃত হইবার পর বিহার প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে ফারমাণ প্রদান করেন। সুলতান সসৈন্যে জৌনপুরে উপ-

নীত হইলে মোগল সৈন্য তথা হইতে পলায়ন করে। তিনি জৌনপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মোগলাধিকৃত লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত ও স্বাধিকারভুক্ত করেন। হুমায়ূন এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় মাহমুদ পরাভূত হন; তাঁহার সমস্ত শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়, পুনরুত্থানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

অতঃপর শের শাহ পুনর্ব্বার বিহারে আধিপত্যসংস্থাপন করেন। হুমায়ূন চুণার দুর্গের অধিকার করিবার কল্পনায় বিহার প্রদেশে উপনীত হন। শের খাঁ তাঁহার অধীনে দুর্গশাসন করিতে স্বীকৃত হওয়াতে এবং গুজরাট যুদ্ধের জন্যই সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক হইয়া পড়াতে, পাদশাহ চুণার পরিত্যাগ করেন। (১)

এই অবসরে শের খাঁ শক্তিসঞ্চয়ে নিবিষ্টচিত্ত হন। মোগলের শাসনে যে সকল আফগান যোদ্ধা ফকিরী গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা শেরের আহ্বানে নবোৎসাহে পুনর্ব্বার অসি-ধারণ করে। কোন আফগান সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইতে অস্বীকৃত হইলে তিনি তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবেন বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। আফগান যোদ্ধা যাহাতে অনর্থক নিহত না হয়, তৎপক্ষে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এইরূপ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি সম্মিলিত আফগান শক্তি সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি আফগান সেনার সাহায্যার্থ মুক্তহস্ত ছিলেন। এই সংবাদ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দলে দলে আফগান সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হয়। সম্মিলিত আফগান শক্তির গঠন করিয়া তিনি বঙ্গদেশ স্বাধিকার-ভুক্ত করিবার মনন করেন।

---

(১) গুজরাট যুদ্ধের বিবরণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

৩

এদিকে হুমায়ূন পাদশাহ গুজরাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শেরকে প্রতাপশালী ও সাম্রাজ্যলোলুপ দেখিয়া তাঁহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে শেরখাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শেরখাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় বিজ্ঞতা-সহকারে হুমায়ূনকে পরাস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শেরখাঁ দেখিলেন যে, বঙ্গবিজয় সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহার সামরিক বল শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তখন সহজেই তিনি মোগলকে বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন। এজন্য তিনি প্রথমতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া শক্তিসঞ্চয় করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। বঙ্গবিজয়ে ব্যাপৃত থাকা কালে মোগল সৈন্যকে বিহারের প্রান্তভাগে আটক রাখিবার জন্য শেরখাঁ চুণার দুর্গে পরাক্রমশালী সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিলেন।

অতঃপর শেরশাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। আফগান সৈন্য বঙ্গদেশে উপনীত হইলে মোহাম্মদ শাহ রাজ্যরক্ষার জন্য প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পরাক্রান্ত শত্রুর গতিরোধ করিতে পারিলেন না; তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শের খাঁ গৌড় নগরের অবরোধ করিলেন। কিন্তু গৌড় নগর অধিকৃত হইবার পূর্ব্বেই বিহারের জনৈক জমিদার বিদ্রোহ অবলম্বন করাতে তিনি স্বীয় পুত্র জালাল খাঁকে বঙ্গদেশে রাখিয়া বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মোহাম্মদ শাহ জালাল খাঁর হস্তে বারংবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর শের খাঁ বিহারে শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন, এবং অতি সহজে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

শের খাঁ বঙ্গদেশ অধিকার ও বিহারের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত

ছিলেন। এই অবসরে হুমায়ূন পাদশাহ বিহারের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া চুণার দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গরক্ষক রুমি বিপুলবিক্রমে দুর্গ-রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্দ্ধবৎসরব্যাপী অবরোধের পর রুমি খাঁ শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। হুমায়ূন চুণার দুর্গ হস্তগত করিয়া বঙ্গদেশা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গাধিপতি মোহাম্মদ শাহ শের খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থানে হুমায়ূন পাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় দুর্দ্দশার কাহিনী বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন। পাদশাহ তাঁহার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন ও ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শের খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া জালাল খাঁকে পাদশাহের গতিরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। হুমায়ূন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মোহাম্মদ শাহও মোগল সেনার সহযাত্রী ছিলেন। মোগল সেনা কাহালগাঁও নামক স্থানে উপনীত হইলে, তিনি শত্রুহস্তে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের নিহত হইবার সংবাদ অবগত হইলেন। গৌড়দুর্গের অবরোধকালে জালাল খাঁ এই পুত্রদ্বয়কে বন্দী করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ শাহ পুত্রশোকে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

শের স্বীয় সৈন্যের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত ধনরাশি সহ গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক জায়গীর শেশারামে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ূন পাদশাহ অনায়াসে গৌড়নগর অধিকার করিয়া স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন।

হুমায়ূন পাদশাহ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়া বিলাসে রত হই-লেন। কিন্তু অপর পক্ষে শের খাঁ পিতৃজায়গীরে উপনীত হইয়া হুমা-য়ূনকে বিনাশ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি

প্রথমতঃ রোটাস দুর্গ হস্তগত করিয়া পরিবারবর্গের নিরাপদ অবস্থানের উপায়বিধান করিতে মনন করিলেন। এই সময় রাজা বীরকেশ স্বাধীনভাবে রোটাস দুর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। শের খাঁ বীরকেশের সঙ্গে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শের খাঁ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশ অধিকার করিবার জন্য গমন করিতেছি। আমার পরিবারবর্গ ধনরাশি সহ আপনার দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থানপ্রাপ্ত হইলে আমি নিশ্চিন্তচিত্তে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হইতে পারি।" রাজা বীরকেশ বন্ধুর অগাধ ধনরাশি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়েই হউক, অথবা তাঁহার উপকারসাধন করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। শের খাঁ পরিবারস্থ মহিলাদিগকে ডুলির দ্বারা ও ধনরাশি ভারসংযোগে দুর্গে লইয়া যাইবার ব্যপদেশে তথায় সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণের সমাবেশ করিয়া অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। (১) দুর্গবাসিগণ এই আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। অতি সহজে পৃথিবীর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ শের খাঁর হস্তগত হইল। দুর্গমধ্যে বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি প্রোথিত ছিল; শের খাঁ তৎসমুদয় লাভ করিলেন। এই প্রতারণামূলক কৌশল শের খাঁর নিজের উদ্ভাবিত নহে; ইহার পূর্ব্বেও খান্দেশের শাসনকর্ত্তা আসের দুর্গ এই ভাবে হস্তগত করিয়াছিলেন। রোটাস দুর্গবিজয় সম্পন্ন করিয়া শের খাঁ পরিবারবর্গের জন্য নিরাপদ স্থানের

---

(১) তারিখ-ই-শেরশাহীর রচয়িতা এই বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ডুলির বিবরণ অমূলক বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ই খানজাহান, আকবরনামা ও ফেরিস্তাতে ডুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থে হুমায়ুন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে শের খাঁ রোটাস দুর্গ অধিকার করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমরা আকবরনামা ও ফেরিস্তার অনুসরণ করিলাম।

সংস্থান করিতে সমর্থ হইলেন। এই ঘটনায় তাঁহার বন্ধুগণও প্রোৎসাহিত হইয়া একে একে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি পুনর্ব্বার সামরিকবললাভ করিয়া হুমায়ূনকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

বর্ষাকাল সমাগত হইলে মোগলসৈন্য বঙ্গদেশের জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক অশ্ব ও উষ্ট্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই দুর্দ্দশার সময় পাদশাহ অবগত হইলেন যে শাহজাদা হিন্দাল কলহপ্রিয় আমাত্যগণের পরামর্শে বিদ্রোহী হইয়া প্রভুভক্ত রাজপুরুষদিগকে হত্যা করিয়া স্বনামে খোতবা প্রচারিত করিয়াছেন, এবং কামরান সসৈন্যে আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ভ্রাতৃগণের বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুল হইলেন, এবং জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শের খাঁ দেখিতে পাইলেন যে, মোগলসৈন্য অনবরত রোগভোগ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং পাদশাহ নিজেও হিন্দালের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাজধানীতে প্রতিগমন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহাই উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া তিনি হুমায়ূনের গতিরোধ করিবার জন্য রোটাস দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

শের চৌসা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিলেন। তাহারা তথায় তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিল। অবশেষে শের সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। হুমায়ূন আগ্রা গমনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। শের কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সম্রাটের নামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত রাখিয়া কেবল মাত্র বঙ্গদেশ ও বিহার শাসন করিবেন, মোগলের

অধিকৃত কোনও স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিবেন না। মোগলসৈন্য শেরের অঙ্গীকারবাক্যে আস্থাস্থাপন করিয়া অসতর্ক হইলে তিনি তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। (১) তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবারও অবকাশ পাইল না। হুমায়ূন গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আফগান সেনা তাহার অধিকাংশ হস্তগত করিল। পাদশাহ পাত্রমিত্র সহ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেন। বিংশ সহস্র সৈন্য নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। পাদশাহ স্বয়ং নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াও জনৈক ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে জীবনরক্ষা করিলেন। (২)

---

(১) এই বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাপারে আত্মসমর্থনের জন্য শের খাঁ যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহা তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি পাদশাহের নিকট শান্তিসংস্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার যত উপকার করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্রও ফলোদয় হয় নাই। আমার সাহায্যেই তিনি জৌনপুরাধিপতি সুলতান মাহামুদকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আমাকে চূণার দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। গুজরাট যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতেই তিনি অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন না। তিনি গুজরাটে গমন করিলে আমি মোগল অধিকারে হস্তক্ষেপ করি নাই। কিন্তু তিনি গুজরাট হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমার অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বঙ্গদেশে আধিপত্যস্থাপন করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে সদ্ভাবে অবস্থান করিবার আশা নাই দেখিয়াই আমি তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতেছি। যদি আমি এখন তাঁহার সহিত শান্তিস্থাপন করি, তবে তাহা কত কাল অব্যাহত থাকিবে? তদীয় ভ্রাতৃগণ আগ্রাতে বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে এবং মোগলসৈন্য রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হওয়াতেই তিনি আমার সহিত সন্ধিস্থাপনের অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু আগ্রার বিদ্রোহ দমিত ও উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইলেই তিনি আমাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে নিশ্চিতই যত্ন করিবেন।"

(২) স্টুয়ার্ট বলেন যে, এই ভিস্তিওয়ালা পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলে হুমায়ূন তাহাকে বার ঘণ্টার (কাহার কাহার মতে দুই ঘণ্টা) জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া পুরস্কৃত করেন। ভিস্তিওয়ালা এই অল্প সময়ের জন্য সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া নিজের ও আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল।

অতঃপর হুমায়ুন হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ ভগ্নহৃদয়ে আগ্রার অভিমুখে গমন করিলেন। (১)

৪

শের খাঁ মোগলসৈন্য পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইয়া জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে শিবিরে আহ্বান করিয়া পাত্রমিত্রসহ বধ করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বনামে খোতবা ও শিক্কা, প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শাহ উপাধি ধারণ করিলেন।

শাহজাদা কামরান মোগলসৈন্যের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া আল-ওয়ার হইতে অগৌণে আগ্রাতে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, আফগান ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া মোগলসাম্রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া আফগানশক্তির বিলোপসাধনের জন্য সাধ্যানু-সারে যত্ন করিতে মনন করিলেন। যে সকল মোগল ওমরাহ বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা ও আফগানহস্তে মোগলসৈন্যের

---

(১) এই যুদ্ধোপলক্ষে শের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন; কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি মহানুভবতার পরিচয়ও প্রদান করেন। মোগলসৈন্য বিধ্বস্ত হইলে এবং পাদ-শাহ পলায়ন করিলে মোগলমহিষী ও বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্তমহিলা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বহির্গত হন। শের খাঁ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যথো-চিত সম্মানপ্রদর্শন ও সান্ত্বনাপ্রদান করেন। তাহার পর তিনি কোন মোগলরমণী, শিশু অথবা ক্রীতদাসকে এক রাত্রির জন্যও অবরুদ্ধ না রাখিয়া মোগল মহিষীর পটা-বাসে প্রেরণ করিতে আদেশ দেন। সেনানায়কগণ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া প্রত্যেকের আহারের বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে হুমায়ুনের মহিষী হোসেন খাঁ নিরাকরের তত্ত্বাবধানে রোটাস দুর্গে প্রেরিত হন, এবং অন্যান্য মোগলমহিলা শের খাঁর অর্থসাহায্যে আগ্রাতে গমন করেন। মোগলমহিষী কি জন্য রোটাস দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা কোন স্থানে লিপিবদ্ধ নাই।

পরাভবসংবাদ শ্রুত হইয়া, শত্রুনাশ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, নানা স্থান হইতে রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। ভ্রাতৃ-ত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া আফগানশক্তিবিনাশের উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রত্যহ পরামর্শ করিতেছিলেন। কিন্তু পরস্পর মিলিত হইবার জন্য কামরানের তাদৃশ আন্তরিক আগ্রহ ছিল না বলিয়া তাহাতে কোনও ফললাভ হইল না। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে কামরান লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। অনর্থক বাকবিতণ্ডায় অর্দ্ধ বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পর কামরান সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং বিষপ্রয়োগে রোগগ্রস্ত হইয়া-ছেন বলিয়া হুমায়ূনের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি দুর্ভাগ্য ভ্রাতার সাহায্যব্যপদেশে এক সহস্র সৈন্য আগ্রাতে রাখিয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনায় নগরবাসিগণ যুদ্ধফল প্রতিকূল হইবে আশঙ্কা করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, এবং কামরানের প্ররোচনায় অনেকে তাঁহার অনুগামী হইল।

হুমায়ূন শত্রুর বিনাশের জন্য ভ্রাতৃগণ সহ অনর্থক বাকবিতণ্ডায় কালযাপন করিতেছিলেন। অপর পক্ষে শের শাহ বঙ্গদেশের আভ্যন্ত-রীণ শাসনপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শের শাহ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিলেন। পাদশাহ এই সংবাদ অবগত হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য সেনাপতি হোসেনকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। কাল্পীর নিকট উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। আফগান সৈন্যের কিয়দংশ পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল, এবং শের শাহের পুত্র কুতুব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। মোগল সেনানায়কগণ শেরের

বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া গৌরবভাজন হইবার জন্য হুমায়ূনকে আহ্বান করিলেন।

তদনুসারে হুমায়ূন এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন, এবং কনোজের নিকটে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আফগান্ সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রথমে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই ভাবে এক মাস অতিবাহিত হইলে বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন সেনাপতি সুলতান মীরজা মোহাম্মদ সসৈন্যে শত্রুর সহিত মিলিত হইল। তাহার অনুসরণ করিয়া আর কতিপয় সেনানায়ক শত্রুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। পাদসাহের বিপদের অবধি রহিল না। ইহাতেও দুর্দ্দশার একশেষ হয় নাই বলিয়াই যেন বর্ষাকাল সমাগত হইল। তাঁহার শিবির জলমগ্ন হইয়া গেল। এই সকল কারণে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া শের শাহের সৈন্য আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিতাড়িত হইল। হুমায়ূনের অশ্ব আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল; যদি তিনি সৌভাগ্যক্রমে একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পতিত হইতেন। পাদশাহ বহু কষ্টে অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদ হইলেন।

এই সময় হিন্দাল ও মিরজা আস্করী আসিয়া পাদশাহের সঙ্গে মিলিত হইলেন। হুমায়ূন পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান অধিপতিগণের পথানুসরণ করিয়াই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, কোন অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়া প্রজাসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজে এক জন কোমলহৃদয় প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার শাসনপদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিল না; তাঁহার ক্ষমতা দর্শন করিয়াও প্রজাসাধারণ মুগ্ধ হয় নাই। এ জন্য তিনি কাহারও

অনুরাগ অথবা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। আফগান রাজ্য হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে বিদেশ হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং হুমায়ূন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আগ্রাতে গমন পূর্ব্বক শের শাহের গতিরোধের কোন উপায়বিধান করিতে পারিলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে কামরান আপন অবিমৃষ্যকারিতার ফল বুঝিতে পারিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সৌভাগ্য দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতেই মোগল সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কামরান এই নীতি অবলম্বন করিয়া কাবুল ও কান্দাহার রক্ষার জন্য পঞ্জাব প্রদেশ শের শাহকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

৫

হুমায়ূন শের শাহের বিনাশসাধন করিবার উপযোগী বল সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে হুমায়ূনের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। সে করুণকাহিনী পাঠ করিতে করিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া পৃথিবীর অনেক নরপতিই পথের ভিখারী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু ঈদৃশ মর্ম্মান্তিক বৃত্তান্ত সমগ্র ইতিহাসেও দুর্ল্লভ। অন্তরঙ্গ আশ্রিত ব্যাক্তিগণ পূর্ব্বঋণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিনি যে সকল ক্ষুদ্র রাজার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা তাঁহাকে

অপমানিত করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। কেবলমাত্র কতিপয় অনুরক্ত অনুচর ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিল। (১)

হুমায়ূন অকূল সমুদ্রে ভাসমান হইতেছিলেন; এমন সময় যোধপূরের রাণা মালবদেব তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে হুমায়ূন তদীয় রাজ্যের প্রান্তদেশে উপনীত হইয়া দূতপ্রেরণ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। বিপন্ন নরপতির উদ্ধারসাধনের জন্য অতি অল্প লোকেই অঙ্গীকারবাক্য প্রতিপালন করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। মালবদেব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, হুমায়ূনকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি সে অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না; পক্ষান্তরে তাঁহাকে বন্দী করিয়া শের শাহের হস্তে সমর্পণ করিলে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠালাভ হইবে। এই সব কারণে রাজা তাঁহাকে বন্দী করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। হুমায়ূন দৈবাৎ এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে অমরকোট অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথিমধ্যে হুমায়ূনকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অশ্ব শ্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তারদি বেগ নামক জনৈক সামন্তের নিকট একটি অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিল, পাদশাহের প্রভাবও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল; এ জন্য রাজার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। হুমায়ূন অগত্যা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে এক ব্যক্তি আপন মাতাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া সেই অশ্ব পাদশাহকে প্রদান করিল।

---

(১) হুমায়ুন পাদশাহ শের শাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে মিরজা আস্করী ও হিন্দাল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরে স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করেন।

হুমায়ূন অনুচরগণ সহ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। অচিরে প্রবল জলকষ্ট উপস্থিত হইল। কেহ বা জলের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কেহ বা জলতৃষ্ণা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণের চীৎকার ও কাতরোক্তিতে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন সময় শত্রুসৈন্যের আগমনসংবাদ প্রচারিত হইল; পাদশাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শত্রু-সৈন্য তখনও দূরে ছিল বলিয়া মোগলগণ রক্ষা পাইল। অবশেষে পাদশাহ একটি জলপূর্ণ কূপের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিলেন। তাহার পর তিনি সমস্ত চর্ম্মপাত্র জলপূর্ণ করিয়া যে সকল তৃষ্ণাতুর অনুচর পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহাদের প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। (১)

পরদিবস প্রাতঃকালে মোগলগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আবার জলকষ্ট উপস্থিত হইল। এবার তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক কাতর হইয়া পড়িল। দুই দিন পর্য্যন্ত একবিন্দু

---

(১) হুমায়ূনের অনুচরগণের মধ্যে একজন ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি তৃষ্ণায় একান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না। তদীয় পুত্র পিতার জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্যথিতচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। পাদশাহ স্বয়ং জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া অনুচরগণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য পশ্চাৎ-গামী হইয়া পথিপার্শ্বে বণিককে ভূলুণ্ঠিত দেখিতে পান। পাদশাহ তাঁহার নিকট অনেক টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। পাদশাহ এই সুযোগে ঋণমুক্ত হইবার আশায় বলেন, "যদি তুমি আমাকে ঋণমুক্ত কর, তবে তোমার যত জলের প্রয়োজন, তাহা তোমাকে দিতে পারি।" বণিক প্রত্যুত্তরে বলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় এক গ্লাস জল পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। অতএব আমি জাঁহাপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

জলও কেহ পান করিতে পাইল না। (১) চতুর্থ দিবসে তাহারা একটি জলপূর্ণ কূপের নিকট উপনীত হইল। কূপ অত্যন্ত গভীর ; জল তুলিবার ভাণ্ডও তাহাদের একটির অধিক ছিল না। এ জন্য জল তুলিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল। সকলেই সর্ব্বাগ্রে জলপান করিবার জন্য ব্যগ্র। এ জন্য হুমায়ূন কূপপার্শ্বে জনতার নিবারণ করিবার কল্পনায় তাহাদিগকে দূরে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন যে, জল উত্তোলিত হইলে ঢক্কা নিনাদিত হইবে, এবং তদনুসারে মোগলগণ পালা ক্রমে কূপের নিকট উপনীত হইয়া জলপান করিবে। কিন্তু তাহারা তৃষ্ণায় এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, জল উত্তোলিত হইতে না হইতেই একেবারে ১০।১২ জন কূপপার্শ্বে দলবদ্ধ হইল, এবং তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে দড়ি ছিঁড়িয়া ভাণ্ড কূপগর্ত্তে পড়িয়া গেল, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন তৃষ্ণাতুরও কূপসাৎ হইল। এই দুর্ঘটনায় মোগলের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান হইয়া উঠিল। কেহ কেহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া উত্তপ্ত বলুকার উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আর যাহারা কূপগর্ত্তে পতিত হইয়াছিল, মৃত্যু আসিয়া তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিল। দুর্ভাগ্য হুমায়ূন আপনার বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন। পরদিন

---

(১) এই সময় একদা রাত্রিকালে হুমায়ূন অনুচরদিগকে পটগৃহ ও অশ্বগুলির চারিদিকে উষ্ট্র দ্বারা চক্র স্থাপন করিয়া সতর্কভাবে রাত্রিযাপন করিবার আদেশ দেন। তিনি নিজেও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চক্রের চারি দিকে পাহারা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ; কিন্তু প্রভুভক্ত শেখ আলী সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহার অনুরোধে তিনি পটগৃহে বিশ্রামার্থ শয়ন করেন। তিনি নিদ্রাভিভূত, এমন সময় একজন তস্কর তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হয়। এজন্য নরাধম পাদশাহের উপাধানের নিম্ন হইতে তরবারি বাহির করিয়া কোষ হইতে অর্দ্ধেক উন্মুক্ত করিয়াছিল ; হঠাৎ ভয় পাইয়া সে আরদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন না করিয়াই প্রস্থান করে।

তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপনীত হইলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ভারবাহী উষ্ট্রগুলি উপর্য্যুপরি কয়েক দিন জলপান করিতে না পাইয়া একান্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছিল; তাহাদের অধিকাংশই অতিরিক্তমাত্রায় জলপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মোগলগণও জলপান করিয়া বক্ষে যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল, এবং তাহাতেই অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে অনেকের মৃত্যু হইল। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনার পর কেবলমাত্র সাত জন অনুচর সহ পাদশাহ অমরকোটে উপনীত হইলেন।

অমরকোটের সহৃদয় রাজা হুমায়ুনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে তদীয় সমস্ত অভাব বিদূরিত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। তাঁহার সদয় ও উদার ব্যবহারে হুমায়ুন শান্তিলাভ করিলেন। তিনি পাদশাহকে রাজ্যোদ্ধারকল্পে দুই সহস্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। হুমায়ুন অমরকোটে সার্দ্ধ এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া পরিবারবর্গকে তথায় রাখিয়া রাজসৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিতে গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হামিদা গর্ভবতী ছিলেন। অভিযানের দ্বিতীয় দিবসে তিনি এক পুষ্করিণীর তীরে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় আকবরের জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আনন্দসংবাদ শ্রুত হইয়া ওমরাহবর্গ রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষায় সমবেত হইলে, হুমায়ুন অনুগত ভৃত্য জহৌরকে যে সকল দ্রব্য তাহার নিকট ছিল, তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে জহৌর দুই শত মুদ্রা, একখানি রৌপ্যালঙ্কার ও একটি মৃগনাভি কস্তুরী আনয়ন করিল। পাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিয়া কস্তুরীর দানা সমাগত সামন্তবর্গকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন। তাহার পর

তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রের জন্মোপলক্ষে তোমাদিগকে উপহার দিবার জন্ম কেবলমাত্র এই কস্তরীটি অবশিষ্ট রহিয়াছে; কস্তরীর সুগন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি আশা করি, আমার পুত্রের যশঃসৌরভে এক দিন সমগ্র পৃথিবী পুলকিত হইবে।"

হুমায়ূন পুত্রের জন্মসংবাদ শ্রুত হইয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার দুরবস্থার অবসান হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। ইহার পর অচিরে তাঁহার সৈন্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, এবং অনেকেই তথা হইতে প্রস্থান করিল; এমন কি, মোগল ওমরাহবর্গও শিবির পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে হুমায়ূন পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর আলী যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিল। তিনি নিরুপায় হইয়া কান্দাহারের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁ গুজরাট হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সময় কান্দাহার প্রদেশ মিরজা আস্করীর অধীন ছিল। তিনি কামরানের প্রতিনিধিভাবে এই দেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি হুমায়ূনকে আশ্রয় প্রদান করিলেন না; পক্ষান্তরে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

হুমায়ূন আস্করীর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া পারস্যরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পারস্যে গমন করিবার মনন করিলেন। তিনি সিস্তানের প্রান্তদেশে উপনীত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা পারস্যরাজের পক্ষ হইতে সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তাহার পর তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া সুলতানার পরিচর্য্যার জন্য ক্রীতদাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হুমায়ূন তথা হইতে হিরাটে গমন করিলেন। তথায় পারস্যরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সাদরে তাঁহার

অভিনন্দন করিলেন। মোহাম্মদ অতিথির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যত্নের ত্রুটি করিলেন না। তিনি হুমায়ূনকে পারস্য-দরবারে উপনীত হইবার উপযোগী উপকরণ প্রদান করিলেন। হুমায়ূন তথা হইতে পারস্যের রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ তাঁহার দর্শনকামনায় পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কিজবি নামক স্থানে উপনীত হইয়া পারস্যদরবারে বৈরাম খাঁকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার পর হুমায়ূন পারস্যদরবারে উপনীত হইলেন, এবং পারস্যরাজ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

৬

শের শাহ হুমায়ূনের হস্ত হইতে মোগল রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি মোগলের অধিকৃত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বিপুলবিক্রমে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। শের শাহ হুমায়ূনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় খিজির খাঁ নামক জনৈক সেনাপতির হস্তে বঙ্গদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবগত হইলেন যে, খিজির খাঁ বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি মোহাম্মদ শাহের কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। শের শাহ গৌড়নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে খিজির খাঁ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ তদীয় শিবিরে উপনীত হইলেন। এই সুযোগে তিনি খিজিরকে ধৃত করিয়া অবরুদ্ধ করিলেন। তাহার পর তিনি বঙ্গরাজ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং কাজি ফাজিলত নামক জনৈক

সাধুপুরুষকে বিভাগীয় শাসনকর্তৃগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার দিলেন।

অনন্তর শের শাহ দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং তার পর মালব দেশে গমন করিয়া তথায় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় মালবের অন্তর্গত রায়সিন নামক দুর্গে একজন হিন্দু সামন্ত আধিপত্য করিতেছিলেন। শের শাহ এই দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গবাসিগণ প্রস্তাব করিল যে, শের শাহ তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে পারে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গ অধিকার করিলেন; কিন্তু সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া দুর্গবাসী সমস্ত হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন।

অতঃপর শের শাহ রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া অভিযান করিলেন। মাড়োয়ার রাজ্য বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে স্থাপিত,—শস্যসমাকীর্ণ ও "প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত" নহে। মাড়োয়ারীর ন্যায় রণনিপুণ স্বদেশ-ভক্ত বীরদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া শের শাহ কৌশলে শত্রুশিবিরে ভেদ জন্মাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার চাতুরীতে কতকগুলি পত্র রাজার হস্তগত হইল। এই সকল পত্র পাঠ করিয়া তিনি আপন সামন্তবর্গের প্রতি সন্দিহান হইলেন। সামন্তগণের এক জনের নাম কুম্ভ। তিনি এই ব্যাপারে হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইলেন, এবং আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য দশ সহস্র সেনা লইয়া শেরকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া আফগান সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু অবশেষে বহুকষ্টে শের শাহ জয়লাভ করিলেন। শত্রুসৈন্য পরাস্ত হইলে তিনি মাড়োয়ার রাজ্যের অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক মুষ্টি ভুট্টার

জন্ত ভারতসাম্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছিলাম।” ইহার পর তিনি মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিবার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

পর বৎসর, অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে, শের শাহ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই দুর্গের অবরোধকালে ভূগর্ত্তস্থ বারুদখানায় অগ্ন্যুৎপাত হইয়া শের শাহ দগ্ধীভূত হইলেন। কিন্তু যতক্ষণ দুর্গ অধিকৃত না হইল, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। দুর্গ অধিকৃত হইবার সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!” এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার বাক্‌শক্তি চির-কালের জন্ত লুপ্ত হইল, তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গেল। (১)

---

(১) শের শাহ পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কথিত আছে যে, এক জন পারিষদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “জাঁহাপনার কেশ শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে।” তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “হাঁ, সায়াহ্নকালে আমি সাম্রাজ্য-লাভ করিয়াছি।” সিংহাসন অধিকার করিয়া তিনি চারিটি কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতানিবন্ধন তাঁহার একটি কল্পনাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এ জন্য শের শাহ মৃত্যুর পূর্ব্বে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কল্পনাচতুষ্টয়ে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। (১) পিতৃভূমি রো প্রদেশ জনশূন্য করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের দ্বারা লাহোর ও শিবা-লিকের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে উপনিবেশস্থাপন। মোগলের ভারতবর্ষে আগমনের পথাবরোধ এবং পার্ব্বত্য জমিদারগণের শাসনই ইহার উদ্দেশ্য (২) লাহোর নগরের ধ্বংস। বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই পথিমধ্যস্থ লাহোর আক্রমণ করিত, এবং তাদৃশ বৃহৎ নগর অধিকার করিতে পারিলেই শত্রু-সৈন্যের আর রসদের অভাব থাকিত না, এবং অভিযানের শৃঙ্খলাবিধানও সহজসাধ্য হইত। এ জন্যই শের শাহ লাহোরের ধ্বংস করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। (৩) মক্কাযাত্রীর গমনাগমনের সুবিধার জন্য সরাইয়ের ন্যায় পঞ্চাশখানি বৃহৎ অর্ণবপোতের নির্ম্মাণ। (৪) পাণিপথে এব্রাহিম লোদির সমাধি-প্রতিষ্ঠা ও তাহার সম্মুখে যে সকল মোগলবংশীয় সেনাপতি শেরের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিমিত্ত আর একটি সমাধিভবনের নির্ম্মাণ। তিনি এই সমাধিমন্দিরদ্বয় পরম রমণীয়ভাবে নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

শের শাহের চরিত্রের একাংশ অত্যুজ্জ্বল; অপরাংশ কলঙ্ককালিমাচ্ছন্ন। তাঁহার রাজত্বকালে বিচারকগণ অপক্ষপাতে ন্যায়বিচার করিতেন। কেহই অন্যায় অনুষ্ঠান করিয়া অব্যাহতি পাইত না। কিন্তু তিনি নিজে পাপাচরণে দ্বিধাশূন্য ছিলেন; বিশ্বাসহনন করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার কার্য্যপরম্পরায় প্রতীত হয়, যেন বিশ্বাসহনন ব্যাপারে একমাত্র রাজাই অধিকারী! কেন না, প্রজাদের মধ্যে কেহ তাদৃশ কার্য্যে লিপ্ত হইলে তিনি তাহার কঠোর দণ্ডবিধান করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি পাপপ্রবণ ছিল না; প্রবল রাজ্যলালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। শেরের অসাধারণ প্রতিভাই তাঁহাকে রাজ্যলোলুপ করিয়াছিল। তিনি যে পথে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ঔচিত্যানুচিত্য বিচার করিবার অবকাশ ছিল না। যদি তিনি কেবলমাত্র পৈত্রিক জায়গীরের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার পদস্খলন হইত না; সিংহাসনে তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলে তিনি সম্ভবতঃ নিষ্পাপ নরপতি বলিয়াই জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন।

কোন মূল মন্ত্রের সাধনায় জায়গীরদার শের পাদশাহী সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ঐক্যনীতিই তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের নিয়ামক ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আফগানশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়িলে আফগানের এত দুর্দ্দশা হইত না। এজন্য তিনি আফগানশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াই স্বীয় উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আত্মকলহই আফগানশক্তির দৌর্ব্বল্যের কারণ ছিল। শের শাহ এই কারণ অপসারিত করিয়া সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উপযোগী বলসঞ্চয় করেন, এবং তাহাতেই কৃতকার্য্য হন। এসলাম-

ধর্ম্মে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু তিনি তজ্জন্য হিন্দুকে কখনও উৎপীড়িত করেন নাই। তদীয় অনুচরবর্গের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কখনও আলস্যের প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি কোন কার্য্যই নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা অথবা কার্য্যাধ্যক্ষগণকে কোনও বিষয়ে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করিতেন না। তিনি বলিতেন, "আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অমাত্যবর্গের পাপপ্রবণতাই আমার রাজ্যলাভের কারণ।" শের শাহ সময়কে সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; এই চারি ভাগ বিচারকার্য্য, সৈন্যের শৃঙ্খলা সংস্থাপন, ঈশ্বরোপাসনা এবং বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনে অতিবাহিত হইত।

শের শাহ সাম্রাজ্যকে ১১৬০০০ হাজার পরগণাতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরগণার জন্য পাঁচ জন কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে অন্ততঃ একজন বিচারক ও একজন হিন্দু পাটওয়ারী থাকিতেন। রাজকর্ম্মচারী ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বিচারক তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এসলাম শাস্ত্রের অনুশাসনের পরিবর্ত্তে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ষিত ভূমির পরিমাপ ও শস্যের অবস্থা অনুসারে এক বৎসরের জন্য রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কোনও রাজকর্ম্মচারীই দুই বৎসরের অধিক কাল এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন না। সাম্রাজ্যের অন্তঃপ্রদেশ নিরস্ত্র হইয়াছিল।

শের শাহ প্রজার হিতকামনায় বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি দেদীপ্যমান। তিনি বাঙ্গলা হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে স্থানে

স্থানে পান্থশালা ও কূপ ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি রাজপথপার্শ্বে বহুসংখ্যক সৌষ্ঠবশালী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কোরাণ-পাঠক ও মোল্লা নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রত্যেক বিশ্রাম-স্থানে পথিকগণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনা ব্যয়ে আহার্য্য পাইত। পথিক-দিগকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল। রাজকার্য্য ও বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে দস্যু ও তস্করের ভয় সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপে কেহই বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিতে সাহসী হয় নাই। তাঁহার শাসনগুণে কলহ-প্রিয় আফগান্‌গণও শান্তিতে বাস করিতেছিল। তিনি কেবল পাঁচ বৎ-সর কাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১)

---

(১) "From the day that Sher Shah was established on the throne no man dared to breathe in opposition to him, nor did any one raise the standard of contumacy or rebellion against him, * * * nor did any theft or robbery ever occur in his dominions. The travellers and wayfarers were relieved from the trouble of keeping watch, nor did they fear to halt even in the midst of a desert. * * * A decrepit old woman might place a basket of gold ornaments on her head and go on a journey, and no thief or robber would come near her for fear of the punishment which Sher Shah inflicted. "Such a shadow spread over the world that a decrepit person feared not a Rustum." During his time all quarrelling, disputing, fighting and turmoil, which is the nature of the Afghans was altogether quieted and put a stop to throughout the countries of Hindustan and Roh. * * * In a very short period he gained the dominion of the country and provided for the safety of the high-ways, the administration of the government and the happiness of soldiery and people."—*Tarikh-i-Sher Shahi.* শের শাহ কি প্রণালীতে

শের শাহ জীবদ্দশাতেই স্বীয় জন্মভূমি শেশারামে নিজের জন্য সৌষ্ঠবশালী সমাধিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; শোভাবর্দ্ধনের জন্য ইহার চতুষ্পার্শ্বে ঝিল খনিত হইয়াছিল। তথায় তাঁহার সমাধি হয়। (১)

৭

শের শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জালাল খাঁ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। জালাল খাঁ জনসাধারণের নিকট সেলিম শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। (২) তাঁহার রূঢ় ব্যবহারে রাজভক্ত ওমরাহবর্গ

দস্যু তস্কর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এ স্থলে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শের শাহ যে সময়ে থানেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার শিবির হইতে একটা অশ্ব অপহৃত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি শিবির হইতে বৃত্তাকার পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যত জমিদার ছিলেন, তাঁহাদিগকে অপহৃত অশ্বের জন্য দায়ী করিয়া, চোরকে তিন দিনের মধ্যে হাজির করিতে না পারিলে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। এটোয়ার নিকটবর্ত্তী ময়দানে একদা এক জন মনুষ্যের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। এই ময়দানের স্বত্ব লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। কোন্ গ্রামের লোক হত্যা করিয়াছে, তাহার নির্ণয় করিতে না পারিয়া সম্রাট ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে আদেশ দেন। কোনও ব্যক্তি এই কার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে তাহাকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিবার আদেশ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক জন লোক বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলে তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি ধৃত ব্যক্তিকে বলেন, "তুমি গ্রাম হইতে এত দূরে একটা বৃক্ষকর্ত্তনের বিষয় জানিতে পারিলে; অথচ সেই স্থানে সংঘটিত নরহত্যার ন্যায় একটি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পার নাই। এ কি রূপ? তিন দিনের মধ্যে হত্যাকারী ধৃত না হইলে তোমাদের সমস্ত গ্রামবাসীর প্রাণদণ্ড হইবে।" এই উভয় অপরাধীই ধৃত হইয়াছিল।

(১) This fine monument of the magnificence of Sher still remains entire. The artificial lake, which surrounds it is not much less than a mile in length.—Dow's History of Hindostan.

(২) আবদুল কাদের ফেরিস্তা, আবুল ফজল ও অন্যান্য তৈমুরবংশাশ্রিত ইতিহাসবেত্তৃগণ জালাল খাঁকে সেলিম নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত দিল্লীর দুর্গ সেলিম-গড় নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাজমুদ্রায় তাঁহার নাম ইসলাম শাহ অঙ্কিত রহিয়াছে। যথা,—

বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ওমরাহদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। শের শাহের সময়ে রাজা ও রাজপুরুষগণের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এই ভাবে অন্তর্হিত হইল। সেলিম শাহ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন না; পিতার অবলম্বিত শাসননীতির পরিহার করিয়া অভিনব পন্থার অনুসরণপূর্ব্বক কীর্ত্তিসংস্থাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী প্রজার হিতকর কি না, তিনি আদৌ তাহার বিচার করিতেন না। (১) নয় বৎসরকাল রাজত্বের পর সেলিম শাহ কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্র ফিরোজ সাম্রাজ্যাধিকারী হইলেন। মোহাম্মদ নামে শের শাহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। সেলিম মোহাম্মদের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ফিরোজ মোহাম্মদের গর্ভজাত ছিলেন। সেলিমের মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে (২) মোহাম্মদ ফিরোজকে বধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সেলিম জীবদ্দশাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মোহাম্মদ রাজ-সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। এজন্য সেলিম তাঁহাকে বধ করিয়া ফিরোজকে নিষ্কণ্টক করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমহিষী

The world, through the favour of the Almighty has been rendered happy, since Islam Shah, the son of Sher Shah Sur has become king.

(১) They (his regulation) seem all silly and nonsensical. * * * In the first sentence of his paragraph we find land grants converted into money pensions, and in the last money pensions converted into land grants; merely because in both instances Sher Shah had enacted otherwise and Islam Shah was desirous of showing the world that he also had his 'own thunder.'

(২) সকল ইতিহাসবেত্তাই ফিরোজের হত্যার সময় সম্বন্ধে একমত। কেবল তারিখ-ই-সালাতনি আফগানা গ্রন্থে, সেলিমের মৃত্যুর দুই মাস পরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য বারংবার কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অভি-প্রায় কার্য্যে পরিণত হয় না। (১) মোহাম্মদ যে সময় ফিরোজকে বধ করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মাতার কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও মোহাম্মদ অভীষ্টসিদ্ধ করিতে বিরত হন নাই। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আদিল (ন্যায়পরায়ণ) উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যথোপযুক্তরূপে রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাকে আদলি বলিত। সাধারণ লোকে উচ্চারণের ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে আনদেলী (অন্ধ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

আদিল অত্যন্ত কুক্রিয়ান্বিত ও বিলাসমগ্ন ছিলেন। তিনি রাজ্য-শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র মনোনিবেশ করিতেন না; কার্য্যদক্ষ প্রধান মন্ত্রী হিমু (২) সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। আদিল কর্ত্তৃক সিংহাসন অধিকৃত হইবার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার অপরিমিত ব্যয়ে রাজকোষের সঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বচর প্রিয়পাত্রগণের শোষণের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এজন্য আদিল ওমরাহবর্গের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার

---

(১) সেলিমের জীবদ্দশায় মোহাম্মদ কেবল আমোদ প্রমোদেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। সেলিম তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় মহিষীর (মোহাম্মদের ভগিনীর) মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ভ্রাতা আমোদ ও লাম্পট্যই ভালবাসে; বাদ্যযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও গীতবাদ্যশ্রবণেই কালহরণ করিয়া থাকে। রাজত্ব তাহার স্পৃহনীয় নহে।" লোকচক্ষু হইতে আপনার রাজ্যলালসা গোপন রাখিয়া অন্ধত্ব অথবা মৃত্যু হইতে অব্যাহতিলাভ করিবার জন্য তিনি পাগলের ভাণ করিতেন।

(২) হিমুর পূর্ণ নাম হেমচন্দ্র; জন্মস্থান রাজপুতনায়। হিমু দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ছিলেন। তিনি প্রথমে দিল্লীতে দোকান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে তিনি কোনও কারণে মোহাম্মদ আদিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হন। মোহাম্মদ আদিল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিয়া সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করেন।

দুর্ব্ব্যবহারে সমস্ত দেশে বিদ্রোহের বেড়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমতঃ চুণারে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; আদিল ও হিমু তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহের দমন করিলেন।

কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই এব্রাহিম সুর নামক তাঁহার একজন আত্মীয় (ভগিনীপতি) দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন। এব্রাহিম পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আদিল এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া এব্রাহিমকে বিনাশ করিতে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে এব্রাহিমের দূত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিকরিলেন। তিনি বলিলেন,—"জাঁহাপনা! আপনি এব্রাহিমকে মার্জ্জনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার নিকট হোসেন প্রভৃতি ওমরাহগণকে প্রেরণ করিলেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন।" আদিল একান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন; তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ওমরাহদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা এব্রাহিমের ভদ্র-ব্যবহার ও প্রলোভনবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইহাতে তিনি এতদূর বলশালী হইয়া উঠিলেন যে, আদিল তাদৃশ প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া চুণারে প্রতিগমন করিলেন, এবং সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাংশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াই আপাততঃ পরিতৃপ্ত রহিলেন। এব্রাহিমও অচিরে সুলতান উপাধিগ্রহণ করিয়া পশ্চিমাংশের শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এব্রাহিম দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই সেকন্দর নামক আদিলের আর একজন আত্মীয় (ভগিনীপতি) পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। (১) এব্রাহিম এই

(১) এব্রাহিমের দিল্লী ও আগ্রা অধিকারের পর আদিল সন্দেহবশতঃ সেক-

সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিষদন্ত উৎপাটন করিবার জন্য বিপুল বাহিনীসহ যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; দিল্লী ও আগ্রা সেকেন্দরের হস্তগত হইল। এব্রাহিমের অধিকাংশ সৈন্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এব্রাহিম দিল্লী ও আগ্রা কাড়িয়া লইলে, আদিল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এব্রাহিমের পরিবর্ত্তে সেকন্দর পশ্চিমাংশের অধিপতি হইলেন; আদিল পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাংশের অধিপতি রহিলেন; এবং এব্রাহিম রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভারতের রাজলক্ষ্মী আফগানের পক্ষে একান্ত চঞ্চলা ছিলেন। এক বিপ্লব উপশমিত হইতে না হইতেই আর "এক প্রবল ঝঞ্ঝা উত্থিত হইয়া কূলপ্লাবী তরঙ্গ তুলিত।" সেকন্দর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন; কিন্তু দুই দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই হুমায়ুন পাদশাহ (১) আফগান অধিকৃত ভারত সাম্রাজ্যের বিশৃ-

---

ন্দরকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হন। তাঁহার মনোভিলাষ কোনও ঘটনাসূত্রে তদীয় ভগিনীর (সেকন্দর-পত্নী) নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পত্নীর পরামর্শ মত সেকন্দর মৃগয়াব্যপদেশে আদিলের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্যালিপতি এব্রাহিমের নিকট উপনীত হইয়া পঞ্জাবের শাসনভার প্রার্থনা করেন। তিনি তথায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া অভিমানভরে পঞ্জাবে গমন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

(১) আমরা বলিয়াছি যে, হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্যরাজের শরণাপন্ন হন। পারস্য-ইতিহাস-লেখক সুপ্রসিদ্ধ সার জন ম্যাক্‌লম স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, হুমায়ুনের পারস্য দরবারে অবস্থানকালে শাহ তমশেপ তাঁহাকে আদর ও সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু পাদশাহের অনুচর জোহরের লিখিত বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা অবগত হই যে, তিনি পারস্য দরবারে নানারূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, শাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতানৈক্য ছিল। হুমায়ুন স্বমত পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে তমশেপ তাঁহার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেন। যাহা হউক, পারস্যরাজ তমশেপ কান্দাহার ও কাবুল জয় করিবার জন্য নির্ব্বাসিত পাদশাহের অধীনে

স্থলা দর্শন করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। সেকন্দর তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অশীতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন।

সেকন্দর মোগল অধিপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিলে এব্রাহিম পুনর্ব্বার রাজ্যলাভের বাসনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি-পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কাল্পী নামক স্থানে সসৈন্যে সমবেত হইলেন। আদিলও আপন সম্রাজ্যের অপরার্দ্ধ শত্রুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার

১৪০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি এই সৈন্যদলের সাহায্যে ভ্রাতা মিরজা আস্করীকে পরাজিত করিয়া কান্দাহার দখল করেন। ভ্রাতৃস্নেহপরায়ণ হুমায়ূন মিরজা আস্করীকে ক্ষমা করেন। ইহার পর কাবুল রাজ্যও হুমায়ূনের পদানত হয়। এই সময় কামরান কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাবুল বিজিত হইবার পর হিন্দাল আসিয়া হুমায়ূনের সহিত যোগদান করেন। হুমায়ূনের উদারতা ও সদ্ব্যবহারে তাঁহার সঙ্গে আস্করী ও হিন্দালের সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু রাজ্যচ্যুত কামরান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিকূলাচরণে ক্ষান্ত ছিলেন না। অবশেষে তিনিও নিঃসহায় হইয়া হুমায়ূনের হস্তে পতিত হন। হুমায়ূন তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করেন। ইহার পর পাদশাহ নিষ্কণ্টক হইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, এবং আফগানের কবল হইতে ভারত সাম্রাজ্য উদ্ধার করিবার উপায় উদ্ভাবনে যত্নপর হন। তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পান যে, অন্তর্বিদ্রোহে আফগানশক্তি নিস্তেজ ও হীনবল হইয়াছে। এই সংবাদপ্রাপ্তির পর একদা মৃগয়ায় গমনকালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। যে সকল ওমরাহ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারা পাদশাহের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে অবিলম্বে ভারত আক্রমণে লিপ্ত করিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন, এক জন লোক প্রেরণ করিয়া ক্রমান্বয়ে যে তিন জন লোকের সঙ্গে পথিমধ্যে তাহার দেখা হইবে, তাহাদের নাম জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক অদৃষ্টপরীক্ষা করিবার প্রাচীন নিয়ম প্রচলিত আছে। হুমায়ূন অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। প্রেরিত লোকের সঙ্গে যে তিন ব্যক্তির ক্রমান্বয়ে দেখা হইয়াছিল, তাহাদের প্রথমের নাম দৌলত (সৌভাগ্য), দ্বিতীয়ের নাম মুরাদ (অভিলাষ), এবং তৃতীয়ের সাদিত (সুখ)। পরীক্ষার ফল পাদশাহের অনুকূল হওয়াতে তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আফগানের কবল হইতে ভারত সাম্রাজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য ভারতবর্ষে উপনীত হন।

জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন। এই সময় তিনিও শক্রর বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী হিমুকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ এব্রাহিমকে বিধ্বস্ত করিতে মনন করিয়া কাল্পীতে উপনীত হইলেন। তুমুল যুদ্ধে এব্রাহিম পরাজিত হইলেন; তাঁহার সমগ্র বাহিনী একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

এব্রাহিম সমূলে বিনষ্ট হইতে না হইতেই আর এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ সুর স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্ব্বক দিল্লীর সাম্রাজ্যেরদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজ্যলোলুপ পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন;—(১) আদিল, (২) এব্রাহিম, (৩) সেকন্দর, (৪) হুমায়ূন, (৫) মোহাম্মদ সুর। এব্রাহিমের বিষদন্ত পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছিল; হুমায়ূন সেকন্দর পরস্পর বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইতেছিলেন। এজন্য আদিল মোহাম্মদ সুরকে দমন করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া হিমুকে চূণারে আহ্বান করিলেন। হিমু তদনুসারে চূণারে উপস্থিত হইয়াই সংবাদ পাইলেন যে, হুমায়ূন সেকন্দরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াছেন। (১) কিন্তু আদিল ও তদীয় দক্ষিণবাহুস্বরূপ হিমু এই সংবাদ অবগত হইয়াও হুমায়ূনের বিরুদ্ধে শক্তিনিয়োগ না করিয়া বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ সুরকে সর্ব্বাগ্রে দমন করাই আবশ্যক বলিয়া অবধারণ করিলেন।

---

(১) মোগল ও আফগান (সেকন্দর) সৈন্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে হুমায়ুন এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি বৈরাম খাঁ সুকৌশলে সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন; ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক শাহজাদা আকবর বিপুল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বীরেন্দ্রসমাজের বরেণ্য হন। এই বালকের অসাধারণ পরাক্রমদর্শনে মোগলসৈন্যের হৃদয় এত দূর উত্তেজীত হইয়া উঠে যে, তাহারা মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল।

তাঁহারা মোহাম্মদকে দমন করিলেন। সুর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এব্রাহিমের উত্থানশক্তি পূর্ব্বেই রহিত হইয়াছিল; সেকন্দরও হুমায়ূনের হস্তে পরাজিত হইয়া হতবল হইয়াছিলেন; এক্ষণে মোহাম্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। অতএব রঙ্গভূমিতে দুই জন মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অবশিষ্ট রহিলেন,—হুমায়ূন ও আদিল। অতঃপর আদিল হুমায়ূনকে বিনষ্ট করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হুমায়ূন রণক্ষেত্রে জয়শ্রীলাভ করিয়া আবুল মালিককে পঞ্চনদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত করিয়া হীনবল সেকন্দরকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আদেশ দিলেন। তাহার পর তিনি সগৌরবে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয়বার রাজসিংহাসন অধিকৃত করিলেন। বীরকেশরী বৈরাম খাঁর সাহায্যেই তিনি পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তারদি বেগ দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আবুল মালিকের কর্ত্তৃত্বাধীনে মোগলসৈন্যের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল; এই অবকাশে সেকন্দর ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিলেন। হুমায়ূন এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার ধ্বংস করিবার জন্য বৈরাম খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে রাজকুমার আকবরকে পঞ্জাবে প্রেরণ করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। এক দিন সায়াহ্ন সময়ে হুমায়ূন পাঠগৃহের ছাদে বায়ুসেবনার্থ গমন করেন। তথা হইতে অবতরণ করিবার সময়ে তিনি আজামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কলমা পাঠ করিয়া সোপানে উপবেশন করেন। আজাম-ধ্বনি শেষ হইলে তিনি যেমন দণ্ডায়মান হইবেন, অমনই তাঁহার পদস্খলন হয়। ইহাতেই তিনি কালগ্রাসে

পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ যমুনার তীরে সমাহিত হয়। আকবর তথায় একটি সৌষ্ঠবশালী গৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। (১)

হুমায়ূন একপঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর দিল্লী ও কাবুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সুগঠিত উন্নত দেহ ও বীরশ্রী দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। হুমায়ূনের জীবনকাহিনী উপন্যাস অপেক্ষাও রহস্যময়ী। কখনও বা ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণারাশি অজস্রধারে তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহার পরমুহূর্ত্তেই হয় ত তিনি বিপদের উত্তাল তরঙ্গমালায় পতিত হইয়া বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রথমভাগ সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর তিনি এক দিনও শান্তিসুখে যাপন করিতে পারেন নাই। ভাগ্য-

---

(১) This mausoleum is one of the most splendid monuments which the munificence of princes has placed among the magnificent memorials of departed royalty in that country where these monuments abound to a degree perhaps unparalleled in any other. Though built of the most costly materials and with a lavish expenditure exceeding any thing which preceded it the tomb of Humayoon is remarkable for the utter absence of everything like meretricious ornament. The spectator's attention is particularly arrested by the perfect chastity of design, and singular delicacy of execution, which this celebrated edifice exhibits. It is composed entirely of marble, in some of its parts exhibiting beautiful specimens of the most costly mosaic like the Tajmehal at Agra, built by Shah Jehan, after the same design, but still more costly, much more richly ornamented, and of considerably larger dimensions. The mausoleum of Humayoon is even now the admiration of travellers, and is altogether, according to the opinion of many, in better taste than that more celebrated and elaborate edifice, the Taj. *Revd. Hobart Cauntar. B. D.*

বিপর্য্যয়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি উপর্য্যুপরি যেরূপ বিপদে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও নরপতিকে সেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইতে হয় নাই। হুমায়ূন ভ্রাতৃস্নেহের দৃষ্টান্তস্থল; বস্তুতঃ অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহই তাঁহার সমস্ত দুর্দ্দশার মূল। তিনি ভ্রাতৃবৃন্দকে যতই স্নেহসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা ততই তাঁহার অনিষ্টসাধন করিয়া কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। হুমায়ূন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্যপতির সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। এই সময় তিনি কামরানের চক্ষুঃ উৎপাটন করিতে আদেশ দেন। এ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদ কাজিম ফেরিস্তা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "মোগল ওমরাহবর্গমাত্রেই তাঁহাকে কামরানের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া ভাবী বিপদের মূল উন্মূলিত করিতে বলিতেছিলেন। কিন্তু যদিও কামরান ভ্রাতৃবক্ষে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত করিয়া স্নেহের প্রতিদান দিয়াছিলেন, তথাপি হুমায়ূন ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার তাদৃশ মৃদু ব্যবহারে সৈন্যগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকেই অনুযোগ করিতেছিল যে, তাঁহার উদারতাতেই মোগলগণ বারংবার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। অবশেষে পাদশাহ বাধ্য হইয়া আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কামরানকে অন্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। (১) এই আদেশ প্রতিপালিত হইবার কয়েক দিন পরে তিনি দুর্ভাগ্য রাজকুমারকে দেখিতে যান। তাঁহার আগমনবার্ত্তা কামরানের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

(১) কামরান তাঁহার নিকট উপনীত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা জহোর-লিখিত বৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

'The king however received him graciously, and pointed him to sit down on the bed on his right hand. * * * After sometime, His

তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলেন, "এই দুর্ভাগ্যকে দেখিলে আপনার রাজসম্মানের লাঘব হইবে না।" পাদশাহ ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

হুমায়ূন মৃদুস্বভাব ও পরোপকারী ছিলেন, এ জন্যও তাঁহাকে অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ও কাব্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ধনভাণ্ডার প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বুদ্ধিমান ও রসজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে সকলেই প্রীতিলাভ করিত। হুমায়ূন যুদ্ধক্ষেত্রেও পরাক্রম ও উদ্যম প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় ক্ষমাশীল ছিল। বস্তুতঃ যদি তিনি তাদৃশ কোমল ও ধর্ম্মভীরু না হইতেন, তাহা হইলে সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন।

Majesty called for a water melon, one third of which he took and divided with his brother. * * Preparation having been made for an entertainment the whole night was passed in jollity and carousing." ইহার চারিদিন পরে কামরানকে অন্ধ করিবার রাজাদেশ প্রচারিত হয়। এই আদেশ কামরানের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমরা একবারে আমার জীবন বিনষ্ট কর, ইহাই বাঞ্ছনীয়।' রাজাদেশ প্রতিপালিত হইলে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভো, আমি ইহজীবনে যে কিছু পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম; পরকালে যেন তোমার করুণালাভ করিতে পারি।'

আকবর শাহ।

হুমায়ূনের মৃত্যুকালে আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। পঞ্জাবে সেকেন্দর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন।

এই সময় তারদি বেগ নামক জনৈক সেনাপতি দিল্লীর শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পাদশাহের মৃত্যুসংবাদ গুপ্ত রাখিয়া আকবরের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিলেন। আকবরের নিকট এই দুঃসংবাদ পঁহুছিলে, সমবেত আমীর ওমরাহগণ পরলোকগত সম্রাটের জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিয়া একবাক্যে তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁকে নবাভিষিক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্রাটের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে তখন প্রবল বাত্যা। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা হইতেছিল যে, এই প্রবল বাত্যায় ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক নবীন সম্রাটের মস্তক হইতে রাজ-মুকুট খসিয়া পড়িবে। রাজবিপ্লবে শাসনশৃঙ্খলার মূল শিথিল হইয়া পড়াতে কাবুলরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেকেন্দর শাহ হস্তচ্যুত সাম্রাজ্যের উদ্ধারার্থ পঞ্জাবে আকবরের সঙ্গে বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণ হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া নবোৎসাহে রণাঙ্গণে মোগলের শক্তিপরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বৈরাম খাঁর সাহায্যে আকবর যোগ্যতাসহকারে শত্রুদমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার পূর্ব্বেই আর এক জন পরাক্রান্ত শত্রু মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য রঙ্গভূমিতে

অবতীর্ণ হইলেন। মোহাম্মদ আদিলের সেনাপতি হিমু মোগলশক্তি পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আয়োজন সমাপ্ত করিয়া, ত্রিশ সহস্র রণনিপুণ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথি-মধ্যে আগ্রা হস্তগত করিয়া অবিলম্বে রাজধানীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। নগররক্ষক তারদি বেগের অবহেলা ও হঠকারিতায় হিমু নগররক্ষী মোগল সৈন্যবৃন্দকে সহজে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়া নিজে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার সংবাদ যে সময় আকবরের নিকট পঁহুছিল, তখন অধিকাংশ প্রদেশই তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল; কেবল-মাত্র পঞ্চনদপ্রবাহবিধৌত ভূমির কিয়দংশে তাঁহার আধিপত্য অব্যাহত ছিল।

আকবর হিমুর বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মন্ত্রিসভা আহ্বান করিলেন। সমবেত ওমরাহগণ তাঁহাকে ভারত-বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “শত্রুর সৈন্যসংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু তাহার গতি-রোধের জন্য আমরা কেবলমাত্র বিংশতি সহস্র সৈন্য নিযুক্ত করিতে পারিব। এরূপ অবস্থায় আমাদের কাবুলে গমন করাই কর্ত্তব্য। আমরা এই অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যেই কাবুল সংরক্ষণ করিতে পারিব। তার পর সুযোগ উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সহজসাধ্য হইবে।” একমাত্র বৈরাম খাঁ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া শত্রুর বলপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগৌণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া মতপ্রকাশ করিলেন। বালক হইলেও আকবর বৈরামের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিলেন। তিনি এমন ভাবে তদীয় মতের সমর্থন করিলেন যে, সমবেত সভ্যমণ্ডলী তাহাতে মুগ্ধ

হইয়া রাজকার্য্যে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আকবর বৈরাম খাঁকে খানবাবা উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহারই হস্তে সমস্ত বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিলেন। বৈরামও তাঁহার পরিতোষের জন্য স্বীয় পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া পরলোকগত সম্রাটের প্রেতাত্মার নামে শপথ করিলেন যে, তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না।

ওমরাহগণ আকবরের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যে ধনপ্রাণ সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় এরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হইল যে, তাহাতে ওমরাহগণ বুঝিতে পারিলেন, রাজাজ্ঞা-প্রতিপালন ব্যতীত তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং ভয় ও মৈত্রীর প্রভাবে তাঁহারা সম্রাটের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। আমরা এখানে সেই ঘটনাটির বর্ণনা করিতেছি। হিমু কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার সময় তারদি বেগ খাঁ দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার হঠকারিতাতেই দিল্লী অধিকার করা শত্রুর পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। বৈরাম খাঁ ও তারদি বেগের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্য নিবন্ধন তাঁহারা পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লী শত্রুহস্তে পতিত হইলে তারদি বেগ পঞ্জাবে আকবরের শিবিরে আগমন করেন। বৈরাম খাঁ পূর্ব্বোক্ত অপরাধে তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হন। একদা আকবর ক্রীড়া উপলক্ষে শিবির হইতে বহির্গমন করিলে সেনাপতি তাঁহার চিরশত্রুর শিরশ্ছেদন করেন। যদিও বৈরাম খাঁর এই আচরণ একান্ত কঠোর ও নৃশংস বলিয়াই চিরকাল নিন্দিত হইবে, তথাপি ইহা সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে সেনানায়কদিগকে কর্ত্তব্যসাধনে বহুলপরিমাণে উন্মুখ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (১)

---

(১) বদায়নি প্রভৃতি ইতিহাসবের্ত্তৃগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আকবর এবং

হিমু দিল্লীবিজয় সম্পন্ন করিয়া পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে সসৈন্যে সমবেত হন। এই স্থানে তাঁহার সৈন্যের সহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মোগল সামন্তগণ রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তারদী বেগের দশাপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়াই হউক, অথবা মহদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই হউক, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হিমু রণনিপুণ হস্তীর সাহায্যেই সংগ্রামক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুসৈন্যের মধ্যভাগে উপনীত হইবামাত্র প্রতিপক্ষের অস্ত্রনিক্ষেপে জর্জ্জরিত হইয়া হস্তীগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং মাহুতের অনুজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চাৎগামী হইল। ইহাতে হিমুর সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তথাপি হিমু ভগ্নহৃদয় না হইয়া চারি সহস্র সৈন্য সহ বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুর হস্তনিক্ষিপ্ত শরে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তদীয় সৈন্যগণ এই আঘাতে হিমুর মৃত্যু অবধারিত বিবে-

---

হত্যাকার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন। তারদি বেগের স্বভাব একান্ত চঞ্চল ছিল। তিনি কখনও বা হুমায়ূনের পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কখনও বা তাঁহার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। হুমায়ূনের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এ সময় আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্যপুত্র তথায় ছিলেন। এ অবস্থায় একমাত্র তারদি বেগের কৌশলেই আকবর বিনা বিঘ্নে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবুল ফজল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এরূপ ব্যক্তির হত্যাকার্য্যে যে আকবরের ন্যায় মহানুভব সম্রাট সংলিপ্ত ছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদ কাজিম ফেরিস্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বৈরাম খাঁ এ বিষয়ে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেনাপতি বলেন, জাঁহাপনা, আমি আপনার বিনা অনুমতিতেই তারদি বেগকে বধ করিয়াছি; জাঁহাপনা বড় দয়ালু, আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ক্ষমা করিতেন। কিন্তু এই বিপদ-সঙ্কুল সময়ে কেহ রাজকার্য্যে অবহেলা করিলে সৈন্যমধ্যে শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য তাঁহাকে রাজদ্রোহীর ন্যায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। আকবর এইরূপ কঠোর শাস্তির ঔচিত্য অনুভব করেন, কিন্তু উহার অমানুষিকতায় শিহরিয়া উঠেন।

চলা করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ হিমু তীর সহ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন, এবং তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসাধারণ বীরত্ব ও একাগ্রতাসহকারে শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া সৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, এবং কৃপাণহস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া ক্রমশঃ শত্রুসৈন্য মথন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় কুলী নামক একজন মোগল সেনানায়ক হিমুর হস্তি-চালকের প্রাণনাশ করিবার জন্য বর্ষা উত্তোলন করিলেন; মৃত্যু-ভয়ব্যাকুল মাহুত আত্মজীবনরক্ষার জন্য হিমুকে দেখাইয়া দিল। কুলী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্দী করিলেন। বিজয়শ্রী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

মোগল সৈন্য হিমুকে বন্দী করিয়া আকবরের শিবিরে আনয়ন করিল। তখন হিমুর অবস্থা একান্ত শোচনীয়; আহত অঙ্গ হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাবহেতু তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল। আকবর বিজিত কাফেরকে স্বহস্তে বধ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য বৈরাম খাঁ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষকের উপদেশমত তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা হিমুর মস্তক স্পর্শ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বৈরাম খাঁ রোষকষায়িত-নেত্রে আকবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে, অসময়ে দয়া প্রকাশই তাঁহার বংশের সমস্ত বিপদের মূল কারণ। তাহার পর তিনি স্বয়ং বিজিত বীরপুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন। হিমুর মস্তক কাবুলে ও তাঁহার দেহ দিল্লীর দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রেরিত হইল।

পাণিপথের যুদ্ধের অত্যল্পকাল পরেই কাবুল বিদ্রোহের শান্তি হইল, এবং সেকেন্দর শাহের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত হইল। আকবর

বৈরাম খাঁর সাহায্যে শত্রুরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে নিরাপদ হইলেন।

যে মোগল সাম্রাজ্য উত্তরকালে বিশালতা, ধনগৌরব ও সামরিক বলে এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, যাহার গৌরব-রবি প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমগ্র জগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, যাহার ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নকাহিনীতে প্রলুব্ধ হইয়া বৈদেশিক বণিকগণ দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং যাহার সুস্নিগ্ধ শ্যামল ছায়াতলে ভারতবাসী বহুদিন সুখে কালযাপন করিয়াছিল, তাহা এই ভাবে সূচিত হয়। সূচনাকালে ইহার অবস্থা কিরূপ ছিল, আমরা প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিব; তাহার পর আকবর কোন্ সাধনায় তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

"ভারতের সিংহাসন মোগল পাঠানের পক্ষে এক প্রকার অভিশপ্ত, কেহ কখনও অবিচ্ছিন্নভাবে বংশানুক্রমে বহুদিন বহুযুগ ধরিয়া ইহার উপর বিরাজ করিতে পারে নাই। প্রথম মোসলমান আক্রমণ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষিস্বরূপে ইতিহাস আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। দাস বংশ গেল, খিলিজি গেল, পাঠানাধিকারের অস্তিত্ব লোপ হইল। শোণিতরেখা তীরে রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহাপ্লাবনের প্রচণ্ড স্রোত গুলি যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবার নূতন কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। চাঘটাই সমরখন্দের অনুর্ব্বর প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া কৃপাণহস্তে ফল-শস্য-ধন-রত্ন-পূর্ণ কুবেরের লীলাক্ষেত্র প্রকৃতির প্রমোদকানন হিন্দুস্থানে পদার্পণ করিল। চাঘটাই মোগল বাবর শাহ পাঠানবংশের অস্তিত্ব লোপ করিয়া আবার অভিশপ্ত সিংহাসনে আসন বিছাইলেন। বাবর গেলেন, হুমায়ুন আসিলেন। আবার শের শাহ প্রবলঝঞ্ঝা উঠাইলেন। আবার

অভিশপ্ত সিংহাসনের আস্তরণ খসিয়া পড়িল ; ভারতে মোগলের শক্তি-বিকাশের শেষচ্ছটা পর্য্যন্ত মলিন হইয়া আসিল ; সে মলিনতা যে ইহজন্মে ঘুচিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।” (১)

মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া সের শাহ আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। হুমায়ূন অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু সেরের উত্তরাধিকারিগণের অবিমৃষ্যকারিতায় হিন্দুস্থান তাঁহাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। হুমায়ূন পুনর্ব্বার দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। তাহার পর দুই দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন ; হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক আকাশ মেঘের ঘোরঘটায় আচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে কিশোরবয়স্ক আকবর কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

আকবর শাহের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন মোসলমান বংশের রাজত্বই সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু তৈমুর বংশের প্রতিষ্ঠিত রাজত্বই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও নিরবলম্ব ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল। গজনি ও ঘোরবংশীয় নৃপতিগণের স্বদেশ বিজিত রাজ্যের সংলগ্ন ছিল বলিয়া তাঁহারা বিপৎকালে স্বদেশ হইতে সাহায্যলাভ করিতেন। অন্যান্যবংশীয় অধিপতিগণের রাজত্বকালেও তাঁহাদের স্বদেশীয় বীরগণ দলে দলে ভারতবর্ষে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ আগমন করিতেন বলিয়া তাঁহারাও সর্ব্বদা জনবলে বলীয়ান্ থাকিতেন। বাবর পাদশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাবুল দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অধিবাসিগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের স্বদেশিরূপে কিয়ৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু কামরানের অধীনে এদেশ হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে

(১) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম সংখ্যা, ১৮৯৯।

আকবরের রাজ্যলাভকালে উহা তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিল। আফগান বহুল ভারতীয় মোসলমানসমাজও মোগলবংশোদ্ভব কিশোরবয়স্ক সম্রা-টের শত্রু বলিয়া পরিগণিত ছিল। ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জও মোগল রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল না। বাবর পাদশাহ ভারতবর্ষে সিংহাসন পাতিবার পর সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহেই নিরত ছিলেন, প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলার্থ কোন বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। তদীয় পুত্র হুমায়ূনও শাসনসৌকর্য্যার্থ কোন অভিনব-প্রথার উদ্ভাবন করিয়া প্রজাসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার শাসনকালেও শাসনযন্ত্র ভারতবাসীদিগকে পূর্ব্ববৎ পিষ্ট করিয়াছিল। ভারতবাসী মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সঙ্গে আপনাদের সুখ দুঃখ জড়িত বলিয়া বিবেচনা করিত না। এজন্য তাহারা উহার স্থায়িত্ব অথবা বিলোপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ভারত-বর্ষের বহির্ভাগেও কোন শক্তিশালী জাতি আকবরের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল না; অথবা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও প্রকৃতিপুঞ্জ, তাঁহার বংশের প্রতি অনুরাগী ছিল না। কেবলমাত্র মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন দেশের লুণ্ঠনলোলুপ যুদ্ধব্যবসায়িগণ তাঁহার অনুগামী ছিল। সম্রাট নিজে কিশোরবয়স্ক, এবং তাঁহার সৈন্যদল আত্মপরায়ণ সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল; এরূপ অবস্থায় রাজ্যের স্থায়িত্বের আশা সুদূরপরাহত হইবে, তাহা বিচিত্র কি? ইহাতেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিকূল অবস্থার অব-সান নহে। আকবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বহুসংখ্যক মোসলমান রাজ-বংশের বিলোপ হইয়াছিল; এই সকল বংশের যথার্থ ও প্রতারক উভয়-বিধ উত্তরাধিকারিগণে সমগ্র দেশ পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, এবং বহুসংখ্যক লুণ্ঠনপ্রয়াসী সৈন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার

পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইত। এই সব কারণে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "Panipat had given Akbar India,—an empire without a root in the soil liable to be overthrown by the first strong gust.

তাদৃশ নিরবলম্ব দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ববিধানই আকবরের সর্ব্ব-প্রধান কার্য্য ছিল। বিধাতৃপুরুষও তাঁহাকে এই গুরুতর কার্য্যসম্পা-দনের উপযোগী নানাবিধ সংগুণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আকবরের হৃদয় একাধারে পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও রমণী-সুলভ কোম-লতায় সুগঠিত হইয়াছিল। কিশোরবয়স্ক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দু-কুলোদ্ভব হিমু সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে তুমুল বাত্যা তুলেন, তাহাতে বালকের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িবার উপ-ক্রম হয়। পিতৃ-সুহৃদ বৈরাম খাঁ অক্লান্ত যত্নে ও চেষ্টায় হিমুর বিষদন্ত উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আকবরের সন্নিধানে আনয়ন করেন। বৈরাম খাঁ শত্রুর শিরশ্ছেদন করিবার জন্য আকবরকে বারবার উত্তেজিত করেন। কিন্তু আকবর আপনার প্রধান অবলম্বন পিতৃতুল্য সুহৃদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাদৃশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না, এবং বৈরাম খাঁ সে জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই।

আকবর বিলাস-বিমুখ, কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন। "সমর-ক্ষেত্রের কোলাহলে ও কষ্টে তাঁহার যে আনন্দ ছিল, দিল্লী আগ্রার মর্ম্মর-ময় রত্নমণ্ডিত রাজকক্ষেও সেই আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি প্রতি-দিন দুই শত লোকের জন্য মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করাইতেন। নিজে কয়েক মুষ্টিমাত্র খাইয়া বাকী আগ্রা দুর্গের প্রাচীর পার্শ্বে সমবেত দরিদ্র-

দের ধরিয়া দিতেন।” (১) তাঁহার রাজত্বকালে একবার গুজরাটে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তাহাতে তাঁহার শক্তি ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হয়। তখন বর্ষাকাল; পথঘাট একান্ত দুর্গম। সুতরাং সৈন্যের অভিযান দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু আকবর স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতাবশে তথায় স্বয়ং উপনীত হইবার জন্য সঙ্কল্প করেন, এবং তদভিমুখে যাত্রা করিয়া এত দ্রুতবেগে পথ অতিবাহিত করিয়াছিলেন যে, সেই দারুণ বর্ষায় আগ্রা পরিত্যাগ করিবার পর নবম দিবসে ত্রিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সার্দ্ধ চারি শত মাইল দূরবর্ত্তী শত্রুর সম্মুখীন হন। আকবর কখনও কখনও ব্যায়ামের জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। একবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে একাদিক্রমে দুই দিন অতিবাহিত করিয়া এক শত দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক আজমীর হইতে দিল্লীতে আগমন করেন।

বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া আকবর কখনও আনন্দ অনুভব করেন নাই; কিন্তু আবশ্যকমত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র সহজাত-সংস্কার-বশে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু যুদ্ধ কখনও তাঁহার প্রিয় ছিল না। আকবরের বীরত্বকাহিনী রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার পর বিদ্রোহপ্রবণ সাম্রাজ্য শান্ত হইয়াছিল। সন্ধিবিগ্রহে তিনি স্বয়ং কখনও দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতেন না। সমরক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যের

---

(১) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম সংখ্যা, ১৮৯৯।
আকবর সমস্ত দিবারাত্রিতে একাধিকবার আহার করিতেন না।

ভার সেনাপতিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পুনর্ব্বার শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

আকবর ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে পূজিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা দয়াধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিল না। আকবর অত্যন্ত সদাশয় ও ক্ষমাশীল ছিলেন। মোহাম্মদ কাজিম ফেরিস্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ক্ষমাধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি কখনও কখনও শাসকের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল, এই জন্য জনসাধারণ তাঁহার ক্ষমাশীলতা দুর্ব্বলতার ফল বলিয়া বিবেচনা করিত না, বরং সদাশয় শাসনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। আকবর বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করিয়া প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিতেন, কখনও তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেন না। তাঁহার হৃদয় একান্ত কোমল ছিল; পশুপক্ষীর যন্ত্রণাতেও তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন। একদা তাঁহার পুত্র সেলিম একব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে জীবদ্দশায় চামড়া তুলিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। আকবর এই আদেশের বিষয় অবগত হইয়া বলেন, "মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিবার দৃশ্যও আমাকে ব্যথিত করে। আমার পুত্র হইয়া সেলিম কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিয়াছে।" যদিও আকবর নিতান্ত কোমলহৃদয় ছিলেন, তথাপি তিনি আবশ্যকমত কঠোর হস্তে ন্যায়-দণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন।

এই হিন্দুর দেশে সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে গুণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, আকবর তাহাতেও ভূষিত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। তিনি কখনও পরধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। (১)

---

(১) আকবরের ধর্ম্মমত কি প্রকার উন্নত ও উদার ছিল, তাহার প্রদর্শনার্থ,

আকবর একান্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। (১) প্রীতির

কাশ্মীরের একটি মসজিদের গাত্রে উৎকীর্ণ করিবার জন্য তদীয় প্রধান সহচর আবুল ফজল কর্ত্তৃক রচিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।—

O God, in every temple I see people that see thee,
And in every language I hear spoken people praise thee.
Polytheism and Islam feel after thee.
Each religion says, "Thou art one, without equal."
If it be a mosque people murmur the holy prayer.
And if it be a Christian Church people ring the bell from love to thee.
Sometimes frequent the Christian cloister, and some times to the mosque.
But it is thou I seek from temple to temple.
Thy elect have no dealings with heresy or with orthodoxy.
For neither of them stands behind the scene of thy truth.
Heresy to the heretic, and religion to the orthodox,
But the dust of the rose-petal belongs to the heart of the perfume seller.

(১) আবুল ফজল ও ফৈজী, বীরবল সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ছিলেন। বীরবল পাদশাহের কার্য্যে শত্রুহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করেন; ফৈজী আজীবন আকবরের কার্য্যে রত থাকিয়া লোকান্তরিত হয়েন, এবং আবুল ফজল সেলিমের ষড়যন্ত্রে বিদেশে নিহত হন। এই মিত্রত্রয় একে একে আকবরের জীবদ্দশাতেই কালগ্রাসে পতিত হন। পাদশাহ সুহৃৎ-শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়াছিলেন। আমরা সে বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—"In the course of action for subduing the Yousufies, Akbar's greatest personal friend Raja Birbal died owing to the rashness of Zein Khan, the general. Akbar refused to see Zein Khan, and was long inconsolable for the death of Birbal. As the Raja's body was never found, a report gained currency that he was alive amongst the prisoners and it was so much encouraged by Akbar, that a long time afterwards an impostor appeared in his name. As this second Birbal died before he reached the Court

আস্পদ সম্রাটের কার্য্যে প্রাণপাত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। আকবর প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ অমাত্যবর্গ লাভ করিয়াছিলেন; এ বিষয়ে ভারতীয় আর কোন মোসলমান নরপতিই তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী ছিলেন না।

আকবর স্বভাবতঃ শাসন সংরক্ষণ কার্য্যের অনুরাগী ছিলেন, এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যথার্থ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। কর্ত্তব্য সাধনে আকবরের অসাধারণ প্রীতি ছিল। তিনি কর্ত্তব্যপালন ঈশ্বরোপাসনার তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আকবর কর্ত্তব্যসাধন জন্য সর্ব্বদা কঠোর পরিশ্রম করিতেন। আমরা "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক পাক্ষিক পত্র হইতে তাঁহার দৈনিক কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

Akbar was again mourning"—*Elphinstone's History of India.* "Faizi died 5th October 1595, barking like a dog according to the austere Badauni,—but really weak and speechless. Akbar saw him at midnight; supporting his friend's head he said gently, 'Shekaji! here is a Doctor, will you not speak to me?' One fancies the faint look of the closing eye, but no words escaped the lips, the emperor threw his head-dress on the ground and wept aloud."—*Keen's The Turks in India.* "When the news of that dire calamity and dreadful event (murder of Abul Fazl) reached that shadow of God, the Emperor Akbar, he was extremely grieved, disconsolate, distressed, and full of lamentation. That day and night he neither shaved as usual, nor took opium, but spent his time in weeping and lamenting." *Wikayai-Asad Beg.* বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বোচ্ছার রাজা নরসিংহ, কোন কোন মতে বীরসিংহ, [জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে নরসিংহ লিখিয়াছেন] যে সেলিমের প্ররোচনায় আবুল ফজলকে হত্যা করেন, তাহা পাদশাহ আকবর অবগত ছিলেন না। তিনি বন্ধু-হন্তাকে শাস্তি দিবার জন্য সেলিমকে প্রেরণ করেন। নরসিংহদেব পলায়ন করাতে তাঁহার রাজ্য মোগলের হস্তগত হয়। সম্রাট ইহার পর অত্যল্পকাল জীবিত ছিলেন; এই জন্য নরসিংহ নিষ্কৃতিলাভ করেন।

আকবর দিবাভাগে কিয়ৎক্ষণ এবং রাত্রিকালে অল্পক্ষণ নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে রাজদর্শনপ্রার্থী সৈনিক, বণিক, কৃষক, পণ্যজীবি ও সাধারণ প্রজাদিগকে লইয়া দরবার করিতেন। দরবার ভঙ্গ হইলে অন্তঃপুরে গমন করিবার নিয়ম ছিল। তৎসময় ধর্ম্ম ও সংসার সম্বন্ধীয় বহুকার্য্যে অতিবাহিত হইত। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে তিনি কিয়ৎক্ষণের জন্য নির্জ্জনকক্ষে বিশ্রাম করিতেন প্রতিদিন অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে দ্বিতীয় বার দরবার করিবার নিয়ম ছিল। এই দরবারে রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া রাজ্যশাসন সম্পর্কে বিবিধ বিষয়ে আদেশ প্রার্থনা করিতেন। "নিশা জাগরণ এই জাগ্রন্মনা সম্রাটের প্রকৃতিসিদ্ধ" ছিল। রাত্রিকালে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের সভা হইত। তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেন। অনেক সময় রজনীযোগে রাজ্য ও রাজত্ব সম্বন্ধীয় নিগূঢ় বিষয়ে মন্ত্রণা হইত। বিদ্যালোচনা অথবা রাজকার্য্য শেষ করিতে রাত্রি সুগভীর হইয়া উঠিত, একযাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিত। তখন নানা প্রদেশের গায়ক ও বাদকগণ সমাগত হইয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক পাদশাহের মনোরঞ্জন করিতেন। "চারি দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে সম্রাট মৌনাবলম্বন করিয়া প্রেমের নিভৃত কুটীরে অন্তর্ব্বহি সমভাবাপন্ন করিয়া স্থিতি ** এবং তত্ত্বসাগরে সন্তরণ" করিতেন।

আকবরের রাজনীতি উৎকৃষ্ট ছিল। আমরা "ধর্ম্মতত্ত্ব" হইতে তাঁহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "অসত্যাচরণ সকলের পক্ষে গর্হিত, বিশেষতঃ রাজার পক্ষে অতিশয় গর্হিত। এই সকল লোককে ঈশ্বরের ছায়াবলে, ছায়া সরল থাকিবে। চারিটি কার্য্য হইতে রাজা নিবৃত্ত

থাকিবেন, অধিক মৃগয়া, নিরন্তর ক্রীড়ামোদ, দিবা রজনী মত্ততা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে সমধিক ঘনিষ্টতা।”

আকবরের রাজোচিত গুণগ্রাম কিরূপে অসাধারণ ছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। আকবর যে সকল কারণের সমবায়ে তাদৃশ মানসিক বৈভবের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনার যোগ্য। প্রধানতঃ, দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, আকবরের পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্য বীর্য্য, জ্ঞানানুরাগ ও মহত্ত্ব তাঁহাতে উত্তরাধিকারক্রমে অর্পিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়, তিনি নিজেও সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তৈমুর বংশীয় নরপতিগণ সাধারণতঃ পাঠক সমাজে বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা এবং বীরবাহু যোদ্ধা বলিয়াই প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানানুরাগ এবং প্রজাহিতৈষণাও নিরতিশয় প্রবল ছিল। পৃথিবীর অল্পসংখ্যক নরপতিই তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞানলিপ্সু ও পণ্ডিত মণ্ডলীর উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ সমরকন্দ ও বোথারায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎসমুদায়ের পরিচালনার্থ প্রচুর ধন ন্যস্ত করেন। উত্তরকালে এই দুই স্থান মোসলমান জগতের জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তৈমুরলঙ্গই তাদৃশ উন্নতির সূত্রপাত করেন। তাঁহার আদেশে বা ঔদাসীন্যে দেশবিজয় অন্তে সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ নরনারীর রক্তে বসুধা কলঙ্কিত হইত। কিন্তু তিনি বিদ্বজ্জনের প্রাণরক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। একবার মহাকবি হাফেজ তাঁহাকে কটুকথা কহেন; কিন্তু তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বে মুগ্ধ ছিলেন বলিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্য্যই তৈমুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর ছিল।

তৈমুরের উত্তরাধিকারীগণ সুবিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রবল জ্ঞানানুরাগও লাভ করেন। তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহরুক পিতার ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্যশালী ও জ্ঞানলিপ্সু ছিলেন। কিন্তু তিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও দয়া ধর্ম্মের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেশ বিজয়জনিত গৌরবলাভ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

শাহরুক স্বীয় পুত্র উলুগবেগকে তুর্কিস্থানের শাসনভার অর্পণ করিবার সময় বলেন, "বৎস্য, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আত্মসুখের জন্য আমাদিগকে ক্ষমতাশালী করেন নাই। দুঃস্থ ব্যক্তিদের কষ্টমোচন জন্য নিরত হওয়া আবশ্যক; ইহাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায়। * * * বিচারকগণ যাহাতে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ন্যায়বিচার করেন, তজ্জন্য মনোযোগী হইও। বিশেষভাবে কৃষককুলকে রক্ষা করিও, তাহাদিগকে রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্ম্মচারিগণের উৎপীড়ন ও অর্থলালসা হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল থাকিও।"

তৈমুরের বীরত্ব ও জ্ঞানানুরাগ এবং শাহরুকের মহত্ত্ব ও প্রজাহিতৈষণা পরবর্ত্তী নরপতিগণের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হইত। তৈমুরের অন্যতম প্রপৌত্রের নাম আবুসৈয়দ; আবুল ফজল তাঁহাকে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদীয় পুত্র ওমর শেখ মিরজা ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ওমরের পুত্র বাবর অতুল শৌর্য্যবীর্য্য, প্রবল জ্ঞানানুরাগ ও নির্ম্মল মহত্ত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

হুমায়ূনও পিতার ন্যায় মানসিক গুণরাজির অধিকারী ছিলেন। তিনি ঘোর বিপদের সময়েও কবি, লেখক ও পণ্ডিতগণে পরিবেষ্টিত

থাকিতেন। অঙ্ক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থালয় তাঁহার জ্ঞানপিপাসার সাক্ষ্যদান করিত।

কিন্তু তাদৃশ মানসিক গুণরাজির অনুরূপ রাজনীতিজ্ঞতা ও শাসন-কুশলতা তাঁহার ছিল না। একারণ তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বিধির বিড়ম্বনায় নানাস্থানে ঘূর্ণিত হইতে থাকেন। এই সময় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দালের শিক্ষকের রূপসী কন্যা হামিদা বানু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হন। সে অতুল রূপরাশি সন্দর্শনের প্রথম মুহূর্ত্তেই হুমায়ূন একবারে বিমোহিত হইয়া পড়েন, এবং হিন্দালের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে অচিরে অঙ্কলক্ষ্মী করেন। এই বিবাহের সুমধুরফল আকবর। হুমায়ূন সুন্নি ছিলেন। হামিদা শিয়া মতাবলম্বিনী ছিলেন। পরস্পর বিরোধী সুন্নি এবং শিয়ামত সম্মিলিত হইয়া যে ফলপ্রসব করে, তাহাকে মূর্ত্তিমান ঔদার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আকবর যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন হুমায়ূনের চতুর্দ্দিকে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া আকবর সার্দ্ধ এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতামাতার স্নেহ-কোমল আশ্রয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন। পিতৃবৈরী পিতৃব্য কামরান তাঁহাকে হস্তগত করেন। আকবরের শৈশবকাল তাঁহার বিদ্বেষ-কঠোর আশ্রয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানে তিনি বহু ক্লেশ ও দুর্গতির মধ্যে বর্দ্ধিত হন; অনেকবার তাঁহার জীবন বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল। আকবর কিঞ্চিদধিক সপ্ত বর্ষকাল পর্য্যন্ত অশেষ কষ্টভোগ করেন এবং পুনঃ পুনঃ নানারূপ বিপদে পতিত হন। ফলতঃ, তাঁহার শৈশবকালে সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছিল না; ধনমদ ও চাটুবাদ তাঁহার চিত্তকে মলিন করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হয় নাই। আকবর

নানা প্রতিকূলাবস্থায় লালিত পালিত হইয়া বর্ষাধৌত বিকচ পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুট হইয়া উঠেন।

ঐতিহাসিক নিজাম উদ্দীন আহম্মদ লিখিয়াছেন যে, তৈমুর বংশের প্রথানুসারে চারি বৎসর চারিমাস, চারি দিন বয়ঃক্রম কালে আকবরের বিদ্যারম্ভ হয়। শুভক্ষণে তাঁহার "হাতে খড়ি" হইবার কথা ছিল। কিন্তু শুভক্ষণ সমাগত হইলে তিনি বালসুলভ চপলতাবশতঃ লুক্কায়িত হন; তাঁহাকে বহু অনুসন্ধানেও সময় মত পাওয়া যায় না। একারণ তাঁহার বিদ্যাভ্যাস সন্তোষজনক হইবে না বলিয়া সকলের বিশ্বাস জন্মে। মৌলানা আজাম উদ্দীন তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে নিযুক্ত হন। আজাম উদ্দীনের ক্ষিাদানের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তখন তৎপদে মৌলানা বায়েজিদকে নিযুক্ত করা হয়। ইহার কিছুদিন পরে মুনিমখাঁ রাজশিক্ষক নিযুক্ত হন। মুনিম খাঁ রাজকুমারকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহোপযোগিনী শিক্ষাপ্রদান করেন। এই সময় তিনি অশ্বে আরোহণ এবং বিবিধ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

হুমায়ূনের পরলোকগমনের পর বৈরাম খাঁ আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন। বৈরাম খাঁ তাঁহাকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহোপযোগিনী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন না; তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ সাধন জন্যও সমুচিত বন্দোবস্ত করেন। বৈরাম খাঁ নিজে জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তিনিও তাঁহার স্বর্গগত প্রভু হুমায়ূনের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার প্রতিনিধিত্বের সময় দিল্লীর রাজদরবার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের বিদ্বজ্জনে পূর্ণ থাকিত। বৈরাম খাঁ এই পণ্ডিতশ্রেণী হইতে সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক মির আব্দুল লতিফকে রাজশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আব্দুল লতিফ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি

কোন কারণে তত্রত্য অধিপতির বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। এজন্য তিনি দিল্লীর দরবারে আশ্রয়প্রার্থনা করেন। গুণগ্রাহী হুমায়ূন তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরেই হুমায়ূন পরলোকগত হয়েন। তার পর বৈরাম খাঁ তাঁহাকে নবীন সম্রাটের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শিক্ষকের নিকট আকবর তদ্গতচিত্তে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রহেলিকাপূর্ণ গজলগুলি পাঠ করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সময় তিনি হাফেজের সুমধুর পদাবলী কণ্ঠস্থ করেন। প্রথম শিক্ষাই মনুষ্যের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এজন্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আকবর উত্তরকালে যে অসাধারণ সমদর্শিতা ও মনস্বিতার পরিচয় দেন, তাহার মূল তিনি আব্দুল লতিফের সমীপেই প্রাপ্ত হন। আব্দুল লতিফ মহামতি ছিলেন, "সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন" তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত এরূপ সংযত ও উদার ছিল যে, পারস্যের অধিবাসীরা তাঁহাকে সুন্নি ও হিন্দুস্থানের মোসলমানেরা তাঁহাকে শিয়া বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তিনি সুন্নি কিংবা শিয়া, কোন মতাবলম্বীই ছিলেন না। তাঁহার তেজস্বিনী প্রকৃতি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। আব্দুল লতিফ সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রিয় বিকার নির্ম্মুক্তবিবেকবাণীকেই স্বীয় জীবনের নিয়ামক করিয়াছিলেন। তাঁহার মহোচ্চ উপদেশ সমূহ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল; আকবর স্বভাবতঃ জ্ঞানার্জ্জনে অনুরাগী ছিলেন, এবং সৎ সঙ্গে বাস নিবন্ধন তাঁহার সে জ্ঞানস্পৃহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ফলতঃ আকবর কি বংশগৌরব, কি শৌর্য্যবীর্য্য, কি সুশিক্ষা ও

মহত্ত্ব, সর্ব্ব প্রকারেই ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার ও মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগেই এবিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বৈরাম খাঁ রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। তিনি আকবরের নামে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদানীন্তন শাসন-প্রণালী বৈরাম খাঁর মতানুগত ছিল; পাদশাহের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

আকবর আশৈশব বৈরাম খাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে বর্দ্ধিত হন। বৈরা-মের অসীম রণনৈপুণ্য ও অক্লান্ত উদ্যমের বলেই আফগানের গ্রাস হইতে মোগল সাম্রাজ্যের উদ্ধার হইয়াছিল। এ জন্য পাদশাহ তাঁহাকে খানবাবা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁ দীর্ঘকাল পাদশাহের সহিত স্নেহসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। আবুলফজল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বৈরাম প্রথমতঃ নির্ম্মলচরিত্র ও লোকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রভূত ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তোষামোদজীবিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রুরস্বভাব ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন।

একদা আকবর হস্তীর ক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া বৈরাম খাঁর পটাবাসে প্রবেশপূর্ব্বক নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটায়, এবং তাহাতে বৈরাম খাঁর জীবন সংশয়াপন্ন হয়। এই ঘটনা তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, তিনি হস্তী-চালকের প্রাণদণ্ড বিধান করেন। কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্তিলাভ না করিয়া কয় দিন পাদশাহের সঙ্গেও অসদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈরাম খাঁ একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুরুষকে অতি লঘু অপরাধে নিহত

করেন। পাদশাহের অন্যতর শিক্ষক মীর মোহাম্মদও তাঁহার হস্তে প্রাণ হারাইতেছিলেন, কিন্তু অল্পের জন্য পরিত্রাণলাভ করিয়া রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হন। সন্দিগ্ধচিত্ত বৈরাম খাঁর সন্দেহের ফলে পাদশাহের অনুচরগণও সর্ব্বদা নিগৃহীত হইতেন। এই সকল কারণে রাজদরবারে তাঁহার শত্রুসংখ্যা অল্প ছিল না। পাদশাহ নিজেও তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হন। শত্রু-দল বৈরামকে অপদস্থ করিবার জন্য পাদশাহকে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিত। বৈরাম খাঁ রাজনীতি-বিশারদ কার্য্যপটু মন্ত্রী ছিলেন ; পাদশাহ মন্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তদীয় সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিতেন। পাদশাহ স্বীয় ধাত্রী মাহম আঙ্কার একান্ত অনুরক্ত ছিলেন ; তিনিও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পাদশাহকে উত্তেজিত করিবার জন্য যত্নবতী ছিলেন। অবশেষে আকবরও বৈরামের ক্ষমতা লুপ্ত করিবার প্রয়াসী হন। আকবর জানিতেন, দুরাকাঙ্ক্ষ বৈরাম খাঁর হস্তে আংশিক ক্ষমতা থাকিলেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহাকে অপদস্থ করিতে হইলে তাঁহার সমগ্র ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে হইবে। এই জন্য তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এরূপ কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যে, পাদশাহ আর নীরব থাকিতে না পারিয়া স্বহস্তে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে আদেশ-লিপি প্রচারিত করিলেন। (১)

---

(১) এই সময় আকবর দিল্লীতে এবং বৈরাম খাঁ আগ্রাতে অবস্থান করিতেছিলেন। পাদশাহ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া খানখানানকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন :— "As I was fully assured of your honesty and fidelity, I left all important affairs of State to your charge and thought only of my pleasures. I have now determined to take the reins of the govern ment into my own hands, and it is desirable that you should now

এই আদেশ-লিপি প্রচারিত হইলে বৈরাম খাঁ দেখিলেন যে, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন, এবং পাদশাহ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সমস্ত পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন। এ জন্য তিনি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে নাগরে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া পাদশাহের অনুকূল আদেশের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদশাহ পুনরাহ্বানের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাইবার জন্য পীর মোহাম্মদকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে খানখানান নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু অচিরাৎ পরাজিত হইয়া অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিলেন। খানখানান সাম্রাজ্যের সঙ্কটকালে উহার রক্ষার্থ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা পাদশাহের স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া রাজদরবারে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। বৈরাম খাঁ রাজদরবারে উপনীত হইয়া গলদেশে পাগড়ী বন্ধন পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে সিংহাসনতলে পতিত হইলেন। পাদশাহ হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর শীর্ষস্থানে উপবেশন করাইলেন; তাহার পর তাঁহার আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য মূল্যবান খেলাৎ প্রদান করিয়া বলিলেন, "যদি খানখানান সামরিক জীবন প্রিয় বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কাল্পী ও চিনদেরীর শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিতে পারি; সেখানে তিনি আপনার প্রতিভার সম্যক্ অনুশীলন করিতে পারিবেন। আর যদি তিনি রাজদরবারেই

---

make the pilgrimage to Mecca upon which you have been so long intent. A suitable jagir out of the perganas of Hindustan shall be assigned to your maintenance, the revenue of which shall be transmitted to you by your agent."—*Tabakt-i-Akbari.*

মোহন মন্ত্রে সম্মিলনস্থত্রে গ্রথিত করিয়া এক সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে মনন করিলেন। তিনি প্রতিভা বলে দেখিতে পাইলেন যে, এই সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের কর্ণধার ভারতবর্ষের হিন্দু নরপতি ও প্রজাগণ কর্তৃক কেবলমাত্র অধিনেতৃরূপে গৃহীত হইলেই অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না, তাঁহাকে ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া জাতীয় অধিনেতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে হইবে। ইহা একান্ত দুরূহ সমস্যা। বিগত সার্দ্ধ তিন শতাব্দীর মোসলমান নরপতিগণ কখনও এ দিকে মনোনিবেশ করেন নাই। তাঁহারা সামরিক বলেই ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন, এবং তাহার হ্রাসবৃদ্ধিতেই বারংবার রাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে।

আকবর প্রথমতঃ খণ্ডরাজ্যসমূহ জয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্র করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি এ জন্য বহুলপরিমাণে হিন্দুর বাহুবল প্রয়োগ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবৃন্দ ও প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলবিধায়ক বিধানসমূহ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিপদে অকৃত্রিম বন্ধু, বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে উদ্ধারকর্ত্তা জাতীয় ভাব ও আচার ব্যবহারের মর্য্যাদারক্ষক, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতিপালক এবং হিন্দু-মোসলমান-সমাকীর্ণ দেশে অপক্ষপাতী বিচারকর্ত্তা ও সমবিধির প্রবর্ত্তক-রূপে, কি রাজা কি প্রজা, সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাজন হইবার কল্পনাতেই তিনি এইরূপ নীতি অবলম্বন করিলেন।

আকবর উজবেগ, আফগান, হিন্দু, পার্সী ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন-জাতীয় যোদ্ধাদিগকে সমরবিভাগে গুণানুসারে নিযুক্ত করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আকবর আপনার সেনাপতিবর্গকে বিজিত শত্রুর স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত অথবা দাসবিপণীতে

বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন, বহু অর্থাগমের পথস্বরূপ যাত্রিকর তুলিয়া দিলেন, হিন্দুর পক্ষে একান্ত ঘৃণ্য ও অপমানজনক জিজিয়া রহিত করিলেন, এবং গোহত্যাহ্রাসের জন্য সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি রাজপুত রাজন্যবৃন্দের সহিত দুশ্ছেদ্য পরিণয়বন্ধন সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে মোগল সাম্রাজের হিতাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিলেন। (১) ফলতঃ, আকবর বাহুবলে ও কৌশলে রাজ্যের পর রাজ্য বশীভূত করিয়া বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করিলেন।

---

(১) ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আকবরই হিন্দুরমণীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথমা হিন্দু পত্নী জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের কন্যা ছিলেন। আকবরের আর এক হিন্দু পত্নী ছিলেন, তিনি যোধপুরাধিপতির কন্যা। যোধপুরী বেগমের পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের পৌত্রিকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। মহাত্মা টড্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জয়পুরের রাজবংশ বিহারী মল্লের পৌত্রীর বিবাহের পূর্ব্বে মোগলের সঙ্গে বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কিন্তু আকবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা নিজাম উদ্দীন আহম্মদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল তাঁহার হস্তে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। আকবরের সর্ব্বসমেত আট ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। আমরা এখানে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

১ম। সুলতানা রাকিয়া বেগম।—ইনি মিরজা হিন্দালের কন্যা।

২য়। সুলতানা সালিমা বেগম।—ইহাঁর কবিত্বশক্তি ছিল। ইনি প্রথমতঃ বৈরাম খাঁর সহিত পরিণীতা হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর আকবর ইহাঁকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইনি বাবরের দৌহিত্রী।

৩য়। জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের কন্যা।

৪র্থ। আবদুলয়াসীর রূপবতী পত্নী।

৫ম। যোধপুরের মহারাজের কন্যা।

৬ষ্ঠ। বিবি দৌলদশাদ।

৭ম। আবদুল্লা মোগলের কন্যা।

৮ম। খান্দেশ প্রদেশের মবারক শাহের কন্যা।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহুসংখ্যক উপপত্নী ছিল। একবার নওরোজার সময় তিনি কামবিহ্বল হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ফলতঃ, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আকবর ইন্দ্রিয়দোষবর্জ্জিত হইতে পারেন নাই।

অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও আমাদের বংশের উপকারী বন্ধু রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। যদি তিনি ধর্ম্মার্থ মক্কায় তীর্থযাত্রা করিবার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদোচিত সম্মানসহকারে তথায় পঁহুছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে।” খানখানান উত্তর করিলেন, “আমার প্রতি পাদশাহের প্রীতি ও বিশ্বাসের অবশ্যই হ্রাস হইয়াছে। আমি আর কখনও পূর্ব্ববৎ রাজার প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন হইতে পারিব না। এ অবস্থায় কেন আমি রাজসকাশে অবস্থান করিব? রাজকৃপাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; ক্ষমাই আমার পূর্ব্বরাজসেবার যথোচিত পুরস্কার। দুর্ভাগ্য বৈরাম খাঁ ইহ-সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারত্রিক মঙ্গলের কামনায় নিরত ও মক্কার পথের পথিক হইবে।” অতঃপর বৈরাম সমুদ্রকূলাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পথিমধ্যে একজন আফগানের হস্তে নিহত হন। এই আফগানের পিতা খানখানানের হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিল। আকবর সিংহাসনারোহণের পঞ্চম বৎসরে স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক এক জন তরুণ যুবককে দিল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা দেখিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ মোগল রাজপুরুষগণ রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া আকবরকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ শের-বংশীয় শেষ নরপতি আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শেরশাহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। আকবরের নিয়োগক্রমে সেনাপতি জমান খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু জমান খাঁ তরুণবয়স্ক প্রভুকে তুচ্ছ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের রাজভাগ আত্মসাৎ করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইবার প্রয়াসী হইলেন। আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন জমান খাঁ অনন্যোপায় হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এই সময় আফগানগণ মালব দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন। আকবর মালব দেশ হইতে আফগানদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য সেনাপতি আদম খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। আদম খাঁ স্বকার্য্যসাধন করিয়া আকবরের বশ্যতাপাশ ছিন্ন করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইলেন। আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য নিজে মালব দেশে যাত্রা করিলেন। আদম খাঁ রাজসৈন্যের গতিরোধ করিতে না পারিয়া বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমালাভ করিলেন; কিন্তু পাদশাহের ক্ষমাগুণে অতি সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন বলিয়া আপনার চরিত্র সংশোধিত করিলেন না। তিনি ক্ষমালাভ করিবার পর রাজধানীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে উজীরের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। একদা উজীর পাদশাহের কক্ষপার্শ্বে উপাসনায় নিরত ছিলেন, এমন সময় আদম খাঁ অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। পাদশাহ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাসাদের উপর হইতে হত্যাকারীকে যমুনাগর্ভে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করেন। আদম খাঁর পর পাদশাহের অন্যতর শিক্ষক পীর মোহম্মদ মালবের শাসনভার প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার শাসনকালে তথায় নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং অচিরে শান্তিস্থাপনের অভিপ্রায়ে আকবর তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

ইহার পরেই নাগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। আবদুল মালি ও সেরফ উদ্দীন নামক দুই জন সামন্ত বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু অবিলম্বে আকবরের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাঁহারা কাবুলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পীর মোহাম্মদের পদচ্যুতির পর পাদশাহ উজবেগ-বংশোদ্ভব আবদুল্লা খাঁকে মালবের শাসনভার অর্পণ করেন। আবদুল্লা অত্যন্ত কোপন-

স্বভাব ছিলেন। তিনিও অনতিবিলম্বে আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইলেন। আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং পুনর্ব্বার মালব দেশে গমন করিলেন। আবদুল্লা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়া গুজরাট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনায় সমস্ত উজবেগ সৈন্য পাদশাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল; বিদ্রোহ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

পাদশাহ উজবেগ বিদ্রোহের পূর্ব্বে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী গড়মণ্ডল রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য সেনাপতি আসফ খাঁকে প্রেরণ করেন। তৎকালে রাণী দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের শাসয়িত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী তেজস্বিনী বীররমণী ছিলেন। আসফ খাঁ গড়মণ্ডল রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাণী বিপুলবিক্রমে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য প্রমাদ গণিল। এমন সময়ে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীরে দুর্গাবতীর এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তিনি সৈন্যপরিচালন করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। বীররমণীর আকস্মিক মৃত্যুতে আসফ খাঁ অতি সহজে গড়মণ্ডল অধিকার করিলেন। তিনি গড়মণ্ডল অধিকার করিয়া অপরিমিত অর্থ হস্তগত করিলেন। কথিত আছে, তিনি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ এক শত কলস প্রাপ্ত হন। আসফ খাঁ এই ধনরাশির অধিকাংশ আত্মসাৎ করাতে পাদশাহের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। উজবেগগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে আসফ খাঁ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আকবরকে ঘোর বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিলেন। আকবরের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল। উজবেগগণ ক্রমশঃ দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আকবর বিপুলবিক্রমে বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই বৎসর চেষ্টার পর বিদ্রোহ প্রায় উপশমিত হইয়া আসিয়াছিল; এমন সময় পাদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করাতে

তিনি বিদ্রোহ-দমন পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন। হাকিমকে দমন করিয়া পাদশাহ কতিপয় মাস পরে দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, বিদ্রোহী দল পুনর্ব্বার বলসংগ্রহ করিয়া এলাহাবাদ ও অযোধ্যা প্রদেশের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে, এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন বর্ষাকাল। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত সময় নহে। কিন্তু পাদশাহ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহী দল বিতাড়িত হইয়া গঙ্গার অপর তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বর্ষায় গঙ্গা স্ফীত হইয়াছিল; এ জন্য বিদ্রোহী সৈন্য তথায় আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিল। কিন্তু গঙ্গার প্রবল প্লাবনও পাদশাহের গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি নিশীথে দুই সহস্র অপেক্ষাও ন্যূন সৈন্য লইয়া সন্তরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই আকস্মিক অক্রমণে বিদ্রোহী সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। সাত বৎসর অশ্রান্ত যুদ্ধের পর পঞ্চবিংশ-বর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক আকবর সমস্ত বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিলেন। তিনি এই বিদ্রোহদমনে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বীরসমাজের বরেণ্য হইলেন, এবং মেঘ-নির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আপনার রশ্মিজালে সমগ্র প্রাচ্য গগন উদ্ভাসিত করিলেন।

আকবর বৈরাম খাঁর অধীনে পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করিয়া এবং সাত বৎসরকাল দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষগণের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত থাকিয়া, ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্বের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করিলেন, এই বার দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল।

পাদশাহ সমগ্র ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ ও রাজন্যবৃন্দকে প্রীতির

আকবর পররাজ্যবিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। রাজপুত জাতির বাসভূমি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সাধারণ নাম রাজপুতানা, অথবা রাজওয়ারা। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশ, পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড, উত্তরে জঙ্গল দেশ নামক বালুকাভূমি, এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত।

জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল প্রথমেই আকবরের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার কন্যা সমর্পণ করেন। আকবর রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে যোধপুর (মাড়োয়ার) রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। তথাকার রাজা কিছু দিন যুদ্ধ করিয়া দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন। পাদশাহ তদীয় কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া রাজান্তঃপুরে স্থান প্রদান করেন। যোধপুরী বেগমের এক ভগিনী বিকানীরের অধিপতি রায়সিংহের পত্নী ছিলেন। সুতরাং রায়সিংহও এই সূত্রে পাদশাহের সহিত সম্মিলিত হন। এই ভাবে কোথাও বা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া, কোথাও বা সৌহৃদ্যসংস্থাপন করিয়া, পাদশহ সমগ্র রাজপুতানায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। একমাত্র মিবারাধিপতি রাণা ও তাঁহার অনুগত কতিপয় ক্ষুদ্র সামন্ত আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। আকবর ইহাঁদিগকে বশীভূত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমাগত দশ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ও বিপুল অর্থব্যয়েও মিবার-বিজয় সম্পন্ন করিতে না পারিয়া আকবর আপনার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আকবর রাঁজপুতানাবিজয় করিয়া, এবং উদারতা ও সমদর্শিতা গুণে প্রধান প্রধান হিন্দু রাজার সঙ্গে সদ্ভাবসংস্থাপন করিয়া, প্রধানতঃ হিন্দুর বাহুবল নিয়োগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের খণ্ডখণ্ড মোসলমান রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। পাদশাহী সৈন্যের ক্ষিপ্রকারিতায়

ও রণচাতুর্য্যে গুজরাটরাজ্যে, বিহার প্রদেশে, বঙ্গভূমিতে ও উড়িষ্যা দেশে অল্পকালের মধ্যেই মোগল-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি উড়িষ্যা-বিজয় সম্পন্ন করেন।

এই সময় আকবরের গৌরবরবির মধ্যাহ্নকাল। বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিবার সময় পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, আজমীর, গোয়া-লিয়ার এবং অযোধ্যায় আকবরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় এক দিকে নর্ম্মদা নদীর তটবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অক্সাস-নদী-বিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্ত, এবং অন্য দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের নরনারী তাঁহাকে সম্রাটরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ক্ষমতায়, বৈভবে, প্রতাপে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজনীতিবিশারদ তোড়রমল্ল রাজস্ব-মন্ত্রীর পদে, বীরশ্রেষ্ঠ মিরজা আব্দুর রহিম প্রধান সেনাপতির পদে, এবং মহামহোপাধ্যায় ফৈজি ও আবুল ফজল প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আকবর বাহুবলে ও সৌহৃদ্যসূত্রে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভুত্ব লাভ করিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র রাজশক্তিমূলক শ্রেষ্ঠতালাভ করি-য়াই উচ্চাকাঙ্ক্ষ সম্রাটের পরিতৃপ্তি হইল না; তিনি মানবের মানসিক রাজ্যেও আধিপত্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তিনি তরবারিহস্তে জনসাধারণকে আপনার মতাবলম্বী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন না। বস্তুতঃ, সম্রাটের আত্মীয় বন্ধুগণও মতস্বাতন্ত্র্যের জন্য কখনও তাঁহার বিরাগভাজন হন নাই। কি ভাবে মানবের পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহার জ্ঞাননয়নে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি নিজে ধর্ম্ম বিষয়ে যে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে-ছিলেন, তাহা প্রকৃতিপুঞ্জকে প্রদান করিবার মানস করিলেন। এবং

তদ্রূপ স্বাধীনতাকেই সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃষ্ট ভিত্তি বলিয়া স্থির করিলেন। আকবর ভারতবর্ষে আপন প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের হিতকল্পে বিবিধ সুবিধানের প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহার সুবিধান সকল তাদৃশ কার্য্যকর হইতে পারিয়াছিল না। এই সময় মৌলানাগণের প্রভূত ক্ষমতা ছিল; দেশের শিক্ষাকার্য্য তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। মৌলানাগণই বিচার-পতি নিযুক্ত হইতেন। রাজদরবারে তাঁহাদের প্রতিপত্তির সীমা ছিল না; এমন কি অনেক সময় কোরাণও তাঁহাদের মতের নিকট প্রতি-হত হইয়া পড়িত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মোসলমানই সুন্নি মতাব-লম্বী। আকবরের সময়ে সুন্নিরা এই সকল মৌলানার অঙ্গুলি সঙ্কে-তেই পরিচালিত হইত। মৌলানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। তাঁহারা গোঁড়ামি বশতঃ হিন্দু ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী মোসলমান-দিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। এই সকল কারণে উদারনীতি-মূলক বিধান সমূহ প্রবর্ত্তিত করিয়া তৎসমুদয়কে কার্য্যকর করিবার সময় নানাবিধ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়; এবং তজ্জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর স্পষ্ট অনুভব করেন যে, উদার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শাসনকার্য্য অভীষ্টানুরূপ পরিশুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে না।

আকবর উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আক-বরের স্বভাব উদার ছিল, এবং মহামতি আব্দুল লতিফও তাঁহাকে উদার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আজন্ম মোসলমান সমাজে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া জীবনের প্রথম ভাগেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, তাঁহার স্বাভাবিক উদারভাব ও উদার শিক্ষা সত্ত্বেও তদীয় ধর্ম্মবিশ্বাস কতক পরিমাণে মোসলমান সমাজের অনুগত রূপেই গঠিত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগে কোরাণ-অনুগত ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি তীর্থস্থান দর্শন ও মোসলমান মহা-পুরুষগণের সাক্ষাৎলাভের অনুরাগী ছিলেন। এমন কি, তিনি এসলাম-শাস্ত্রবিরুদ্ধ উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বেও মক্কা গমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য আন্তরিক অভিলাষী ছিলেন। আকবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা শেখ নরুলহক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পাদশাহ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজধানীতেই থাকুন, কি শিবিরেই অবস্থান করুন, প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়িতেন, এবং রাজকীয় কোরাণ-পাঠকগণ উপাসনাকালে ও অন্যান্য সময়ে কোরাণ আবৃত্তি করিতেন। উপাসনাকালে পাদশাহ স্বয়ং সকল বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী থাকিতেন।

আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ কি? সাম্রাজ্যের হিত-কামনায় তিনি অসঙ্কোচে পরধর্ম্মাবলম্বী রাজপুরুষগণের সঙ্গে মিলিত হইতেন, এবং এইরূপ অবাধ-মিলনের ফলে তাঁহাদের গুণরাজি সুস্পষ্ট-ভাবে উদারস্বভাব পাদশাহের নিকট প্রকাশিত হইছিল। তিনি তাঁহা-দের গুণরাজিদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমরা শেখ নুরুলহকের গ্রন্থ হইতে সে বিবরণের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

"আকবরের রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতাবলম্বীর, এবং সকল জাতির, খোরসান, ইরাক, মাওরাওন্নাহার ও হিন্দুস্থানের বিদ্বজ্জনের, শাস্ত্রবেত্তা ও ধর্ম্মবিদের, সিয়া ও সুন্নির, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও খৃষ্টানের, ব্রাহ্মণের ও প্রত্যেক প্রচলিত ধর্ম্মের প্রচারকের আকর্ষণকেন্দ্র ছিল। পাদশাহের কথোপকথনস্পৃহা ও সৌজন্যের খ্যাতি, তদুপরি তাঁহার রাজমর্য্যাদা ও ক্ষমতার কথা, এমন কি, তাঁহার দীনভাব ও শ্রেষ্ঠতার

বিষয় পরিশ্রুত হওয়াতে ইহারা দলে দলে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হন, এবং ইতিহাস ও ভ্রমণের বর্ণনা ও প্রত্যাদেশ, Prophecy ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় আপনাদিগকে নিরত করিয়া সর্ব্বদা বাগ্‌বিতণ্ডায় কালযাপন করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ তার্কিকদের যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ অন্যকে স্বমতাবলম্বী করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। পাদশাহ এই প্রথম অন্যান্য জাতির ইতিহাস, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মমতের বিষয় শ্রবণ করিয়া উহাদের অভিনবত্ব দেখিয়া বিস্মিত হন। তিনি কেবল সত্যসিদ্ধান্তের জন্যই উদগ্রীব ছিলেন বলিয়া, যে সকল পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত হইত, তাহা হইতে সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া সার গ্রহণ করিতেন। তিনি রাজকর্ম্মচারী, শাস্ত্রবেত্তা ও সামন্তগণের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে বলিতেন, "হে জ্ঞানী মোল্লাগণ, সত্যনির্দ্ধারণ ও প্রকৃত ধর্ম্মমত লাভ করিয়া প্রচার করা এবং ধর্ম্মের ঈশ্বরাদিষ্ট মূল অনুসন্ধানে বাহির করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব মনুষ্যোচিত দুর্ব্বলতার বশীভূত হইয়া সত্যগোপন ও ঈশ্বরাদেশের বিরোধী কোন মতপ্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইও না। যদি তোমরা তদ্রূপ কর, তাহা হইলে তোমরা অধর্ম্মাচরণের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবে।" * * * পূর্ব্বোক্ত অভিমত পরিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে মৌলানা আবদুলা সুলতান পুরি ও শেখ আবদুল নবি অবিরত রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন, এবং পাদশাহের নিকট বহু অনুগ্রহলাভ করিতেন। এই দুই জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এসলাম ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মতদাতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করিতেন, এবং স্ব স্ব বক্তব্য উত্তেজনা ও পরিবাদসহকারে প্রকাশ করিতেন। অবশেষে পাদশাহের নিকট তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং

তাঁহারা যে ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তৎসম্বন্ধে পাদশাহের ঔদাসীন্য জন্মে।"

আমরা বদায়ূনির গ্রন্থ হইতেও কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

"পাথরের উপর যেমন ক্রমে ক্রমে রেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পাদশাহের হৃদয়েও এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে, সকল ধর্ম্মেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এবং সকল জাতিতেই সুধীর বিবেচক ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী মনুষ্য রহিয়াছেন। যদি প্রকৃত জ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে সর্ব্বত্রই লাভ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে এক ধর্ম্মেই, অথবা এসলাম ধর্ম্মের ন্যায় একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনধিকসহস্রবর্ষবয়স্ক ধর্ম্মেই সত্য আবদ্ধ থাকিবে কেন? এক সম্প্রদায় যাহা অস্বীকার করে, অন্য সম্প্রদায় কেন তাহা দৃঢ়তাসহকারে যথার্থ বলিয়া প্রচার করিবে, এবং কোন এক সম্প্রদায়কে উৎকর্ষ প্রদত্ত না হইয়া থাকিলেও সে সম্প্রদায় কেন শ্রেষ্ঠতার দাবি করিবে?

"বিশেষতঃ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা পাদশাহের সঙ্গে নির্জ্জন সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিতেন। তাঁহারা নৈতিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বিষয়ে অন্যান্য বিদ্বজ্জনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং পারলৌকিক জ্ঞান, পারমার্থিক ক্ষমতা ও মানবীয় পূর্ণতার উচ্চাদর্শ লাভ করিয়াছিলেন; এ জন্য তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মের সত্য ও পরধর্ম্মের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ জ্ঞান ও প্রমাণমূলক যুক্তি উপস্থিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মমত এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতেন, এবং যে সব বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ, তাহাও এরূপ সুকৌশলে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন যে, কেহই সন্দেহপ্রকাশ করিয়া (এমন কি, পর্ব্বত ধূলিসাৎ হইয়া গেলেও এবং আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও,) পাদশাহকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত না।

"এ জন্য পাদশাহ resurrection, day of judgment ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ, এসলাম ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ ও আমাদের পয়গম্বরের জনশ্রুতির অনুগত যাবতীয় ব্যবস্থা বর্জ্জন করেন।"

এই ভাবে যে সময় তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইতেছিল, তখন তিনি সাম্রাজ্যের শাসনসংরক্ষণের জন্য অভিনব পন্থার উদ্ভাবনে নিযুক্ত ছিলেন। শাসনসংস্কার কার্য্যে সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমতাবলম্বী রাজপুরুষগণ তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করাতে তিনি আপনার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়া উদারধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও নূতন ধর্ম্মের প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অগাধধীসম্পন্ন আবুল ফজল তাঁহার সহায় হইলেন।

রাজত্বের একবিংশতিতম বর্ষে (১৫৭৬ খৃঃ) গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। আকবর রাজমুদ্রায় প্রচলিত কল্‌মা পরিত্যাগ করিয়া আপনার নাম-সংবলিত বচন অঙ্কিত করিবার আদেশ দিলেন। তিনি রাজমুদ্রায় "আল্লাহু আকবর" বচন অঙ্কিত করা যাইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাসু হইলেন। অধিকাংশ ব্যক্তিই এই পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করিলেন। কেবল হাজি এব্রাহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, উহার দুই প্রকার (১) অর্থ হইতে পারে, সুতরাং কোরাণের "নাজিকর আল্লাহি আকবর" নামক একার্থমূলক (২) শ্লোকাংশ গ্রহণ করাই সঙ্গত। এব্রাহিমের যুক্তি পাদশাহের মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন, "মনুষ্যের অক্ষমতা এত দূর জাজ্বল্যমান যে, কেহই ঈশ্বরত্বের দাবি করিতে পারে না। অতএব 'আল্লাহু আকবর' বচন মুদ্রায় অঙ্কিত করিলে দূষণীয় হইবে না।"

---

(১) ঈশ্বর মহান্, অথবা আকবর ঈশ্বর।
(২) ঈশ্বরের বিষয় ধ্যান করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টার ব্লকম্যান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "আল্লাহু আকবর" বচনের দুই অর্থ হইতে পারে বলিয়াই পাদশাহ উহা রাজমুদ্রায় অঙ্কিত করিবার আদেশ দেন। "আকবর ঈশ্বর," এই অর্থবোধক মুদ্রালিপি মোসলমান-সমাজে সহিয়া গেলে তিনি আবুল ফজলের সাহায্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আবুল ফজল প্রস্তাব করিলেন যে, রাজা পরমার্থিক বিষয়েও প্রকৃতিপুঞ্জের অধিনেতা। কোরাণের অনুশাসন মানবীয় ব্যবস্থা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইতে পারে না, ইহাই এসলাম ধর্ম্মের মূলমত। আবুল ফজলের প্রস্তাব উহার মূলোচ্ছেদক হইল। মোসলমান শাস্ত্রবেত্তৃগণ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। একদিকে আবুল ফজলের মত প্রত্যাখ্যান করিলে পাদশাহ আপনাকে অসম্মানিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, অপর দিকে উহা গ্রহণ করিলে এসলাম ধর্ম্মের ভিত্তিতে সাংঘাতিক আঘাত করা হইবে। অবশেষে রাজসম্মান রক্ষা করাই তাঁহাদের স্পৃহনীয় হইল। মখদুম উল-মল্ক, শেখ আবুল নবি, কাজি জালাল উদ্দীন মুলতানি, শেখ মবারক ও গাজি খাঁ বদক্ষি ন্যায়পরায়ণ রাজাকেই পারমাথিক বিষয়েরও অধিনেতা বলিয়া আপন আপন নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। আমরা সেই ঘোষণাপত্রের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

"আমরা একমতাবলম্বী হইয়া মীমাংসা করিতেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মুজতাহিদগণের পদ অপেক্ষা একজন সুলতান-ই-আদিলের (ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের) পদ শ্রেষ্ঠ। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এসলামের সুলতান, মনুষ্য জাতির আশ্রয়স্থল, বিশ্বাসিগণের নেতা ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া আবুল ফতে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ আকবর পাদশাহ গাজি (ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন) একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও ঈশ্বরভীরু রাজা। অতএব মুজতাহিদ-

গণের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে যদি পাদশাহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারণায় ও অভ্রান্ত বিচারে কোন এক পথ অবলম্বন করেন, এবং মানব-জাতির মঙ্গলবিধান ও পৃথিবীর উপযুক্ত পরিচালনার নিমিত্ত নিজের মীমাংসা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই মীমাংসা সমস্ত জাতির ও আমাদের গ্রহণীয় বলিয়া আমরা এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, পাদশাহ স্বীয় অভ্রান্ত বিচারে যদি কোরা-ণের অবিরোধী ও জাতির মঙ্গলবিধায়ক কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য গ্রহণীয় ও পালনীয়। এই আদেশের প্রতিকূলাচরণ পরলোকে অনন্ত নরক বিধান করিবে, এবং ইহলোকে ধর্ম্ম ও উন্নতির ক্ষতিকারক হইবে। ঈশ্বরের গৌরব ও এস-লাম ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য সাধু উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাপত্র লিখিত ও হিজিরা ৯৮৭ অব্দের রজব মাসে প্রধান প্রধান উল্‌মা ও শাস্ত্রজ্ঞ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।”

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে পাদশাহের ধর্ম্মসংস্কারের পথ পরিষ্কৃত হইল, এবং ইমামের মীমাংসাই গরীয়সী বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। এক্ষণে পাদশাহ প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম্ম-বিধানের প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

৯৮৮ (খৃঃ ১৫৮০) হিজিরীর জমাল আউল মাসের প্রথমতারিখে ফতেপুরের জুমা মসজিদে আকবর প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম্ম-বিধানের প্রচার করিলেন। পাদশাহ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের জন্য ফৈজীর রচিত নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার পর মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

“The Lord to me the kingdom gave,
He made me wise, and strong, and brave,

He girdeth me in right and truth,
Filling my mind with love of truth.
No praise man can sum His state.
Allahu Akbar !—God is great."

আকবর অভিনব ধর্ম্মমতের নাম তৌহিদ-ই-ইলাহি রাখিয়াছিলেন।

আকবর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের মূলসূত্রগুলি কি ? এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া ও আকবরবিদ্বেষী বদায়ুনি নূতন ধর্ম্মের বহু নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহা তাঁহার (পাদশাহের) হৃদয়দর্পণের প্রতিবিম্বস্বরূপ। প্রত্যেক ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াই আকবর আপনার অভিনব ধর্ম্মবিধানের প্রচার করেন। তৌহিদ-ই-ইলাহির গঠনের হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্ম সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। বীরবল সিংহ সূর্য্যের অপার মহিমা সম্বন্ধে আকবরের প্রতীতি জন্মাইয়াছিলেন; অগ্নিউপাসকগণও গুজরাট হইতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনাদের ধর্ম্মমত সত্যমূলক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন। (১) বস্তুতঃ, আকবর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাবতীয় ধর্ম্মের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। (২) ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং আকবর তাঁহার প্রতিনিধি; ইহাই নবধর্ম্মের প্রথম সূত্র। (৩) নিরাকার ঈশ্বরকে জাগরণে বা স্বপ্নে দর্শন করা যায় না, কিন্তু উপা-

---

(১) প্রথম হইতেই আকবর হিন্দুমহীষিগণের মনোরঞ্জনার্থ রাজান্তঃপুরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, রাজত্বের পঞ্চবিংশতিতম বর্ষে সূর্য্য ও অগ্নির সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে ভূলুণ্ঠিত হন, এবং সন্ধ্যাকালে দীপমালা প্রজ্বলিত হইলে, রাজাজ্ঞায় সমস্ত সভাসদ সম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নির সম্বর্দ্ধনা করেন। এই বর্ষেই পাদশাহ একদিন ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ও গলদেশে স্বর্ণোপবীত ধারণ করিয়া রাজসভায় আগমন করেন।

(২) আচার্য্য ম্যাক্সমুলার আকবরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Akbar the first student of Comparative religion."

(৩) আকবরের ঈশ্বর ধারণা কিরূপ মহোচ্চ ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য

সকের বিবেক সমুজ্জ্বল হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে, তাদৃশ স্বরূপই ধ্যেয়। যাহার হৃদয় সকল বিষয় হইতে মুক্ত, তিনি অনুপম ঈশ্বর প্রেমের পন্থানুসরণ করিয়াছেন। দুষ্প্রবৃত্তির দমন ও লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই পারত্রিক শ্রেয়ঃলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

ভ্রম ও পাপ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবজ বলিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টার মতানুসারে অন্ধ ভাবে কোন প্রকার ক্রিয়া কলাপের সম্পাদন নিষিদ্ধ ছিল। আকবর আপনার ধর্ম্মবিধান হইতে পৌরহিত্যের প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পৌরহিত্যের প্রথা তুলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি মনুষ্যকে শাস্ত্রের অনুশাসন হইতেও মুক্ত করিয়া একমাত্র জ্ঞান ও বিবেকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। তিনি বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি বলিতেন, "কতক সরলচিত্ত পরানুবর্ত্তী লোক প্রাচীন কাহিনী সকলকে জ্ঞান-নির্দ্দেশিত বলিয়া স্বীকার করে ও চিরক্ষতিগ্রস্ত হয়" (ধর্ম্মতত্ত্ব)। মনুষ্য উজ্জ্বল বিবেকানুসারে শ্রেষ্ঠতালাভ করে, সুতরাং বিবেক পরিমার্জ্জিত করিয়া তদনুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করাই আবশ্যক। কিন্তু মনুষ্য যাহাতে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অন্যের অনিষ্টোৎপাদন করিতে না পারে, তজ্জন্য নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল।

আমরা আবুলফজল কর্ত্তৃক প্রচারিত তাঁহার দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ১। প্রত্যেক ব্যক্তি অনুপম ঈশ্বরকে নিজের নিজের ভাবনানুসারে এক এক নামে সম্বোধন করিয়া থাকে, অন্যথা অনির্দ্দেশ্যের নাম কোথা? ২। সন্দেহ নিরাকরণের জন্য নামকরণ, প্রকৃতপক্ষে পবিত্র স্বরূপে তাহার যোগ হয় না। আকবরের ঈশ্বর বিশ্বাস সুগভীর ও সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে একবার দেশ মধ্যে দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হওয়াতে হাহাকার উঠে। আবুল ফজল তাঁহাকে বৃষ্টির কামনা করিয়া ঈশ্বরোপসনা করিতে বলেন। তিনি উত্তর করেন, "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং আমাদের নিজেদের অপেক্ষাও আমাদের হিতৈষী, সুতরাং আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮১২ শক)

দুর্ব্বলচিত্ত উপাসকের চিত্তবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদনের জন্য কোন অবলম্বনের আবশ্যক হইলে অগ্নি অথবা সূর্য্যকে প্রতিরূপ রূপে গ্রহণ করিবার বিধান ছিল; আকবর ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এজন্যই এ প্রকার ব্যবস্থা করা হয়। (১)

পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে আকবরের বিশ্বাস অনেকাংশে বৌদ্ধ শাস্ত্রানুযায়ী ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, জীবাত্মা মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ করে এবং ইহকালের শুভাশুভ কর্ম্মের অনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ যোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে পূর্ণশুদ্ধি লাভ করিয়া ঈশ্বরে বিলীন হয়, ইহাই স্বর্গসুখভোগ, এতদ্ব্যতীত পরলোকে পুণ্যের অন্য কোন প্রকার পুরস্কার নাই।

এসলাম ধর্ম্মানুগত উপাসনা প্রণালী সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রার্থনাংশ পারসীক ধর্ম্মের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল, এবং অনুষ্ঠানাংশ হিন্দু পদ্ধতির অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সামাজিক উপাসনার কোনরূপ বিধান ছিল না। আকবর নিশাযোগে বিচিত্র আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া একাকী ঈশ্বরোপাসনা করিতেন।

অতিরিক্ত উপাসনা, উপবাস ও দান অনেক সময় কপটাচরণের

---

(১) আকবর সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। এ সম্বন্ধে কাউন্ট লোয়ের যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহা বিবি বেভারিজের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Akbar never identified his deity with the sun, but the universal focus of light and warmth served as the purest symbol for his conceptions ; he chose the sun as his emblem, because he believed all existence to be but the effluence of the God head. Not knowing or not comprehending this inner meaning, the populace held that he worshipped the Sun."

প্রতিপোষক হইয়া থাকে, এজন্য তৎসম্বন্ধে সকলকে নিরুৎসাহ করা হইত; কিন্তু তাহাদের আচরণ নিষিদ্ধ ছিল না। আকবরের মতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বাহ্যিক উপাসনার আবশ্যক। প্রকৃত উপাসনা অন্তরের বস্তু; বাহ্যাড়ম্বরের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

নূতন ধর্ম্মে খাদ্যাখাদ্যের কোন প্রকার বিচার ছিল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিবৃত্তি মার্গের অনুসরণই চিত্তশুদ্ধির অন্যতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। মাংস আকবরের প্রিয় খাদ্য ছিল না। তিনি অনেক সময় একাদিক্রমে বহুদিন পর্য্যন্ত মাংস আহার করিতেন না। তিনি ফলমূল আহার করিয়াই অপরিসীম তৃপ্তিঅনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন যে, ফল সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান।

নূতন ধর্ম্মবিধান যেন সকল সম্প্রদায়েরই হিতসাধন করে, এবং যেন কাহারও পীড়নের হেতু না হয়, তদুদ্দেশ্যেই আকবর সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাদশাহ সহমরণ নিবারণ জন্য যত্ন করেন, ঘনিষ্ট স্বগণের পরিবর্ত্তে দূরতর সম্পর্কে বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যোগ করেন, বিধবা বিবাহের বিধি প্রচার করেন, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, বহু বিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করেন, এবং ধর্ম্মার্থ পশুহত্যার দোষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে রাজার অভিলাষ মত কার্য্য করিবার জন্য বলপ্রয়োগ না করিয়া তিনি দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জকে নববিধির অনুরাগী করিতে যত্ন করিতেন। আমরা এই প্রসঙ্গে আকবরের নিজের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—"পূর্ব্বে অনেক লোককে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছি, এবং ইহাকে মোসলমানী বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম, যখন

জ্ঞানের উদয় হইল, তখন লজ্জিত হইলাম। * * * যেজন বলপ্রকাশ করে, সে কবে ধার্ম্মিকের নাম গ্রহণ করিতে পারে ?" (১)

আকবর এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া বিচারকদিগকে পদচ্যুত করিয়া বিচার্য্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং হিন্দুর দায়াধিকার সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

সাম্য মন্ত্রের উপাসক আকবর উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও সামাজিক সুব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না; তিনি মোসলমানদিগকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়াও তাহাদিগকে উদার ও সমদর্শী করিবার জন্য যত্নশীল হয়েন। ফলতঃ, তাঁহার যত্ন ও উৎসাহে মোসলমান পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। (২)

---

(১) ধর্ম্মতত্ত্ব।

(২) আকবরের সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; এজন্য অনেকের বিশ্বাস যে, মোসলমানকুলে ফৈজিই সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃতের অনুশীলনে নিরত হইয়াছিলেন, এবং আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে মোসলমান পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃত ভাষার প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল না, এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। আকবরের বহুপূর্ব্বে মোসলমান সমাজে পঞ্চতন্ত্রের আরবী অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন কোন পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে এই পুস্তক মূলগ্রন্থ অবলম্বনে অনুবাদিত হয় নাই। পঞ্চতন্ত্র ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ অন্যান্য গ্রন্থেরও আরবী অনুবাদ প্রচলিত ছিল। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বোগ্দাদ প্রবাসী হিন্দুগণই এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রচারিত হইবার অল্প পরেই যে, মোসলমান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা অন্যরূপেও প্রমাণ করা যাইতে পারে। খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালে মোহাম্মদ বিনমুসা বীজগণিত এবং মিকা ও ইবনদহন চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থত্রয় রচিত হইবার সময়ে সংস্কৃত ভাষা যে মোসলমান সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা পাঠকালে স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই গ্রন্থত্রয় রচিত হইবার পূর্ব্বে চরক ও সুশ্রুত নামক চিকিৎসা বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। মোসলমানগণ প্রথম হইতেই চিকিৎসাবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদের

তৎকালের সংস্কৃতজ্ঞ মোসলমান পণ্ডিতগণ মধ্যে আকবরের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পরিষদ ফৈজী, নকিব খাঁ মোল্লা মোহাম্মদ, মোল্লা সাবরি, সুলতান হাজি, হাজি এব্রাহিম এবং বদায়ূনি প্রধান ছিলেন। এই পণ্ডিত-সমাজের পরিশ্রমের ফলে যে সকল অনুবাদগ্রন্থ প্রচারিত হয়, তন্মধ্যে

একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, হারুন-উল-রসিদের দরবারে দুইজন হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের দুর্গ-প্রাকারে মোসলমানের বিজয়নিশান উত্থিত হইতে না হইতেই মহামহোপাধ্যায় আল বারুণী হিন্দুর ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে সযত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং কঠোর পরিশ্রমে অচিরে সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যলাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এতদূর পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল যে, তিনি সংস্কৃত হইতে পারসীতে ও পারসী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে পারিতেন। সুলতান ফিরোজ শাহ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নগর-কোট অবরোধ করেন। এই সময় তাঁহার হস্তে তত্রত্য প্রকাণ্ড পুস্তকালয় পতিত হইয়াছিল। তিনি এই পুস্তকালয় হইতে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক একখানি ও সামুদ্রিক শাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মৌলানা ইজ্জদ্দীন খলিদা খানিকে অনুবাদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। খলিদা খানি অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরীর নবাব জালালদ্দৌলার পুস্তকালয়ে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের পারসী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ গ্রন্থও সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে অনুবাদিত হইয়াছিল। এই সময় ভারতবর্ষের মোসলমান সমাজে হিন্দুর ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচিত হইত। লক্ষ্ণৌর রাজকীয় পুস্তকালয়ে গো-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি পারসীগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; ইহা সংস্কৃতের অনুবাদ। গিয়াস উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের আদেশে এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। এই দুর্ল্লভ গ্রন্থখণ্ড ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে অনুবাদিত হইয়াছিল। সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা সুশ্রুতের শিক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অনুবাদের ভূমিকাপাঠে আমরা অবগত হই যে, অপ-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের নিকট শিক্ষালাভের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই এ গ্রন্থ হিন্দুর রূঢ় ভাষা হইতে সুকোমল পারসীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্য ঠিক কোন্ সময়ে সমাধা হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ ঠিক ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন নামধারী কোন মোসল-মান অধিপতি ভারতবর্ষের কোন স্থানে আধিপত্য করেন নাই। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন তোগলক নামক একজন নরপতি দিল্লীর রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন নামক আর একজন নরপতি মালবদেশে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। গিয়াস উদ্দীন নামে বঙ্গদেশেও দুইজন শাসনপতি ছিলেন। একজনের

কোন কোন পুস্তক হিন্দীর অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তৎকালের মোসলমান পণ্ডিতগণ কোন্ অর্থে হিন্দীশব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

ইতিহাস-লেখক নিজাম উদ্দীন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আব্দুল কাদের বদায়ূনি কর্ত্তৃক কতিপয় হিন্দীগ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। বদায়ূনি রামায়ণ ও সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি নামক গ্রন্থদ্বয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থানুবাদ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম। কান্যকুব্জে অবস্থানকালে পাদশাহ মালব দেশের অধিপতি বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক গল্পবিশিষ্ট সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি নামক একখানি গ্রন্থ তাঁহাকে গদ্যে-পদ্যে অনুবাদ করিবার জন্য আদেশ করেন। এই গ্রন্থ তুতিনামার অনুরূপ। তিনি অগৌণে কার্য্য আরম্ভ করিতে এবং প্রথম দিনেই অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠা সমাপ্ত করিতে আদিষ্ট হন। একজন সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ দুরূহস্থলের অর্থব্যাখ্যা করিবার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। বদায়ূনি প্রথম দিনেই প্রথম গল্পের উপক্রমণিকাংশের অনুবাদ শেষ করিয়া পাদশাহের সমীপে উপস্থিত করিলে তিনি তাঁহার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত হইলে অনুবাদকর্ত্তা উহার নাম খিরদ আফ্জা রাখিয়াছিলেন। এই নাম হইতে অনুবাদের তারিখ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পাদশাহ অনু-

---

রাজত্ব ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ও অপরজনের রাজত্ব ১৩৬৭ হইতে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাহা হউক, আকবরের সময়ের পূর্ব্বেই যে গ্রন্থের অনুবাদ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিলাম, তদ্দারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মহা মহোপাধ্যায় ফৈজিই সংস্কৃতজ্ঞ প্রথম মোসলমান নহেন। তবে আকবরের রাজত্বকালেই মোসলমান পণ্ডিতসমাজে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রসার অভূতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রহ পুরঃসর এই অনুবাদ গ্রহণ করিয়া রাজকীয় পুস্তকালয়ে স্থানপ্রদান করেন। ইহার পর তিনি তাঁহাকে রামায়ণের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। বদায়ূনির মতে এ কাব্য মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চবিংশ সহস্র, ও প্রত্যেক শ্লোকের অক্ষরসংখ্যা ৬৫; অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র এই কাব্যের নায়ক; হিন্দুজাতি তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। চারি বৎসরের পরিশ্রমে বদায়ূনি রামায়ণের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তিনি এই পুস্তক পাদশাহের নিকট উপস্থিত করিলে উহা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। রচনা ও বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, বদায়ূনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অবলম্বনেই অনুবাদের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

আকবরের আদেশে মহাভারত পারসীতে অনুবাদিত হইয়াছিল। এ অনুবাদকার্য্যও যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনেই সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুবাদকার্য্যে বহু পণ্ডিতের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল। বদায়ূনি লিখিয়া গিয়াছিল যে, ৯৯০ হিজিরী অব্দে পাদশাহ কতিপয় হিন্দু পণ্ডিতকে একত্র করিয়া মহাভারতের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করেন; তার পর তিনি নিজে কয়েক রাত্রি পর্য্যন্ত নকিব খাঁর নিকট উহার তাৎপর্য্য বিবৃত করেন; পারসীতে মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নকিব খাঁ আদিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কার্য্য সহজসাধ্য করিবার জন্যই পাদশাহ নিজে মহাভারতের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিতে তিনি বদায়ূনিকে আহ্বান করিয়া নকিব খাঁর সহযোগে মহাভারতের অনুবাদ সমাধা করিতে আদেশ করেন। মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। তিনি তিন চারি মাসের পরিশ্রমে দুই পর্ব্বের অনুবাদ শেষ করেন। মহাভারতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবার সময়

পেঁয়াজ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঈদৃশ গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া বদায়ূনি আপন অদৃষ্টের বহু নিন্দা করিয়াছেন। ইহার পর মোল্যাশি ও নকিব খাঁ একযোগে কিয়দংশের অনুবাদ করেন। তাহার পর সুলতান হাজি থানেশ্বরী একাকী এক পর্ব্বের অনুবাদ করেন। অতঃপর শেখ ফৈজী পূর্ব্বকৃত প্রাথমিক অনুবাদ পারিপাট্যপূর্ণ গদ্য-পদ্যে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার হস্তে দুই পর্ব্বের অধিক সমাপ্ত হইতে পারে নাই। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত হাজি অনুবাদের অবশিষ্টাংশের ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া পুনরনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন। বদায়ূনি মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, "যে সকল পণ্ডিতের সহায়তায় এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই কৌরব পাণ্ডবের সহবাসী হইয়াছেন। এক্ষণ যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারা যেন ঈশ্বরের করুণায় পরিত্রাণলাভ করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের অনুতাপ যেন গৃহীত হয়। মহাভারতের অনুবাদের নাম রাজনামা। অনুবাদগ্রন্থ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত হইলে আমীর ওমরাহবর্গ এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী আবুল ফজল দুই পাত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বর আমাদিগকে নাস্তিকতা ও অবাস্তবতার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।" বদায়ূনি আর এক স্থানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, পাদশাহ তাঁহাকে অথর্ব্ব বেদ পারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষা কঠিন ও অর্থ দুর্ব্বোধ জন্য তিনি রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হন; তার পর হাজি এব্রাহিম সিরহিন্দী এই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উহা সুচারুরূপে সম্পাদন

করেন। ফলতঃ আকবর পাদশাহের রাজত্বকালে মোসলমান পণ্ডিত মণ্ডলীতে সংস্কৃত চর্চ্চার সবিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল, এবং এক বদায়ূনি ব্যতীত তৎকালের সমস্ত সুশিক্ষিত মোসলমান উহার অনুশীলনে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন।

মোসলমান সম্রাট কুলতিলক আকবর ধর্ম্ম, সমাজ ও শাসনকার্য্যের নানাবিধ সংস্কার করিয়াছিলেন; তাঁহার আদেশে এবং উৎসাহে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বহু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। রাজনীতিবিশারদ শের শাহ রাজস্বনীতির যে রেখাপাত করেন, আকবর তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। আকবর প্রথমতঃ সমস্ত ভূমির বিশুদ্ধ পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক বিঘায় কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারই নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। এ জন্য তিনি সর্ব্ব স্থানের জন্য একজাতীয় নলের সৃষ্টি করেন। এই নল দ্বারা সমস্ত ভূমির পরিমাপ হইলে কোন্ ভূমিতে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নির্দ্ধারণ করেন। উর্ব্বরতা অনুসারে সমস্ত ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

শ্রেণী।	গম।	তুলা।
প্রথম শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায়	১৮/০	১০/০
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায়	১২/০	৭॥০
তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায়	৮৸৫	৫/০
	৩৮৸৫	২২॥০

এই তিন শ্রেণীর জমিতে গমের গড় উৎপন্ন বার মণ সাড়ে আটত্রিশ সের ও তুলার গড় উৎপন্ন সাত মণ বিশ সের। ইহার এক

তৃতীয়াংশ রাজার প্রাপ্য। গমের জমির প্রত্যেক বিঘা হইতেই যে চারি মণ সাড়ে বার সের ও তুলার জমির প্রত্যেক বিঘা হইতেই যে দুই মণ বিশ সের শস্য রাজকরস্বরূপ গ্রহণ করা হইত, তাহা নহে। ইহা রাজস্বের সর্ব্বোচ্চ হার মাত্র ছিল। প্রজা ইচ্ছা করিলেই আপন জমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিত। এই পরিমাণ দ্বারা যে শস্য পাওয়া যাইত, তাহারই তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এতদ্ব্যতীত এ সম্বন্ধে অন্যরূপ আদেশও ছিল। যে জমিতে বীজবপনের জন্য চাষের আবশ্যক ছিল না, তাহার রাজস্ব প্রত্যেক ফসলের সময় পূর্ণহারে গ্রহণ করা হইত। যে জমিতে বীজবপনের জন্য চাষের আবশ্যক হইত, তাহার রাজস্ব কেবলমাত্র আবাদ হইলেই প্রদান করিবার নিয়ম ছিল। জমি জলপ্লাবনে নষ্ট হইলে, অথবা একাদিক্রমে তিন বৎসর অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকিলে, অথবা জমীর পুনঃকর্ষণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে, প্রথম বৎসর দুই পঞ্চমাংশ রাজস্ব-স্বরূপ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরে অল্প অল্প করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া পূর্ণহারে আদায় করা হইত। ভূমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রায় রাজস্ব গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এ নিমিত্ত কোন জমির পরিমাপ দ্বারা রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবার সময় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উনবিংশ বর্ষের শস্যের মূল্যতালিকার গড় অনুসারে মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইত। কিন্তু এ নির্দ্ধারণও কখনও কখনও বাজার দর মত পুনরায় বিবেচনাধীন করিবার নিয়ম ছিল, এবং কোন প্রজা মুদ্রার হার অতিরিক্ত মনে করিলে শস্য দ্বারাই রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত। কোন কোন ভূমির জন্য নগদ অর্থেই রাজস্ব গ্রহণ করা হইত। নীল, গাঁজা ও ইক্ষু প্রভৃতি যেসকল ভূমিতে

উৎপন্ন হইত, তাহার রাজকর নগদ অর্থেই দিবার নিয়ম ছিল। প্রথমতঃ প্রতি বৎসর রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইত; কিন্তু পরে এক কাজে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত হওয়া বিরক্তিকর হইয়া উঠাতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জমীর পরিমাণ, শ্রেণীবিভাগ, পত্তন ও রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রাম্য কর্ম্মচারীর সেরেস্তায় লিপিবদ্ধ থাকিত।

আকবর রাজস্বের পূর্ব্বোক্তরূপ উন্নতিবিধান করিয়া নানাবিধ রাজপ্রাপ্য ও আমলান-প্রাপ্য কর তুলিয়া দেন। ইহার ফলে বর্দ্ধিত রাজস্ব নিবন্ধন প্রকৃতিপুঞ্জ করভারে নত হইয়াছিল না। পাদশাহ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য শুল্ক এবং জলকরের পরিমাণ লঘু করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যদিকে আদায়কারী রাজকর্ম্মচারিগণের তহবিল তছরূপ করিবার পথ পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত করাতে রাজকোষের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। আকবর রাজস্বকর্ম্মচারিদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে, প্রজাবর্গ যাহাতে সুখসচ্ছন্দতা সম্ভোগ করে, এবং রাজস্ব বিষয়ক নব ব্যবস্থা যাহাতে উদার ভাবে পরিচালিত হয়, তন্নিমিত্ত তিনি একান্ত যত্নশীল ছিলেন। কোন বিভাগের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিবার প্রথা ছিল না। গ্রাম্যমণ্ডল ও পাটওয়ারীর কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া চাষী প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাদশাহের আদেশ ছিল। রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমলের সাহায্যে আকবর রাজস্বসংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আকবর শাসনসৌকর্য্যার্থ সমস্ত সাম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। (১) প্রত্যেক সুবার জন্য একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা

(১) ১। দিল্লী, ২। আগ্রা, ৩। কাবুল, ৪। লাহোর, ।৫ মুলতান,

ছিলেন। তাঁহার উপাধি সুবাদার বা নাজিম ছিল। তিনি পাদশাহের উপদেশ মত শাসন ও সৈন্যবিভাগসম্বন্ধীয় সকল প্রকার কার্য্যের পরিচালন করিতেন। প্রত্যেক সুবার রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য এক একজন দেওয়ান নিযুক্ত থাকিতেন। স্বয়ং পাদশাহ দেওয়ান মনোনীত করিতেন। প্রত্যেক সুবা কতিপয় সরকারে, প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণাতে এবং প্রত্যেক পরগণা কতিপয় দাস্তরে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেন। প্রত্যেক সরকারের জন্য একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা আপন আপন বিভাগের সৈন্যদলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সরকারসমূহের শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের নিমিত্ত তাঁহারাই দায়ী থাকিতেন। কাজি ও মুফ্‌তির সাহায্যে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত। বৃহৎ বৃহৎ নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কোতওয়ালগণ নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে রাজস্বকর্ম্মচারিগণই শান্তিরক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পল্লীগ্রামের বিচারকার্য্য পঞ্চায়তী প্রথায় নির্ব্বাহিত হইত। উইলসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোনও বিবাদে উভয় পক্ষ হিন্দু হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন।

আকবর এই কর্ম্মচারিদিগকে যে সকল আদেশলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার প্রজাপ্রীতি ও ন্যায়পরায়ণতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তাকে একখানি আদেশপত্রে প্রাণদণ্ড, বেত্রদণ্ড ও লৌহদণ্ড ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু একমাত্র প্রবল রাজদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অপরাধে প্রাণদণ্ডবিধান না করিবার আদেশ ছিল।

৬। আজমীর, ৭। গুর্জ্জর, ৮। মালব, ৯। অযোধ্যা, ১০। এলাহাবাদ, ১১। বিহার, ১২। বঙ্গ, ১৩। খান্দেশ ১৪। বেরার, ১৫। আমেদনগর।

প্রাণদণ্ডবিধান করা আবশ্যক হইলে পাদশাহের নিকট সমস্ত কাগজপত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। প্রাণদণ্ডবিধানকালে বিকলাঙ্গ অথবা অন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণও নিষিদ্ধ ছিল।

ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বৃত্তিস্বরূপ নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে জায়গীরদান করিবার প্রথা ছিল। এই প্রথার ফলে সৈন্যাধ্যক্ষগণ আপন আপন জায়গীরে যথেচ্ছভাবে করআদায় করিয়া প্রজাপীড়ন করিতেন। সৈন্যসংগ্রহের প্রণালীও দূষণীয় ছিল। জায়গীরের উপস্বত্ব দ্বারা সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে নিয়মমত যে পরিমাণ সৈন্যপরিপোষণ করিতে হইত, তাঁহারা তত সংখ্যক সৈন্য রাখিতেন না। সৈন্য সহ উপস্থিত হইবার জন্য রাজাদেশ প্রচারিত হইলে তাঁহারা যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া সৈনিক পরিচ্ছদে শোভিত করিতেন, এবং তাহার পর তাহাদিগকে ভাড়াটিয়া অশ্বে আরোহণ করাইয়া সসৈন্যে রাজশিবিরে উপস্থিত হইতেন। এই জন্য আকবর বৃত্তিস্বরূপ জায়গীর প্রদান করিবার প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া নগদঅর্থ দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন। তদ্ব্যতীত বৃত্তিপ্রদানের সময় সৈন্যদিগকে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আদেশ ছিল। তিনি প্রত্যেক সৈনিকপুরুষের আকৃতি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রাখিবার ও প্রত্যেক অশ্বের গাত্রে চিহ্ন অঙ্কিত করিবার রীতি প্রচলিত করেন। আকবর সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে মনসবদার নাম প্রদান করেন, এবং তাঁহারা গুণানুসারে দশ সহস্র, সপ্ত সহস্র, পঞ্চ সহস্র, বা তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিতেন। এই সকল সেনার বেতন রাজকোষ হইতে প্রদান করা হইত। সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যের সংখ্যানুসারে দশহাজারী, সাতহাজারী, অথবা পাঁচহাজারী বলা হইত। পাঁচহাজারী সেনাপতির মাসিক বৃত্তি ১০৬৩৭৲ হইতে ৩০০০০৲ টাকা

পর্য্যন্ত ছিল। এই বৃত্তি হইতেই অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও অস্ত্র প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত।

অভিনব ধর্ম্মবিধানের সংগঠন, শাসনকার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন ও রাজস্ব সম্বন্ধে নববিধির প্রচলন রাজত্বের সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষে (১৫৯২ খৃঃ) সম্পন্ন হইল। এই সময় আকবর "প্রদীপ্ত যশঃপ্রভায় দীপ্তিসম্পন্ন।" মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং "দূর-দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া" মোগলের সিংহাসনতলে ভক্তি ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল।

এই সময় মন্ত্রিপ্রধান টোডরমল পরলোকে গমন করিলেন। আকবর তাঁহার সাহায্যেই রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিয়া যশোমন্দিরে অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন। টোডরমল আজীবন রাজসেবায় নিরত থাকিয়া জীবনের শেষভাগ ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করিবার জন্য পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারে গমন করেন। আকরর এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রীর অভাবে একান্ত ব্যথিত হইলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল দুই-হাজারী মনসব লাভ করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হইলেন। এই বৎসরই ফৈজী দৌত্যপদে বৃত হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে আকবরের সুহৃদযুগলের পিতা শেখ মবারক পরলোকে গমন করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরেই ফৈজী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পাদশাহ অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে একান্ত শোকাকুল হইলেন। পর বৎসর আকবর দক্ষিণাপথ বিজয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় দক্ষিণাপথ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। সাহিত্যরথী যুদ্ধক্ষেত্রেও শৌর্য্যবীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন! এই সময় তিনি রাজভক্তি ও নিঃস্বার্থপর-

তারও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। তদীয় ভগিনীপতি খান্দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি আবুল ফজলকে মহার্ঘ্য উপহার প্রদান করিয়া বশীভূত করিবার প্রয়াসী হইলে তিনি বলেন যে, পাদশাহের অনুগ্রহেই তাঁহার সমস্ত ধনলালসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। পর বৎসর আবুল ফজল আশির দুর্গ অধিকার করিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে পাদশাহী সৈন্য খান্দেশ দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইল। এই বৎসরই আবুল ফজল রাজাজ্ঞায় দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পথিমধ্যে শাহজাদা সেলিমের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন। পাদশাহ চিরসহচরের অপঘাতে শোকাকুল হইয়া দুই দিন অন্নজল পরিত্যাগ করিলেন।

খান্দেশ-বিজয় সম্পন্ন হইলে আকবর নিজপুত্র দানিয়ালের নামানুসারে সে দেশের নাম দান্দেশ রাখিলেন, এবং ফতেপুরের রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে খান্দেশ-বিজয়ের স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করিলেন। এই স্মারকলিপিতে পাদশাহের বহু গুণানুবাদের পর নিম্নলিখিত বাক্যটি খোদিত ছিল। "Said Jesus, (on whom be peace!) The world is a bridge, pass over it, but build no house there. He who hopes for an hour hopes for an eternity. The world is but an hour: spend it in devotion, the rest is unseen."

খান্দেশ-বিজয়ের চারি বৎসর পরে শাহজাদা দানিয়াল অকস্মাৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। প্রিয়তম পুত্রের অকালমৃত্যুতে পাদশাহ শোকে মুহ্যমান হইলেন। তিনি বৃদ্ধদশায় এই দারুণ শোকতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্তিম শয্যায় পতিত হইলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দারুণ ব্যাধি তাঁহাকে প্রবলরূপে আক্রমণ করিল।

তৎকালীন ভিষকশ্রেষ্ঠ হাকিম আলী রাজচিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি রোগের লক্ষণসমূহ পরীক্ষাপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া রোগীর শারীরিক তেজেই উহা দূরীভূত হইবে, এই আশা করিয়া অষ্টাহ প্রতীক্ষা করিলেন। নবম দিবসে পাদশাহের দুর্ব্বলতা ও ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়াতে চিকিৎসক বৈদ্যকশাস্ত্রের শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু কোনও ফললাভ হইল না। উদরাময় গুরুতর আকার ধারণ করিল; এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, পাদশাহের আর জীবনের আশা নাই।

আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্রোহাচরণ করিয়া তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পাদশাহ পীড়াক্রান্ত হইলে রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ভার সচিবশ্রেষ্ঠ খান-ই-আজমের উপর অর্পিত ছিল। রাজা মানসিংহ আকবর শাহের একজন প্রধান সেনা-পতি ছিলেন; মোগল দরবারে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু মানসিংহের ভাগিনেয় ও খান-ই-আজমের জামাতা ছিলেন। পাদশাহের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইলে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেলিমের পরিবর্ত্তে খুসরুকে রাজসিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পাদশাহ এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া অন্তিম মুহূর্ত্তে রাজসভার সমস্ত ওমরাহকে আপনার শয়নকক্ষে আনয়ন করিবার জন্য সেলিমকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্র ও আমার জীবনের সুখ-দুঃখভাগী রাজপুরুষগণের মধ্যে যে মনোমালিন্য থাকিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না।" ওমরাহগণ সমবেত হইলে পাদশাহ তাঁহাদের নিকট সময়োপযোগী বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার পর তাঁহাদের প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও মনঃকষ্ট

দিয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাহিলেন। ইহার পর সেলিম পাদশাহের পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। পাদশাহ সেলিমকে স্বীয় প্রিয় তরবারি গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অনন্তর পাদশাহের আদেশে সেলিম রাজপরিবার-ভুক্ত মহিলাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং তদীয় পুরাতন বন্ধুদিগকে প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আকবর সেলিমকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। "ঈশ্বর তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, ঈশ্বরের নিকটই তিনি প্রতিগমন করিলেন।" (১)

আকবরের জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল? আবুল বাকি নামক তাঁহার একজন সভাসদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "His object being to unite all men in common bond of peace." আকবরের জীবন সফল; সার্দ্ধ তিন শত বৎসরেও যে দেশে মোসলমান শাসন শৃঙ্খলাপূর্ণ ও বদ্ধমূল হয় নাই, তিনি সেই দেশের আপাদমস্তক একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগলের সিংহাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

---

(১) কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আকবর শাহ মানবলীলা-সংবরণ করিবার পূর্ব্বে এসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার জন্য অনুতাপপ্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কলমা পাঠ করেন। ইহা কি বিশ্বাস্য? যে মোল্লার সাহায্যে আকবর মৃত্যুর পূর্ব্বে কলমাপাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম কাদির জাহান, এবং তিনি নিজেও একজন নব ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন। খাফি খাঁ আকবরের পুনর্ব্বার এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার বিষয় কিছুই লেখেন নাই। এরূপ কিছু ঘটিলে খাফি খাঁ অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। খাফি খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বদায়ূনি আকবরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা তাঁহার বলা কর্ত্তব্য ছিল না। মোল্লা তাতারসনের সহচর আকবরের যে কুৎসাপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি কখনও এসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই।

আহম্মদ আমিন আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিয়াছিলেন, "আকবর স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কোণের শাসনকার্য্য দৃঢ়তাসহকারে ও ন্যায়ানুমোদিতভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজসভায় সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের সমাগম হইত। এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে অনন্তশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রজাবৃন্দ তাঁহার আশ্রয়ে নিরাপদভাবে বাস করিত।" ফলতঃ, ম্যালিসন সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন, "We are bound to recognise in Akbar one of those illustrious men whom Providence sends in the hour of a nation's troubles to re-conduct it into those paths of peace and toleration which alone can assure the happiness of millions."

জাহাঙ্গীর।

মোগলকুলরবি আকবর অস্তগত হইলে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর (জগৎজয়ী) উপাধিধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভারতবর্ষের মোসলমান রাজন্যবৃন্দ মধ্যে আকবরের কর্ত্তব্যজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে রাজপুত রাজন্যগণের সহিত সৌহৃর্দ্দ সংস্থাপিত, অবাধ্য সামন্তগণ বশীভূত, প্রজাহিতৈষণা প্রসারিত এবং রাজা প্রজার মধ্যে অবিশ্বাস দূরীকৃত হইয়াছিল। আকবর বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার গৃহীত ব্রত অতি পবিত্র, এবং তৎপ্রতিপালন জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি এই কর্ত্তব্য যথাযথরূপে প্রতিপালন জন্য শাসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ফলতঃ, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, "Every minute spent in comprehending small things is a minute spent in the service of God." কিন্তু তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহার বিপরীত পন্থাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে এই ধারণা জন্মে যে, তিনি ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করা রাজোচিত গৌরব ও সম্মানের লাঘবজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আকবরের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পুত্রের এরূপ কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। পুত্রের কুশিক্ষার জন্য আকবর কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি জাহাঙ্গীরের চরিত্র সংগঠন জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন

না। জাহাঙ্গীরের জন্মবিবরণ অলৌকিক। রাজমহিষী (অম্বরাধিপতির দুহিতা) বন্ধ্যা ছিলেন। পাদশাহ সিংহাসনারোহণের চতুর্দ্দশ বর্ষ তীর্থ দর্শনোপলক্ষে আজমীর অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পুত্র কামনায় রাজমহিষীকে পথিমধ্যে ফতেপুরের সাধুপ্রবর সেলিমের আশ্রমে রাখিয়া যান। কথিত আছে যে, সেলিমের ঈশ্বরারাধনার ফলে রাজমহিষী এই স্থানে পুত্রমুখ সন্দর্শন করেন। রাজকুমার ধর্ম্মপিতার নামানুসারে সেলিম নামে অভিহিত হন, এবং পাদশাহ তাঁহাকে আদর করিয়া সেলু বাবা নাম প্রদান করেন। ঈদৃশ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজকুমার যে অস্থিরমতি, স্বেচ্ছাচারী, কুসংস্কারাপন্ন ও সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সর্ব্ব প্রথম ঘটনা খুসরুর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহদমনকার্য্যে তাঁহার স্নেহশীলতা ও নৃশংসতা যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "আমার পিতার পীড়ার সময়ে কতিপয় অপরিণামদর্শী ব্যক্তি * * * তাহাকে (খুসরুকে) সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে এবং রাজ্যভার তাহার হাতে সমর্পণ করিতে মনন করিয়াছিল। * * * খুসরুর ও তদীয় নির্ব্বোধ অনুচরবর্গের দুঃস্বপ্ন অবমাননা ও লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুতেই পরিণত হইতে পারে না। আমি রাজ্যভার লাভ করিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করি। * * * তথাপি তাহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমার বাসনা বিফল হইয়াছিল। * * অবশেষে খুসরু তদীয় সহযোগিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জেলহজ্জ মাসের ২০শ তারিখে আমাকে জানাইয়াছিল যে, সে আমার পিতার সমাধিমন্দির দর্শন করিবার জন্য যাইতেছে। * * * কিয়ৎক্ষণ পরেই সংবাদ পঁহুছিল যে, খুসরু পলায়ন করিয়াছে। * * যাহা

ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "কি করিতে হইবে? আমি কি নিজেই অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিব অথবা খরমকে প্রেরণ করিব?" আমীর-উল্-ওমরা বলিলেন যে, আমি অনুমতি দিলে তিনি যাইতে পারেন। আমি বলিলাম "আচ্ছা।" * * * আমি তাঁহাকে প্রেরণ করিলাম। ইহার পর আমার স্মরণপথে পতিত হইল যে, খুসরু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, এবং তিনিও (আমীর-উল্-ওমরা) * * * ঈর্ষ্যান্বিত। * * আমীর-উল-ওমরা ঈর্ষ্যাকুল হইয়া তাহাকে বিনষ্টও করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। অতএব তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলাম। * * * সংবাদ পঁহুছিল যে, খুসরু পঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম, কোন বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য করিলাম না। খুসরু কর্ত্তৃক লাহোর আক্রমণের উদ্যোগের সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করিতে এবং আমাকে সতর্ক করিয়া দিতে দিলওয়ার খাঁ ফরওয়ারদিন মাসের ২৪শে তারিখে আমার নিকট বার্ত্তাবাহক প্রেরণ করিয়াছিলেন। (এই সময় দিলওয়ার খাঁ লাহোর রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন, ও পাদশাহ লাহোর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতেছিলেন।) * * (ইহার) দুইদিন পরে * * খুসরু নগরের নিকট উপনীত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে। অবরোধের নবম দিবসে খুসরু নিজের এবং অনুচরবর্গের অনুসরণকারী রাজসৈন্যের আগমনবার্ত্তা পরিজ্ঞাত হয়। অন্য উপায় না থাকাতে খুসরু রাজসৈন্যের সম্মুখীন হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করে। * * * রাজসৈন্য ও বিদ্রোহীদলের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। * * * ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমি দ্বিধাশূন্য চিত্তে যাত্রা করি। * * * সেতু উত্তীর্ণ হইবার পরেই বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করি। * * * খুসরুর ধৃত হইবার

সংবাদ অবগত হইয়া আমি তাহাকে আমার নিকট আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করি। * * * মিরজা কামারনের চেষ্টাতেই আমার নিকট খুসরুকে হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছিল। * * * আমার অনুচর ও সহচরগণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া খুসরু কম্পিত হইতেছিল ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল।" এই সময় পাদশাহ তাঁহাকে তদীয় অনুচরবর্গের নাম জিজ্ঞাসা করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, আমি তজ্জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি; সুতরাং বন্ধুগণের নাম প্রদান করিয়া আত্মসম্মান লাঘব করিতে ইচ্ছা করি না।" ইহার পর পাদশাহ তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। হাসন বেগ ও আবদুল রহিম নামক ওমরাহদ্বয় খুসরুর প্রধান সহযোগী ছিলেন। পাদশাহের আদেশে হাসন বেগকে বৃষের চর্ম্ম মধ্যে ও আব্দুল রহিমকে গর্দ্দভের চর্ম্ম মধ্যে পূরিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করান হইল। হাসন বেগ এই অবস্থায় রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু আব্দুল রহিম ঈশ্বরানুগ্রহে ও বন্ধুগণের সাহায্যে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। (১) ইহার পর রাজপথের উভয় পার্শ্বে ত্রিশূল সকল প্রোথিত করিয়া খুসরুর তিন শত অনুচরকে তদুপরি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। অনুগত অনুচরবর্গের ঈদৃশ নৃশংস হত্যাকার্য্য প্রদর্শন দ্বারা খুসরুকে ভীতিবিহ্বল ও শোকাকুল করিবার কল্পনায় তাঁহাকে

(১) In the excess of his impudence he drew a dog's skin over his face (*i. e.* he acted like a dog,) and as he was led through the streets and bazars, he ate cumcumbers and any thing else containing moisture that fell in his hands. He survived the day and night. Next day the order was given for taking him out of the skin. There wer many maggots in the skin, the but he survived it alI. *Ikbal-nama.*

প্রত্যহ বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইত। ঈদৃশ কঠোর ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াও পাদশাহ ইহার পর কিছুদিন অতিবাহিত হইলেই পিতৃস্নেহের বশীভূত হইয়া বিদ্রোহী পুত্রকে আংশিক স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহার পরেও রাজকুমার পিতার বিরুদ্ধে বারম্বার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াতে তিনি তাঁহারে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিবার জন্য আদেশ দেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে জাহাঙ্গীর তাঁহার যন্ত্রণা ও অনুতাপ দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া চক্ষুর চিকিৎসা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। চিকিৎসাগুণে রাজকুমার পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর ইহাতে সন্তোষলাভ করিয়া চিকিৎসকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন।

রাজকুমার খুসরুর বিদ্রোহ দমিত হইবার অব্যবহিত পরেই (জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে) বর্দ্ধমানের জায়গীরদার সের আফগানের হস্তে বাঙ্গলার সুবাদার কুতব উদ্দীন, ও কুতুব উদ্দীনের অনুচরগণের হস্তে সের আফগান নিহত হন। ইহাই জাহাঙ্গীরের জীবনের ও রাজত্বের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। রিয়াজ কর্ত্তা গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, সের আফগান দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সম্রাটের আদেশানুসারে কুতব বর্দ্ধমান গমন করেন। এই স্থানে সের তাঁহার আকার ইঙ্গিতে শঙ্কিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে বধ করেন। এবং এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মোগল অনুচরগণ তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করে। জাহাঙ্গীর পাদশাহ সেরের বিধবা পত্নী মেহেরুলনেছাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সের আফগানের মৃত্যুর পর পাদশাহ যে তাঁহার পত্নীকে হস্তগত করিবেন, তাহা তাঁহার (সের আফগানের) অবিদিত ছিল না। কোন সূত্রে সের

এবিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সেরের সঙ্গে বিবাহিতা হইবার পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর মেহেরুলনেছার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আকবরের অভিমত না হওয়ায় মেহেরুলনেছা সের আফগানের সঙ্গে পরিণীতা হন। জাহাঙ্গীর ভগ্নমনোরথ হইয়াও মেহেরুলনেছার মূর্ত্তি মানস পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন না। এবং তাঁহার প্রবল অনুরাগ ও অদম্য আসক্তির সংবাদ সের আফগানের জীবদ্দশাতেই নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভে মানসিংহ বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তৃপদে বৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে অল্প দিনের মধ্যেই রাজধানীতে আহ্বান করেন। রাজা মানসিংহকে কেন বাঙ্গলা দেশ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল, তাহার কোন কারণ জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে উল্লেখ করেন নাই। মানসিংহের পর তাঁহার একান্ত প্রীতিভাজন ও অনুগত কুতব উদ্দীন বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন; এবং তিনিই সের আফগানের হত্যার কারণ স্বরূপ হইয়াছিলেন। এজন্য কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মেহেরুলনেছার লোভেই জাহাঙ্গীর সেরকে নিহত করাইয়াছিলেন।

(১) আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে এই গুরুতর অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু সের আফগানের হত্যাকার্য্যে তাঁহার ইঙ্গিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (২) সম সাময়িক ইকবলনামার লেখক এবং মোহাম্মদ হাদি খাঁ উভয়েই সেরের দুষ্কৃতিই তাঁহার হত্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) বিধবা মেহেরুলনেছা পাদশাহের নিকট নীত হইবার পর চারি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই, এবং তাঁহার ভরণ

পোষণের জন্য অতি সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই তিন কারণে শ্রীযুক্ত কিন সাহেব জাহাঙ্গীরকে সের আফগানের হত্যাকার্য্যে নিষ্পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) আবুল ফজল এসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি মোসলমান সমাজে একান্ত হেয় ছিলেন। আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের উন্নতির পথের কণ্টক স্বরূপ ছিলেন। মোসলমান পাদশাহগণ রাজনৈতিক উন্নতির পথের কণ্টক তরবারি হস্তে উন্মূলিত করিতেন; মোসলমান সমাজে তাদৃশ কার্য্য বড় নিন্দনীয় ছিল না। সুতরাং আবুল ফজলকে হত্যা করার জন্য জাহাঙ্গীরকে পরিবাদগ্রস্ত হইতে হয় নাই, বরং কাফের তুল্য আবুল ফজলকে হত্যা করার জন্য তিনি গোঁড়া মোসলমান সমাজে প্রশংসাভাজনই হইয়াছিলেন। কিন্তু মোসলমান সমাজে স্ত্রীলোভে কাহাকেও হত্যা করা চিরকালই একান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত থাকে। সুতরাং জাহাঙ্গীর লোকাপবাদ ভয়ে সেরের হত্যাকার্য্যে স্বীয় সংশ্রবের কথা গোপন করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করা অসঙ্গত নহে। (২) ইকবলনামা জাহাঙ্গীরের অদেশে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার লেখক মোগল দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু যে বিষয় গোপন করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন, তাহা তিনিও প্রচার করিতে পারেন নাই। মোহাম্মদ হাদি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের, বিশেষতঃ ইকবলনামার অবিকল অনুকরণ করিয়াছিলেন। (৩) মোহাম্মদ হাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পাদশাহ কুতবের শোকে অধীর হইয়া মেহেরুলনেছার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আকবর দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। তাহার পর সেখ সেলিম সাধুর কৃপায় পুত্রসন্তান লাভ করেন। এই পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর।

কুতব সাধু সেলিমের জামাতা ও জাহাঙ্গীরের ধাত্রী-পুত্র। তাঁহারা আজন্ম একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাদৃশ অন্তরঙ্গ ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকে অধীর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি মেহেরুলনেছার অতুল রূপরাশি মুখ্য অথবা গৌণ ভাবেও কুতবের বিনাশের কারণ না হয়, তবে পাদশাহ যে নিরপরাধা বিধবাকে রাজান্তঃপুরে বন্দিনী করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র বটে। মেহেরুলনেছা তেজস্বিনী বীর রমণী ছিলেন। শোকাবেগে প্রথমে স্বামীহন্তার সঙ্গে পরিণীতা হইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করাও অসম্ভব ছিল না।

যাহা হউক, মেহেরুলনেছার চারি বৎসর রাজান্তঃপুরে অবস্থিতি করার পর জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মহা সমারোহে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার পর জাহাঙ্গীরের উপর বেগমের অতুল প্রভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। পাদশাহ তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বস্তুতঃ কখন কোন রাজমহিষী মোসলমান নরপতির উপর তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহের স্থল। ইতিহাসবেত্তা হাদি খাঁ লিখিয়াছেন, “তিনি অচিরে পাদশাহের প্রিয়তমা মহিষী হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমতঃ নূরমহাল (the Light of the Palace,), এবং তাহার পর অল্পদিন মধ্যেই নূরজাহান বেগম (the Queen, the Light of the World) উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হন। * * * পাদশাহ ও তদীয় আত্মীয়বর্গ সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হন, এবং ইতিমদ উদ্দৌলার (নূরজাহানের পিতা গিয়াসবেগ) ভৃত্য ও খোজা সকল খাঁ ও তুর খাঁ পদবী লাভ করে। দিলরাণী নাম্নী প্রাচীনা দাসী পাদশাহের প্রিয়তমা মহিষীকে

প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি হাজি কোকাকে অতিক্রম করিয়া রাজপ্রাসাদের দাসীদের অধিনেত্রীপদ প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার মোহর (মোহর যুক্ত অনুমতি পত্র) ব্যতীত সদ্র-উস-সদূর তাহাদের বেতন প্রদান করিতেন না। নূরজাহান রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সর্ব্বপ্রকার সম্মান বিতরণের ভার তাঁহার হস্তেই সংন্যস্ত ছিল, নূরজাহান স্বাধীন নরপতির তুল্যই ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার নিজনামে খোতবা পঠিত হইত না। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর কোনও অভাব ছিল না।

কিছুকালের জন্য তিনি ঝারোকার (Balcony) পার্শ্বেও উপবিষ্টা থাকিতেন, এবং আমীর ওমরাহবর্গ তাঁহাকে অভিবাদন করিতে, এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতে আগমন করিতেন। তাঁহার নাম সংযোগে রাজমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। (১) এবং সনন্দের রাজকীয় মোহরও তাঁহার স্বাক্ষরে শোভিত হইত। সংক্ষেপে তিনি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের অবিসম্বাদিত অধিশ্বরী হইয়াছিলেন,—একমাত্র রাজনাম তাঁহার ছিল না। পাদশাহ নিজে তাঁহার হস্তে ক্রীড়ণকে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি (বেগম) মনোনীতা হইয়াছেন এবং তিনি তৎপরিচালনে উপযুক্ত; কেবল এক বোতল মদ এবং এক টুকরা মাংসই আমার নিজের সন্তোষবিধানের পক্ষে যথেষ্ট।

নূরজাহান সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন। যাহারা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত, তাহাদের সকলের প্রতিই তিনি ন্যায়বতী ও দানশীলা ছিলেন।

---

(১) রাজমুদ্রায় জাহাঙ্গীরের নামের পার্শ্বে নূরজাহানের নামও অঙ্কিত থাকিত। যে মনোরম বাক্যসহ নূরজাহানের নাম জড়িত থাকিত তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"By order of the Emperor Jahanger gold acquired a hundred times additional value in the name of the Emperors Noor Jehan."

তিনি নিপীড়িতের আশ্রয়স্থল ছিলেন; এবং অনেক উপায়হীনা বালিকা তাঁহার নিজস্ব অর্থসাহায্যে পরিণীতা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে প্রায় পাঁচ শত বালিকাকে যৌতুক প্রদান করেন; এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার সদাশয়তায় উপকৃত ও কৃতজ্ঞ ছিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাসন সংরক্ষণকার্য্যে আকবর প্রবর্ত্তিত সুব্যবস্থাই অনুসৃত হইয়াছিল; এবং প্রধান রাজপুরুষগণ সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে নিরত ছিলেন। যদিও পাদশাহ নিজে অলস, বিলাসপটু, ও নৃশংস ছিলেন; তথাপি পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয়ে তাঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে,—অন্তর্ব্বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্যে উন্নতিমার্গে ক্রমশঃ ধাবিত হয়, এবং সর্ব্বত্র পূর্ণশান্তি বিরাজ করে। প্রধানতঃ চারিজন কর্ম্মনায়কের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নেই সাম্রা-জ্যের তাদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উজীর গিয়াসবেগ, মন্ত্রী আসফ খাঁ, সেনাপতি মহাবত খাঁ এবং রাজকুমার খরম, এই চারি ব্যক্তিই জাহাঙ্গীরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি, বৈভব ও শৃঙ্খলার মূলাধার ছিলেন।

গিয়াসবেগ নূরজাহানের পিতা, নূরজাহানের প্রাধান্যই তাঁহার উজিরী পদপ্রাপ্তির কারণ। কিন্তু তিনি সর্ব্বতোভাবে এই পদের উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সাধুতা ও রাজকার্য্যে দক্ষতা ছিল। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গুণগ্রাহী প্রজাপুঞ্জ তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তদীয় নামোচ্চারণে তাহাদের হৃদয় প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছ্বসিত হইত।

আসফ খাঁ নূরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর উন্নতির মূলেও নূরজাহানের প্রাধান্য বর্ত্তমান। কিন্তু ইনিও পিতার ন্যায় রাজনীতি বিশারদ সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। আসফ খাঁ প্রজারঞ্জনই জীবনের

মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন,—অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্ব্বদা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিরত থাকিতেন।

মহাবত খাঁ পাঠান কুলোদ্ভব ও নূরজাহানের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতেই মহাবতের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুগ্রহ অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছিল না। তৎকালীন রাজ-পুরুষগণ মধ্যে মহাবত খাঁই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভা-সমুজ্জ্বল ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, তেজস্বিতা ও সাহসিকতা মোগল ইতিহাসে স্বর্ণা-ক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মহাবত খাঁ পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

রাজকুমার খরম পাদশাহের তৃতীয় পুত্র এবং রণকুশল তেজস্বী বীরপুরুষ। আকবর শাহ এক মিবার ব্যতীত সমগ্র রাজস্থান বশীভূত করিয়াছিলেন। মিবরাধিপতি স্বদেশ-প্রাণ প্রতাপ সিংহের অলৌকিক বীরত্বে আকবর তথায় প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। জাহা-ঙ্গীর মিবার বশীভূত করিয়া রাজস্থান বিজয় সম্পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হন, এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজকুমার খরমের অধীনে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রতাপপুত্র অমর সিংহ পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড পরাক্রমে দণ্ডায়মান হন, কিন্তু পরাক্রান্ত শত্রুর হস্তে বারম্বার পরাজিত হইয়া গত্যন্তর না দেখিয়া অবশেষে মোগলের বশ্যতাস্বীকার করেন। মিবার বিজয় হইতেই খরমের সৌভাগ্যের সূচনা। পাদশাহ তাঁহার কার্য্যে প্রীতিলাভ করেন, তিনি পুরস্কার স্বরূপ রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মিবার বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল। আকবর শাহ দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্যসমূহ অধিকার করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণা-পথের অন্যতম রাজ্য আমেদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এদেশের কিয়দংশে মোগল-পতাকা উড্ডীন হইলেও আকবর সন্ধি স্থাপন করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর মালিক আম্বার নামক জনৈক সেনাপতি অস্ত্র ধারণ করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথে সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু মালিক আম্বারের নিকট মোগলশক্তি প্রতিহত হয়। শত্রুহস্তে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া পাদশাহ একান্ত ম্রিয়মান হয়। তিনি শত্রুকে নির্য্যাতন করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিরত ছিলেন, এমন সময় শাহজাদা খরম মিবার বিজয় সম্পন্ন করিয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পাদশাহ দক্ষিণাপথের দুরূহ কার্য্যেও খরমকেই নিয়োজিত করিলেন। এবারও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হন; এবং মালিক আম্বার বিজিত স্থানসমূহ খরমের হস্তে সমর্পণ করেন। শাহজাদা এইরূপে স্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মহা গৌরবে পিতৃ-সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মিবার বিজয়ে খরমের যে সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, আমেদনগরে মালিক আম্বারের পরাজয়ে তাহা মধ্যাহ্নাকাশে সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাগত হইবার পর প্রথম দর্শনে পাদশাহ প্রিয়পুত্রকে বারম্বার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন না। মিবারের রাণাকে বশীভূত করিয়া খরম বিংশ সহস্র পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিবার সময় পাদশাহ তাঁহাকে শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি রাজপ্রসাদ স্বরূপ ত্রিশ সহস্র পদাতিক ও বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কতা ও শাহজাহান (the Lord of the World) উপাধিলাভ করেন। পাদশাহ এই সকল অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াও

পরিতৃপ্ত না হইয়া দরবারের সময় রাজ সিংহাসনের পার্শ্বেই খরমকে পৃথক আসন প্রদান করেন ;—ঈদৃশ রাজসম্মান সম্পূর্ণ অভিনব ছিল, ইহার পূর্ব্বে তৈমুরবংশীয় আর কোন রাজকুমার রাজ সিংহাসনের পার্শ্বে পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইতে পারেন নাই। শাহজাহান জাহাঙ্গীরের কিদৃশ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা আর একটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পাদশাহ একান্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন ; মৃগয়ায় ব্যাপৃত হইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা শাহজাহানের একটী পুত্র জীবনসংশয় কাতর হইলে পাদশাহ পৌত্রের আরোগ্যকামনায় স্বার্থত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নিকট শপথ পূর্ব্বক মৃগয়া পরিত্যাগ করেন, তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল তিনি এই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

যে চারিজন কর্ম্মনায়কের চেষ্টা ও যত্নে জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব ও বৈভব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে গিয়াস বেগ ও আসফ খাঁ পাদশাহের অন্তরঙ্গ কুটম্ব, মহাবত খাঁ তাঁহার নিঃসম্পর্কীয় হইলেও একান্ত প্রীতিভাজন, এবং শাহজাহান তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র ছিলেন। ফলতঃ, তাঁহারা যে কেবল মাত্র মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, তাহা নহে ; পাদশাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনেও আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু নূরজাহান বেগম পাদশাহকে প্রণয়ের কুহকমন্ত্রে এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্ররোচনায় শাহজাহানের ন্যায় সমরক্ষেত্রের প্রধান অবলম্বন প্রাণাধিক পুত্রকে এবং মহাবত খাঁর ন্যায় প্রীতির আস্পদ ও কার্য্যক্ষেত্রের প্রধান সহায় সেনাপতিকেও হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা সে বিচিত্র কাহিনী এথানে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দক্ষিণাপথে আমেদনগর

রাজ্যে মালিক আম্বার যুদ্ধঘোষণা করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহার দমন জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন ; এবং প্রথমতঃ মোগল সৈন্য শত্রুহস্তে পরাজিত হয়, ও তারপর শাহজাহান তথায় গমন পূর্ব্বক মোগলের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিয়া পিতৃ সন্নিধানে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই ঘটনা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে, অর্থাৎ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে, সংঘটিত হইয়াছিল।

ইহার কতিপয় বৎসর পরে, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে, মালিক আম্বার পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথে গোলযোগ উপস্থিত করিলে, পাদশাহ শাহজাহানকে দ্বিতীয়বার দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিলেন। এবারও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন, তিনি নানাপ্রকারে মালিক আম্বারকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু সে গোলযোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি নূরজাহানের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইলেন।

জাহাঙ্গীরের পর মোগল সাম্রাজ্য করতলগত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা শাহজাহান হৃদয়ের নিভৃত কোণে পোষণ করিতেন, ইহা তীক্ষ্ণদর্শিনী নূরজাহানের অপরিজ্ঞাত ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু বিদ্রোহ অবলম্বনের পর হইতে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দক্ষিণাপথের তৃতীয় যুদ্ধকালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিতীয় পুত্র প্রবেজের প্রতি পাদশাহ প্রীতিমান ও সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিশেষতঃ তিনি একজন উচ্চাশাবিহীন নিরীহ প্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং তৃতীয় পুত্র শাহজাহানের সাম্রাজ্যলাভের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা ছিল। শাহজাহান নূরজাহান বেগমের তাদৃশ অনুগত ছিলেন না। সের আফগানের ঔরসজাতা নূরজাহানের এক কন্যা ছিল। পাদশাহের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ার তাঁহাকে রাজাদেশে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। শাহরিয়ার নূরজাহানের একান্ত অনুগত ছিলেন। শাহজাহান সিংহাসনে

উপবিষ্ট হইলে নূরজাহানের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল ; পক্ষান্তরে, শাহরিয়ার পিতৃপদের অধিকারী হইলে আজীবন তাঁহার (নূরজাহানের) অনুগত থাকিবেন বলিয়াই লোকে বিশ্বাস করিত। এজন্য নূরজাহান শাহরিয়ারকে সাম্রাজ্যেশ্বর করিয়া স্বীয় প্রাধান্য ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শাহজাহান তাঁহার আশার কণ্টক স্বরূপ ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, শাহজাহান পাদশাহের নিটক থাকিতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবার আশা সুদূর-পরাহত। যখন শাহজাহান দ্বিতীয়বার দক্ষিণাপথে সংগ্রামক্ষেত্রে ব্যাপৃত, সেই সময় পারস্যাধিপতি মোগলের হস্ত হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লইলেন। নূরজাহান সম্রাটের নিকট হইতে শাহজাহানকে দূরবর্ত্তী করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া, তাঁহাকে কান্দাহারের উদ্ধার জন্য প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পাদশাহ শাহজাহানকে কান্দাহারে গমন করিতে আদেশ করিলেন। শাহজাহান এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সিংহাসনারোহণের পথে কণ্টক রোপণ করিবার অভিপ্রায়েই নূরজাহান চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে দূরদেশে প্রেরণ করিতেছেন। সুতরাং তিনি রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। বেগম এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পিতা পুত্রে মনোমালিন্য ঘটাইয়া দিলেন ; তাহার ফলে পাদশাহ তাঁহার সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন।

অতঃপর শাহজাহান বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে রাজসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। শাহজাহান রাজ-সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন। শাহ-জাদা প্রবেজ ও সেনাপতি মহাবত খাঁ রাজাদেশে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ

করিতে লাগিলেন। দক্ষিণাপথের কোন নরপতি অথবা শাসন-কর্ত্তা শাহজাহানের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি অনন্যোপায় হইয়া উড়িষ্যার পথে বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন। এই সময় নূরজাহানের অন্যতম ভ্রাতা এব্রাহিম ফতেজঙ্গ বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রবল পরাক্রমে শাহজাহানের গতি-রোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু অবিলম্বে রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। রাজ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সমগ্র বঙ্গদেশ রাজকুমারের পদানত হইল। তিনি তথায় স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োজিত করিয়া বিহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য রাজপুরুষগণ রাজ-কুমারের আগমনবার্ত্তা ও বঙ্গদেশ বিজয়ের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া ভয়-ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিলেন। শাহজাহান বিহারের বন্দোবস্ত করিয়া সগৌরবে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এলাহাবাদের নিকট-বর্ত্তী জুসি নামক স্থানে শাহজাদা প্রবেজ ও সেনাপতি মহাবত খাঁর অধীনে রাজ-সৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইল। তুমুল যুদ্ধে শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। শাহজাহান পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথে গমন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের চিরশত্রু মালিক আম্বারের সঙ্গে যোগ দিলেন। পাদশাহ পুত্রের পরাজয় সংবাদে প্রীত হইয়া মহাবত খাঁকে বঙ্গদেশের সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে, ও তদীয় পুত্র খানজাদ খাঁকে প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিলেন।

কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই মহাবত খাঁর দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহরিয়ারকে রাজপদে বরণ করিবার বিষয়ে মহা-বত খাঁ নূরজাহানের মতাবলম্বী ছিলেন না; এবং তাঁহার সঙ্গে আসফ

খাঁর মনোমালিন্য ছিল। এ জন্য তাঁহারা উভয়েই মহাবত খাঁর অহিত-কামী ছিলেন। শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধকালীন বহুসংখ্যক হস্তী মহাবত খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। তিনি এই সকল হস্তী যথাসময়ে পাদশাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন না। নূরজাহান এবং তদীয় ভ্রাতা এই উপলক্ষে মহাবত খাঁকে রাজদ্রোহী ও রাজস্ব অপহরণকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া তুলিলেন। পাদশাহ তাঁহাদের প্ররোচনায় তাঁহাকে আরব্ধকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগৌণে দরবারে হাজির হইবার জন্য আদেশ দিলেন। এই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি শত্রুর ষড়যন্ত্রে পাদশাহের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন। এ জন্য তিনি আবশ্যক হইলে পাদশাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কল্পনায় তাঁহার কার্য্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ পঞ্চ সহস্র অসমসাহসী রাজপুত যোদ্ধা সমভিব্যাহারে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। এই সময় পাদশাহ কাবুলে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে ঝিলামের তটে মহাবত খাঁ রাজশিবিরে উপনীত হইলেন। কিন্তু আসফ খাঁর চক্রান্তে রাজদর্শনলাভ করিতে পারিলেন না। মহাবত খাঁ রাজার অনুমতি না লইয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পাদশাহ তজ্জন্য তদীয় জামাতাকে বেত্রদণ্ড বিধান করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল ঘটনায় মহাবত খাঁ বুঝিতে পারিলেন, পুনর্ব্বার জাহাঙ্গীরের প্রীতিলাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন তিনি স্থির করিলেন, বলপূর্ব্বক পাদশাহকে হস্তগত করিবেন। এই সময় পাদশাহ একদিন প্রত্যূষে ঝিলামের তট-দেশ পরিত্যাগ করিয়া কাবুল অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাদ-শাহের শিবিরের সম্মুখে ঝিলাম,—ঝিলামের অপর পার হইতে কাবুলের পথ। প্রথমতঃ সৈন্যগণের এবং তৎপশ্চাতে পাদশাহের ঝিলাম উত্তীর্ণ হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তদনুসারে সৈন্যগণ অতি প্রত্যূষে পাদশাহ

ও তদীয় পার্শ্বচরদিগকে শিবিরে রাখিয়া নৌ-সেতু যোগে ঝিলাম উত্তীর্ণ হইল। রাজসৈন্য অপর তীরে উপনীত হইবামাত্র মহাবত খাঁ রাজপুত সৈন্যের সাহায্যে নৌ-সেতু ভস্মীভূত করিয়া পাদশাহকে অবরুদ্ধ করিলেন। এই সময় নূরজাহান বেগম পাদশাহের সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন, মহাবত খাঁ পাদশাহকে অবরুদ্ধ করিতেই ব্যাপৃত ছিলেন, অন্যদিকে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ ছিল না। বেগম এই সুযোগে অন্যের অলক্ষ্যে ঝিলাম পার হইয়া অপর তীরে রাজসৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

বেগম তথায় উপনীত হইয়া ওমরাহদিগকে সমবেত করিলেন; তাঁহারা অপরিণামদর্শীর ন্যায় পাদশাহকে পশ্চাতে রাখিয়া ঝিলাম উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন, এবং মহাবতের হস্ত হইতে স্বামীর উদ্ধারসাধন জন্য তাঁহাকে পর দিবস সসৈন্য আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তদনুসারে পরদিন প্রত্যূষে উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বেগম স্বয়ং গজারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সৈন্যদিগকে কেবল উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল উৎসাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, নিজেও শত্রু সৈন্যমধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে তীরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ক্রমাগত তিনজন হস্তিচালক শত্রুনিক্ষিপ্ত শরে নিহত হইল, তথাপি বেগমের অদম্য তেজ প্রতিহত হইল না, তিনি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তেজস্বিনী বীররমণী স্বামীর উদ্ধারকল্পে যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্যবীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। রাজপুত সৈন্যের প্রবল আক্রমণে রাজসৈন্য বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অগত্যা নূরজাহান লাহোর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মহাবত খাঁ পাদশাহকে বন্দী করিয়া সগৌরবে কাবুল অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। যদিও তিনি পাদশাহকে বন্দী করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদর্শনে কখনও ত্রুটী করিতেন না। পাদশাহের রাজপদোচিত সম্মান ও মর্য্যাদা দৃশ্যতঃ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল; আরামপ্রিয় সম্রাটের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর মহাবত খাঁর সঙ্গে আপনার সম্প্রীতির বর্ণনা করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য কোনও উদ্যোগ করিতে নিষেধ করিয়া বেগমকে পত্র লিখিলেন, এবং বেগমকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন।

নূরজাহানের লাহোর পঁহুছিবার কতিপয় দিবস পরেই এই রাজলিপি তাঁহার হস্তগত হইল; এবং তিনি রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পাদশাহের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। নূরজাহান কাবুলের পথে রাজশিবিরে উপনীত হইলে, মহাবত খাঁ তাঁহাকে রাজদর্শন করিতে দিলেন না। তিনি বেগমের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। (১) মহাবত জাহাঙ্গীরকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আমরা আপনাকে লোকাতীত ক্ষমতাপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। ঈশ্বরের অনুকরণে আপনার কাজকরা কর্ত্তব্য। আপনি ব্যক্তি বিশেষের সম্মান রক্ষক নহেন।"১ বেগমের যে মোহিনী শক্তিতে পাদশাহ অভিভূত ছিলেন, অদর্শনের

(১) That she had conspied against the Emperor by estranging the hearts of his subjects : that most cruel and unwarrantable actions had been done, by her capricious orders in every corner of the empire, that her haughtiness was the source of public calamities, her malignity the ruin of many individuals : that she had even extended her views to the Empire by favouring the succession of Shahariar to the throne, under whose feeble administration she hoped to govern India at pleasure-

ফলে তাহা অপসারিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি মহাবত খাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিলেন। এজন্য তিনি মহাবত খাঁর অভিযোগ শ্রবণ করিয়া বেগমের প্রাণদণ্ডের জন্য আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই ভীষণ সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, "বন্দী নরপতি প্রাণদণ্ড বিধানের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। এক-বার আমাকে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, এবং তিনি যে হস্তে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেই হস্ত অশ্রুসিক্ত করিতে দাও।" মহাবত খাঁর সাক্ষাতে নূরজাহান পাদশাহের নিকট আনীতা হইলেন। মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার সৌন্দর্য্য চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলেন না। জাহাঙ্গীর বাষ্পাকুল লোচনে বলিলেন, "মহাবত, তুমি কি এ রমণীর জীবনরক্ষা করিবে না? দেখ, নূরজাহান কিরূপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।" মহাবত খাঁ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মোগলাধিপতির যাচ্ঞা কখনও বিফল হইতে পারে না।" ইহার পর নূরজাহান প্রাণদণ্ড হইতে অব্যা-হতি পাইলেন।

অতঃপর পাদশাহ কাবুলে উপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধ বৎসর কাবুলে অতিবাহিত করিয়া তিনি লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। জাহাঙ্গীর মধুর প্রকৃতি ও ক্ষমাশীল ছিলেন। এজন্য মহাবত খাঁর সঙ্গে তাঁহার মিলন হইয়াছিল; তিনি তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রীতি ও সদাশয়তা প্রদর্শন করিতেন। মহাবত খাঁ পাদশাহের প্রসাদলাভ করিয়া আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যদি বেগম পাদশাহকে গোপনে মহাবত খাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন, তবে তাহা তিনি অকপটভাবে প্রকাশ করিয়া দিতেন। এই সব কারণে মহাবত খাঁ নিঃশঙ্ক ও নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া অসতর্ক হইয়া পড়িলেন, এবং সম্রাটকে হস্তামলকের

ন্যায় স্বীয় করতলগত রাখিবার জন্য যে রাজপুত সৈন্যদল পালন করিতেছিলেন, তাহার সংখ্যাহ্রাস করিয়া ফেলিলেন। নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে মহাবতের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য একদিনের নিমিত্তও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মহাবত খাঁকে অসতর্ক দেখিয়া স্থকৌশলে তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্নকরিয়া ফেলিলেন। মহাবত খাঁ প্রাণভয়ে অধীর হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আসফ খাঁ তাঁহার দুরবস্থা অবলোকনে কৃপাপরবশ হইয়া পাদশাহের সঙ্গে তাঁহার পুনর্ম্মিলন ঘটাইয়া দিলেন।

এই সময় পিতৃদ্রোহী শাহজাহান দক্ষিণাপথে নানারূপ উৎপাত করিতেছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মহাবত খাঁ ও শাহজাদা প্রবেজ পুনর্ব্বার নিয়োজিত হইলেন। কিন্তু দক্ষিণাপথে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই প্রবেজ অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এদিকে শাহজাহান পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া সমস্ত মনোবাদের মূলচ্ছেদ করিলেন। শাহজাহান ও মহাবত খাঁ উভয়েই বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাবত খাঁ পূর্ব্বেই পাদশাহের ক্ষমালাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণ শাহজাহানও পুনর্ব্বার রাজানুগ্রহ লাভ করিলেন। কিন্তু কাহারও ভাগ্যে পূর্ব্ব-গৌরব ও মর্য্যাদা আর ফিরিয়া আসিল না। অবস্থার সৌসাদৃশ্য বশতঃ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল; এবং তাঁহারা দক্ষিণাপথে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতে লাগিলেন।

মহাবত খাঁ ও শাহজাহানের সম্মিলনের পর জাহাঙ্গীর অল্প দিন জীবিত ছিলেন। রাজত্বের ষোড়শতম বর্ষে তিনি শ্বাসকাশে প্রবল ভাবে আক্রান্ত হন। তিনি এই ব্যাধির দারুণ যন্ত্রণা নিবারণ জন্য অনবরত মদ্যপান করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু নূরজাহান অচিরে

তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়া চিকিৎসার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন। পাদশাহ লিখিয়াছেন যে, তিনি (বেগম) বুদ্ধিমত্তা ও বহুদর্শিতায় চিকিৎসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সপ্রেম সেবায় চিত্ত-বিনোদন করিয়া সুরার মাত্রা হ্রাস ও ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে যত্নবতী হন। রাজমহিষীর অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় তাঁহার পীড়া উপশমিত হয়, কিন্তু তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে খল পীড়া ছয় বৎসর পরে পুনর্ব্বার প্রবলাকারে দেখা দিল। এই বৎসরের মার্চ্চ মাসের একাদশ দিবসে পাদশাহ কাশ্মীর যাত্রাকালে পথিমধ্যে চিনাবের তটদেশে স্বীয় রাজত্বের দ্বাবিংশতিতম বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু এই প্রমোদ উৎসবে রোগক্লিষ্ট সম্রাটের হৃদয়তলে আনন্দ উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিল না; রঙ্গক্ষেত্রের মোহনদৃশ্য, মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও সজ্জাপাটের কারুকার্য্য তাঁহার তেজোহীন নয়নে সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিল না। নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ ও কামিনীর কমনীয় কণ্ঠের কাকলী তাঁহার শিথিল কর্ণ বিবরে সুধাধারা ঢালিল না। অহিফেণ তাঁহার যন্ত্রণা উপশমে শক্তিহীন হইয়া পড়িল, এবং সুরার প্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয় আর উত্তেজিত হইত না। তিনি ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের স্বাস্থ্যপ্রদ জল বায়ুতে আরোগ্যলাভের কামনায় শীঘ্রগামী হইলেন; কিন্তু পার্ব্বত্য জলবায়ু তাঁহার ভগ্নদেহে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে পারিল না। শীতসমাগমে সম্রাট লাহোর অভিমুখে পুনঃ যাত্রা করিলেন। বৈরামকিলা নামক স্থানে উপনীত হইয়া পাদশাহ মৃগয়ার নিমিত্ত কৃষ্ণ হরিণ তাড়না করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং বন্দুক হস্তে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একজন তাড়না-

কারী দৈবাৎ পদস্খলিত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরিভাগ হইতে নিম্নে পতিত হইল, এবং পাদশাহের সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। দুর্ব্বল-দেহ জাহাঙ্গীর এই ভীষণদৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না ; তিনি অবিলম্বে শিবিরে প্রতিগমন করিয়া এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির মাতাকে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শোকদগ্ধ ও নিজের অনুতাপদগ্ধ হৃদয় শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাদশাহ আর মনের শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, মৃত ব্যক্তির বিকটদৃশ্য তাঁহার নয়ন সমক্ষে সর্ব্বদা ভাসমান হইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুতগতিতে নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। তিনি বৈরামকিলা পরিত্যাগ করিয়া রাজোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সুরাপানের জন্য অধীর হইয়া পানপাত্র হস্তে তুলিয়া লইলেন ; কিন্তু উহা অধরস্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বিরক্তি সহকারে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তার পর দিন, উনষষ্টিতম বর্ষ বয়ঃক্রমে বিলাসী পাদশাহ কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

জাহাঙ্গীরের সম্মুখে সুরাপাত্র সংস্থাপিত না করিলে, তাঁহার চিত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, “আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই তিনবার ব্যতীত আর কখনও মদ স্পর্শ করি নাই। তাহাও আমার মাতা অথবা ধাত্রী শৈশবসুলভ রোগ নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। একবার আমার পিতাও এক তোলা পরিমাণ আরক (Spirit) গোলাপজলে মিশ্রিত করিয়া কাশি নিবারণ জন্য আমাকে সেবন করাইয়াছিলেন। * * * একদিন আমি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম ; মৃগয়াক্ষেত্রে নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল ; এবং আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। একজন অনুচর আমাকে বলিল যে, এক পেয়ালা সুরাপান করিলে আমার সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লেশদূর হইবে। সে সময়ে আমি নবীন যুবক, এবং আমার

চিত্ত বিলাসোন্মুখ, সুতরাং আমি শ্রান্তিনাশক পানীয় আনিবার জন্য হাকিম আলীর গৃহে জনৈক ভৃত্যকে প্রেরণ করিলাম। এই ভৃত্য একটি ক্ষুদ্র বোতলে দেড় পেয়ালা পরিমিত পীতবর্ণ সুস্বাদু সুরা লইয়া আসিয়াছিল, আমি উহা পান করিলাম। ইহার ফল আনন্দ-প্রদ হইয়াছিল, তদবধি আমি সুরাপানে অভ্যস্ত হইলাম। আমি প্রত্যহই মাত্রাবৃদ্ধি করিতাম। ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করাতে দ্রাক্ষারসের আর আমাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিবার শক্তি রহিল না। ইহার পর হইতেই আমি আরক পান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। (ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া করিয়া) নয় বৎসর মধ্যে ছুইবার চুয়ান আরক বিশ পেয়ালা নিঃশেষ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, ইহার চৌদ্দ পেয়ালা দিবাভাগে ও অবশিষ্ট ছয় পেয়ালা রাত্রিকালে পান করিতাম। এই বিশ পেয়ালা সুরার হিন্দুস্থানী ওজন ছয় সের। * * * এই সময় আমার আহারের পরিমাণ একটা মুরগী ও কিঞ্চিৎ রুটী ছিল। কেহই আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে সাহসী হইত না; এবং অবশেষে এমন হইয়াছিল যে, সুরাপানকালে আমি হস্তকম্পন নিবন্ধন পানপাত্র ধারণ করিতে পারিতাম না। আমি চুমুক দিতাম, কিন্তু অন্যে পাত্র ধারণ করিয়া থাকিত। অবশেষে হাকিম হুমামকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আমার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি দয়া ও যত্নপূর্ব্বক কিছুমাত্র গোপন না করিয়া আমাকে বলিলেন যে, যদি আমি এরূপ ভাবে আর ছয় মাস সুরাপান করি, তবে আমার অবস্থা সংশোধনের অতীত হইবে। তাঁহার পরামর্শ উত্তম এবং জীবন মূল্যবান্। তাঁহার বাক্যে আমার অনেক উপকার হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমি সুরার পরিমাণ হ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু আমি ফুলহা (ভাঙ্গ) সেবন

করিতে আরম্ভ করি। সুরার মাত্রা হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভাঙ্গের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়াছি, এবং দুই ভাগ দ্রাক্ষারস এবং এক ভাগ আরক মিশ্রিত করিয়া আমার পানীয় সুরা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়াছি। প্রত্যহ মাত্রার পরিমাণ হ্রাস করিয়া সাত বৎসর মধ্যে ছয় পেয়ালায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছিলাম; ইহার প্রত্যেক পেয়ালা সুরার পরিমাণ সোয়া আঠার মিস্কাল। বিগত পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ আমি এই পরিমাণ পান করিতেছি, ইহা অপেক্ষা কম বা বেশী পান করি না।”

জাহাঙ্গীরের যত দোষই থাকুক না কেন, তাঁহার স্বভাব মধুর ও অমায়িক, এবং হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও সরল ছিল। আমরা এস্থানে তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ের একটি উদাহরণ প্রদান করিতেছি। শাহাজাদা খুসরুর মাতা পাদশাহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। খুসরু বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলে তিনি মনোকষ্টে আত্মহত্যা করেন। এই উপলক্ষে পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, “কিরূপে আমি তাঁহার সদ্‌গুণরাজি ও অমায়িক স্বভাবের বর্ণনা করিব? তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, এবং আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা এরূপ ছিল যে, তিনি আমার একগাছি কেশ রক্ষার জন্য সহস্র পুত্র অথবা ভ্রাতাকে উৎসর্গ করিতে পারিতেন। * * * তিনি আমার প্রথমা মহিষী, আমি তাঁহার সঙ্গে বাল্যকালে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। খুসরুর জন্মের পরে আমি তাঁহাকে শাহ বেগম উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যু আমাকে এতদূর অভিভূত করিয়াছিল যে, আমি জীবনে যত্নহীন এবং আমোদ আহ্লাদে বীতস্পৃহ হইয়াছিলাম। ক্রমাগত চারি অহোরাত্র আমি গভীর শোকে ও দুঃখে জর্জ্জিত হইয়া পানাহারেও যত্ন করি নাই।”

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরাজগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। তদানীন্তন ইংলণ্ডপতি এই বণিকদলকে কোন কোন স্বত্ব প্রদান জন্য পাদশাহকে অনুরোধ করিতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূত সুপ্রসিদ্ধ সার্ টমাস রো। তিনি আপনার দৌত্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও জাহাঙ্গীরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি।

সার্ টমাস রো লিখিয়াছেন, "সিংহদ্বার সংলগ্ন প্রাঙ্গণাভিমুখী গবাক্ষপথে পাদশাহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপনীত হইয়া জনসাধারণকে দর্শন দেন। তাহার নিম্নে রেলের ভিতরে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন। * * * তিনি সান্ধ্য ভোজনের পর রাত্রি আট ঘটিকার সময় গোসলখানায় উপস্থিত হইয়া মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করেন। এখানে গুণী ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই; এবং ইহাঁদের মধ্যেও প্রায় কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারেন না। এই স্থানে তিনি সকল বিষয়ে * * আলাপ করেন। পীড়া অথবা পান নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই বিজ্ঞাপিত হয়। কারণ, সমস্ত প্রজা তাঁহার ক্রীতদাস-তুল্য। এজন্য তিনিও তাহাদের নিকট পারস্পরিক ভাবে এক প্রকার দাসত্বে আবদ্ধ; কারণ, এই সময় ওরীতি তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিপালন করেন যে, পাদশাহকে একদিন দেখিতে না পাইলে, এবং তাঁহার অনুপস্থিতির উপযুক্ত হেতু প্রদর্শিত না হইলে, প্রজাবর্গ বিদ্রোহ অবলম্বন করিতে পারে। মঙ্গলবারে তিনি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পাদশাহ দীনতম প্রজার অভিযোগও অগ্রাহ্য করেন না; এবং বিচারকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করাই তাঁহার নিয়ম।"

সার্ টমাস রোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই পাদশাহ তাঁহার প্রার্থনা-মত বণিকদলকে অভীপ্সিত স্বত্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু রাজমহিষী নূরজাহান, মন্ত্রী আসফ খাঁ ও শাহজাদা প্রবেজ বিরুদ্ধাচরণ করাতে সার্ টমাস্‌কে তিন বৎসর মোগল দরবারে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। পাদশাহের দরবারে তিনি কি ভাবে গৃহীত হইতেন, তাহার একদিনের বিবরণ আমরা এখানে প্রদান করিতেছি। রো অভিযোগ করিতেছিলেন, এবং আসফ খাঁ দ্বিভাষীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বিভাষী রো সাহেবের বাধ্য; সুতরাং আসফ খাঁর চক্ষু সঞ্চালন ও ইঙ্গিত নিষ্ফল হইতেছিল। পাদশাহ তাহা বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ কোপান্বিত হইয়া উঠেন, এবং কে ইংরাজদূতের কি অন্যায় করিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। পাদশাহ স্বীয় পুত্রের নাম শ্রবণ করিয়া অনুমান করেন যে, রো সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিতেছেন। আসফ খাঁ কম্পিত হইতে-ছিলেন, এবং তাঁহাদের সকলেই হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। পাদশাহ রাজকুমারকে গুরুতর ভর্ৎসনা করিয়া নিজে ত্রুটি স্বীকার করেন। এই বাক্‌বিতণ্ডার পরে তিনি গাত্রোত্থান করেন, এবং সেই সময় রো সাহেবকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে বলেন।

আমরা এখানে আর এক দিনের ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করি-তেছি। একদিন রাত্রিকালে রাজদূত শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় পাদশাহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। টমাস রোর নিকট একখানি চিত্র ছিল, তিনি তাহা পাদশাহকে দেখান নাই। পাদশাহ এবিষয় অবগত হইয়াই তাঁহাকে হঠাৎ আহ্বান করিয়া পাঠান। ইহা তাঁহার পরলোকগত প্রণয়িনীর চিত্র; তিনি ছবিখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পাদ-শাহের সন্নিধানে গমন করেন। রো সাহেব যে সময় পাদশাহের কক্ষে

প্রবেশ করেন, তখন তিনি পারিষদ্‌বর্গের সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপানে নিরত ছিলেন। চিত্রখানি প্রদর্শিত হইলে পাদশাহ তাহা নিজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রো প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে ছবিখানি পাদশাহকে উপঢৌকন দিলেন। সম্রাট তাঁহাকে প্রশংসমান চক্ষে জিজ্ঞাসা করেন, "ঈদৃশ লোকললামভূতা অপরূপ সুন্দরী কি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন?" রো প্রত্যুত্তরে বলেন, "হাঁ, কিন্তু এই চিত্রে সে মহীয়সী মহিলার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই।" পাদশাহ বলেন, "তুমি ইহা আমাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করিয়াছ, আমি পুরাঙ্গনাদের দ্বারা ইহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইব। তার পর তোমার নিকট আসল ও নকল উভয়ই উপস্থিত করিব। যদি তুমি আসলখানি বাহির করিতে পার, তবে তুমি উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।" রো প্রত্যুত্তরে বলেন, "যথার্থই আমি চিত্রখানি আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করিয়াছি, এবং আশা করি, উহা আর প্রত্যর্পিত হইবে না।" ইহাতে পাদশাহ বলেন, "প্রেমাস্পদের প্রতি তোমার অবিচলিত ভাল বাসার জন্য তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা আমার অধিক প্রীতিভাজন হইলে।"

ইংলণ্ডের অধিপতি পাদশাহকে একখানি বিলাতী শকট প্রদান করেন। পাদশাহ এই অভিনব সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া একান্ত প্রীত হন, এবং ওমরাহবর্গের প্রত্যেককে এক এক খানা করিয়া তদনুরূপ শকট প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। অশ্বচতুষ্টয়ের সাহায্যে এই শকট চালিত হইত। এই সকল অশ্বের সাজ সজ্জা স্বর্ণ মণ্ডিত ছিল। পাদশাহ শকটে আরোহণকালে অত্যন্ত চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। রো সাহেব বিলাতী অভিনেতার পরিচ্ছদের সঙ্গে পাদশাহের এই বেশের তুলনা করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীর প্রবেজের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগের বিষয় পরিশ্রুত হইয়া ক্রুটী স্বীকার করিবার জন্য আর একবার রাজদূতকে আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি উপনীত হইলে, জাহাঙ্গীর মুসা, যিশু ও মোহাম্মদের অনুশাসন সম্বন্ধে বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর তিনি সুরাপানে সরলচিত্ত হইয়া হইয়া রোকে বলেন, "আমি একজন পাদশাহ, তুমি সাদরে গৃহীত হইবে।" জাহাঙ্গীর খৃষ্টান, মুর, ইহুদি কাহারও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি সমভাবে সকলের সমাদর করিতেন। তিনি তাহাদিগকে অন্যায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল ছিলেন। সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া তিনি নানারূপ রিপুর বশীভূত হইয়া পড়িতেন, এবং তদবস্থায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রমত্ত অবস্থা তিরোহিত হইত। প্রাতঃকালে তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিত, এবং তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি পুনর্ব্বার নিজের আয়ত্ত হইত।

বস্তুতঃ, সার্ টমাস রোর অঙ্কিত চিত্রে জাহাঙ্গীরের মাধুর্য্যপূর্ণ বিলাসপটু মদিরাশক্ত প্রকৃতি বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

জাহাঙ্গীর পাদশাহ মোগল সাম্রাজ্যের সুশাসন জন্য কতিপয় অনু-শাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি তৎকালীন মোসলমান সমাজে একজন বিচক্ষণ রাজনীতি বিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আমরা তাঁহার অনুশাসনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

প্রথম অনুশাসন।

"আমি তমঘা ও মিরবারি নামক শুল্ক গ্রহণের প্রথা রহিত করি-য়াছি। সুবা ও সরকারের জায়গীরদারগণ আপনাদের স্বার্থের জন্য

নানারূপ কর সংগ্রহ করিতেন, আমি তাহাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছি।"

বাবর ও আকবর উভয়েই তমঘা ও মিরবারি নামক শুল্ক গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। পাদশাহগণ পুনঃ পুনঃ একই প্রকার অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন; ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, প্রথমে যিনি ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি স্ব-প্রণীত নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী পাদশাহগণ পূর্ব্বপুরুষের যশঃপ্রভা ম্লান করিয়া আত্মগৌরব বর্দ্ধন করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। বাবর ও আকবরের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তার সময়েই যদি তাঁহাদের কৃত অনুশাসন প্রতিপালিত না হইয়া থাকে, তবে দুর্ব্বলচিত্ত জাহাঙ্গীর যে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় অনুশাসন।

"দস্যুসঙ্কুল পথপার্শ্বের নির্জ্জনাংশে সরাই ও মসজিদ জায়গীরদারের ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিতে ও খালেসা ভূমির সরাই ও মসজিদ নির্ম্মাণের ব্যয়-ভার রাজকোষ হইতে প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছি।"

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজপথ পার্শ্বে সরাই ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। সেরশাহ ও তদীয় পুত্র সেলিমশাহের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক সরাই ও মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব, জাহাঙ্গীর যতদূরে সরাই ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অল্প ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। (১)

---

(১) Salim Shah in the beginning of his reign issued orders that as the Sarais of Sher Shah were two miles distant from one another,

এই সময় রাজপথ সর্ব্বদা দস্যু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিত। পুরচজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, দস্যুভয়ে কেহ রক্ষকশূন্য হইয়া ঘরের বাহির হইতে পারিত না। সার্ টমাস রো আপন ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, নিরাপদে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করার জন্য তাঁহাকে সময় সময় কালবিলম্ব করিতে হইয়াছে। বোম্বাই হইতে সুরাট ত্রিশক্রোশ পথ; এই পথে সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিত; এ পথেও পথিকগণ সর্ব্বদা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও সর্ব্বস্বহৃত হইত। এমন কি, আগ্রা লাহোরের প্রসিদ্ধ পথেও দস্যুর অভাব ছিল না। জন ব্রোথার ও রিচার্ড ষ্টিল নামক পরিব্রাজকদ্বয় লিখিয়াছেন যে, এই পথ রাত্রিকালে দস্যু সমাগমে পূর্ণ হইত, কিন্তু দিবাভাগে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেকালে রাজপথ পার্শ্বে সরাই না থাকিলে পর্য্যটন অথবা বাণিজ্য অচল হইয়া পড়িত। টেরী নামক একজন বৈদেশিক পর্য্যাটক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে ভ্রমণকারিগণের বাস জন্য পান্থশালার একান্ত অভাব ছিল; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ নগরে সরাই নামক সুদৃশ্য অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইত। ধনশালী হিন্দুগণ আপনাদের ধনের কিয়দংশ রাজপথ পার্শ্বে সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ খননে ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। অতএব ভ্রমণকারি-গণের আশ্রয় জন্য যে সকল সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে রাজ-কোষের অর্থ কতদুর কার্য্যকর ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

---

one of similar form should be built between them for the convenience of the public ; and that mosque and reservior should be attached to them, and that vessels of water and of victuals, cooked and uncooked should be always kept in readiness for Hindu as well as Mahomedan Travellers.—*Tarikh-i-Baudini.*

তৃতীয় অনুশাসন।

"মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তিই পথ পার্শ্বস্থ পণ্যদ্রব্যের ভার খুলিতে পারিবেক না। কোন রাজপুরুষ মৃত মোসলমান অথবা হিন্দুর সম্পত্তি দাবী করিতে পারিবেক না। তাহার উত্তরাধিকারীই পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদি কাহারও উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকে, তবে নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবে, এবং তাহার আয় সরাই নির্ম্মাণ, সেতু সংস্কার ও পুষ্করিণী খননে ব্যয়িত হইবে।"

উত্তরাধিকারিগণের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার আদেশ তৈমুরলঙ্গের অনুশাসনের পুনরুক্তি মাত্র। আকবর শাহ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়মের প্রচার করিয়াছিলেন।

"Let him look after the effects of deceased persons, and give them up to the relations or heirs or such, but if there be none to claim the property, let him place it in security, sending at the same time an account of such to Court, so that when the true heir appears he may obtain the same. In fine, let him act conscientiously and virtuously in this matter, lest it should be the same here as in the kingdom of Constantinople." *Gladwin's Ain-Akbari.*

কিন্তু আমীরগণ পরলোকগমন করিলে, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাজকোষে গ্রহণ করাই মোগল পাদশাহগণের সাধারণ নিয়ম ছিল; মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ পাদশাহের ইচ্ছামত পৈতৃক ধনের কিয়দংশ মাত্র প্রাপ্ত হইতেন, পাদশাহগণ সচরাচর তাহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতেন।

জাহাঙ্গীর পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আকবরের খোজাপ্রধান দৌলত খাঁ অসদুপায়ে অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর আকবর তৎসমুদয় বাজেয়াপ্ত করিয়া রাজকোষ স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তজকিরত-উল-উমরা নামক ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, এই ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের সপ্তম বর্ষে কালগ্রাসে পতিত হন। অতএব তাঁহার বিপুল ধনরাশি পিতার পরিবর্ত্তে পুত্রের হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। সার্ টমাস রো লিখিয়াছেন যে, কোন প্রজাই উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমি অধিকার করিতে পারিত না; রাজার ইচ্ছার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিত; এজন্য বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যত্র আয় তত্র ব্যয় করিতেন। বণিকগণ সযত্নে আপনাদের ধন সংগোপন করিয়া রাখিতেন। পাদশাহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সন্তানবর্গের ভরণপোষণ জন্য সামান্য ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন; রাজানুগ্রহ লাভ করিতে না পারিলে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত করিবার কোন উপায় থাকিত না। বন্দর সমূহে যথেচ্ছাচার পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। এমন কি, যদিও সার্ টমাস রো পরম সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি বন্দররক্ষক বলপূর্ব্বক তাঁহার দ্রব্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে বিরত হয় নাই।

চতুর্থ অনুশাসন।

"কেহ মদ অথবা অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না।"

জাহাঙ্গীর স্বয়ং আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া মদ্যপান করিতেন, সমস্ত সভাসদের সম্মুখেও মদ্যপান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। জাহাঙ্গীর

পাদশাহ খৃষ্টধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিহাসবেত্তা কাক্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মদ্যপান ও সর্ব্বপ্রকার মাংস আহার সম্বন্ধে খৃষ্ট শাস্ত্রে কোন প্রতিষেধ বিধি না থাকাতেই পাদশাহ তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর কথন কথন মদের আড্ডায় গমন করিয়া ইতর জাতীয় লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমোদপ্রমোদে মত্ত হইতেন। সার্ টমাস রো লিখিয়াছেন যে, চেপ্ছাইডের সমস্ত মণি অপেক্ষা ৪।৫ বাক্স লাল মদ জাহাঙ্গীর অধিক মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অনুশাসনকর্ত্তা নিজেই স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গে অগ্রগণ্য ছিলেন, এ অবস্থায় প্রকৃতিপুঞ্জ যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছে, তাহা কথনও সম্ভব নহে।

পঞ্চম অনুশাসন।

"আমি আদেশ করিয়াছি যে, কেহ বলপূর্ব্বক অন্যের গৃহে বাস করিতে পারিবে না। আমি বিচারকদিগকে আদেশ করিয়াছি যে, অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, অপরাধীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া শাস্তিবিধান করা হইবে না। আমি নিজেও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।"

এই নিয়মও জাহাঙ্গীরের নিজের উদ্ভাবিত নহে। ইহার পূর্ব্বে আকবর শাহ এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধোপলক্ষে মহাবত খাঁ দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন; এই সময় পাদশাহ শাহজাদা প্রবেজের বাস জন্য অনুপস্থিত সেনাপতির পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ, জাহাঙ্গীর নিজেই স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করেন। সার টমাস রো স্বরচিত বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, পাদশাহ একবার কোন কারণে আজমীর সহরের সমগ্র লস্করে অগ্নি প্রদান করাতে

তিনি বাসভবন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। সমস্ত লস্কর ভস্মীভূত ও উচ্ছিন্ন হইয়াছিল; এবং তাহাতে বহুসংখ্যক নিরপরাধ দরিদ্র প্রজা গৃহহীন হয়। জাহাঙ্গীর একবার কোন কারণে রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা মান্দু নগরের অনেক প্রজাকে স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন।

জাহাঙ্গীর নাসা কর্ণচ্ছেদন করিয়া কাহাকেও শাস্তি দেন নাই। কিন্তু তদপেক্ষা কঠোর শাস্তি দিয়া তিনি ক্রূরতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ ইলিয়ট সাহেব তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না। কাহাকেও শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হইত, কেহ বা সর্পদংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিত, কাহাকেও বা জীবিত অবস্থাতেই ভূপ্রোথিত করা হইত। অপরাধীর প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য নানাবিধ নিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। হস্তীর পদতলে মর্দ্দিত করিয়া প্রাণসংহার করার নিয়মই অধিকাংশস্থলে অনুষ্ঠিত হইত। জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি খান-ই দৌওরনের পুত্রের অসম্মানসূচক বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া জীবিত অবস্থাতেই তাহার চর্ম্ম তুলিয়া লইয়াছিলেন, এবং নগরবাসীদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য সেই মৃতদেহ নগরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন। হাসনবেগ ও আবদুল রহিম নামক দুইজন রাজদ্রোহীকে বধ করিবার জন্য যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অনুশাসন।

"আমি আদেশ করিয়াছি যে, রাজপুরুষ অথবা জায়গীরদারগণ আমার প্রজাবর্গের ভূমি হরণ করিতে, অথবা আত্মস্বার্থের জন্য উহা আবাদ করিতে পারিবে না।"

সপ্তম অনুশাসন।

"আমি রাজ্য সংস্পৃষ্ট আমিন ও জায়গীরদারগণকে আমার অনুমতি ব্যতীত আপন আপন শাসিত প্রদেশের প্রজাগণের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছি।"

অষ্টম অনুশাসন।

"আমি রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছি। পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত রাখিতে এবং তাহার সমগ্র ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করিতে আদেশ করা হইয়াছে।"

নবম অনুশাসন।

"আমি পিতার অনুকরণে আমার জন্মদিনে জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার সিংহাসন আরোহণের দিন বৃহস্পতিবার এবং পিতার জন্মদিন রবিবারেও জীবহত্যা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পিতা এই দিনকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেন। এই দিন সূর্য্যের নামে উৎসৃষ্ট, কেবলমাত্র এই জন্যই যে, তিনি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে; রবিবার সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াও তিনি এই দিন অত্যন্ত পবিত্র মনে করিতেন। এজন্য তিনি রবিবারে জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।"

জাহাঙ্গীর এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। সমস্ত মোসলমান জাতি রমজান মাসের উপবাসকে একান্ত পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করে; কিন্তু তিনি উহা লইয়া বিদ্রূপ করিতেন। যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ মোসলমান এসলাম ধর্ম্মের অনুশাসন পালন করিতে একান্ত তৎপর ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানে সহকারী করিয়া তুলিতেন, এবং তাহাতে অপরিসীম কৌতুক লাভ

করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তৃগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা ভাক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন; তাঁহাদের উপদেশবাক্যে বিরক্ত হইয়া তিনি একদা জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ ধর্ম্মে মদ্যপান ও বিনা বিচারে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে। প্রত্যুত্তরে একমাত্র খৃষ্টান ধর্ম্মে মদ্যপান ও বিনা বিচারে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে, অবগত হইয়া তিনি বলেন, "তাহা হইলে আমরা খৃষ্টান ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইব। দর্জ্জি আনয়ন করিয়া আমাদের আচকান থাট কোটে ও পাগড়ী টুপিতে পরিবর্ত্তিত করা হউক।" এই বাক্যে ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তৃগণ মোসলমানের অদৃষ্টে কি লিখিত আছে, তাহা ভাবিয়া কম্পিত হন; এবং সকলেই একবাক্যে বলেন যে, পাদশাহ কথনও কোরাণের অনুশাসনে বাধ্য নহেন, এবং তিনি যথেচ্ছভাবে মদ্য-পান ও বিনা বিচারে মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন।

দশম অনুশাসন।

"পিতা যে সকল জায়গীর ও মনসব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা স্থির রাখিবার জন্য আমি আদেশ প্রদান করিয়াছি। কিয়ৎকাল অতি-বাহিত হইলে আমি মর্য্যাদানুসারে প্রত্যেকের মনসব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। অহিদী এবং পিতার ভৃত্যবর্গের বেতনও দশ হইতে বারতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজান্তঃপুরে মহিলাদের বৃত্তিও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বহুসংখ্যক সুবাদারকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন; আপনার প্রিয়-পাত্র ও সাহায্যকারীদিগকে নিয়োজিত করিবার জন্য কাহাকে কাহা-কেও পদচ্যুত করিয়াছিলেন। পদচ্যুত রাজপুরুষগণ রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক উৎকোচ প্রদান করিয়া এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পূর্ব্ব মর্য্যাদা লাভ করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। যাঁহারা সিদ্ধকাম হইতে

পারেন নাই, তাঁহারা রাজদ্রোহাচরণ করিয়াও আপন আপন লুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উদ্ধারের জন্য প্রয়াসী হন।

একজন বিদেশীয় পর্য্যাটক রাজান্তঃপুরের মহিলাদের বৃত্তি নির্দ্ধারিত অর্থ দিবার প্রণালীকে দরিদ্রকে ভিক্ষাদানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

একাদশ অনুশাসন।

"আয়মাভোগী ও মদ্দ-আশগণ (ইহাদের দ্বারা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী সৈন্যদল পূর্ণ ছিল) স্ব স্ব ফারমানের সর্ত্ত অনুসারে আপনাদের ভূমিতে স্থির থাকিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হিন্দুস্থানের বিশুদ্ধ সৈয়দ বংশোদ্ভব মির সদর জাহান পিতার অধীনে রাজধানীতে কিয়ৎকাল উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইনি প্রত্যহ দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।"

দ্বাদশ অনুশাসন।

"রাজ্যের যাবতীয় কারাগার ও দুর্গের বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে আদেশ করিয়াছি।"

উইলিয়ম ফিঙ্ক নামক একজন পরিব্রাজক জাহাঙ্গীরের মৃগয়া সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি। জাহাঙ্গীর মৃগয়া উপলক্ষে নবেম্বর মাসের প্রথমে রাজধানী হইতে বহির্গত হইতেন, এবং দেশাভ্যন্তরে ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ ব্যাপী স্থানে শিকার করিয়া মার্চ্চ মাসের শেষে গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। জাহাঙ্গীর শিকারের উপযোগী বন্যস্থান পরিবেষ্টিত করিয়া লইতেন। এই পরিবেষ্টিত স্থান মধ্যে মানুষই হউক, পশুই হউক, যাহা কিছু ধৃত হইত, তাহাই রাজকীয় শিকার বলিয়া গণ্য করিবার নিয়ম ছিল। ধৃত পশুর মধ্যে মনুষ্যের যাহা ভক্ষ্য থাকিত,

তাহা বিক্রয় করিয়া পাদশাহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। পাদশাহ শিকারলব্ধ মানুষগুলিকে ক্রীতদাসরূপে গণ্য করিয়া প্রতিবৎসর তাহাদিগকে কাবুলে প্রেরণপূর্ব্বক তাহাদের বিনিময়ে কুকুর ও বিড়াল গ্রহণ করিতেন। এই সকল লোক আচার ব্যবহারে পশুবৎ ছিল, এবং চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত; এই হেতুতে জাহাঙ্গীর তাদৃশ কঠোর ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু যাঁহার কয়েদির কষ্টেই সহানুভূতি ছিল, তিনি কিরূপে এই সকল লোকের সহিত কখন কঠোর ব্যবহার করিতেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

শাহজাহান।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর প্রাক্কালে শাহজাহান দক্ষিণাপথে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং রাজমহিষী নূরজাহান শাহজাহানের পরিবর্ত্তে আপনার হস্তক্রীড়নক শাহরিয়ারকে সিংহাসন প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্ন শারদীয় প্রভাতের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিষ্ফল হইল। তদীয় ভ্রাতা আসফ খাঁ জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু পাদশাহের মৃত্যুর পর তিনি নূরজাহানকে অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। শাহজাহানের দক্ষিণাপথ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে উপনীত হইতে কতিপয় সপ্তাহ অতিবাহিত হইবে, এই সময়ে রাজসিংহাসনশূন্য থাকিলে অন্তর্ব্বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, আসফ খাঁ মৃত খুসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। তাহার পর শাহজাহান আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইলে দাওয়ার বক্স নিহত হইলেন ; এবং শাহজাহান সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। (১)

---

(১) শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই নূরজাহান আসফ খাঁর হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ কিরূপভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে নূরজাহান পরলোক গমন করেন। শাহজাহান তাঁহার ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় অঙ্কলক্ষ্মীর সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত

আসফ খাঁ আপনার সমস্ত ঐহিক উন্নতির মূল কারণ নূরজাহানকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? শাহজাহান আসফ খাঁর পরম লাবণ্যবতী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কন্যারত্নের নাম আরজমন্দ বানু। ইহাদের পরিণয়কাহিনী বিচিত্র রসে ও প্রেমসৌরভে পরিপূর্ণ। আরজমন্দ বানু শাহজাহানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে একজন বিশিষ্ট আমীরের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। মোগল আমলে নওরোজ উপলক্ষে বিশাল রাজপুরীতে সৌন্দর্য্যলীলাময়ী ললনাদিগের বাজার বসিত। ইহার নাম খোস্‌রোজ, অর্থাৎ আনন্দের দিন। একবার এই রূপের হাটে রূপসীকুলরাজ্ঞী আরজমন্দ বানু উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাহজাহান এখানেই আরজমন্দ বানুর প্রথম সন্দর্শন লাভ করেন। তখন রূপের হাটের ভগ্নদশা। রূপমুগ্ধ শাহজাহান কিছু কিনিবার ছলে তাঁহার বিপণীর নিকট উপনীত হন। একখণ্ড মিছরী ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। রাজকুমার বহু অর্থের বিনিময়ে এই মিছরীখণ্ড ক্রয় করেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ অপেক্ষাও মহার্ঘ আপনার হৃদয় সেই অনিন্দ্যকান্তি কামিনীর চরণতলে সমর্পণ করেন। ইহার পর শাহজাহানের প্রগাঢ় অনুরাগের কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বানুর স্বামী রাজকুমারের অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক না

তেজস্বিনী ও গর্ব্বিতা ছিলেন বলিয়া ইহার পর আর কখনও রাজনৈতিক বিষয়ে বাক্যব্যয় করেন নাই। অধ্যয়ন, নির্জ্জনবাস ও আরামেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এই নির্জ্জনবাসকালে তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল, তাহাতে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সময় ধর্ম্মবলই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। বৈধব্যদশা উপস্থিত হইবার পর তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রত্নাভরণাদির পরিবর্ত্তে শুভ্র বস্ত্র পরিধান এবং মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বিধবার ন্যায় জীবনযাপন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত তদীয় মৃতদেহ জাহাঙ্গীর পাদশাহের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হইয়াছিল।

হইয়া, পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। বানু বেগম কমনীয় গুণরাজিতেও গরীয়সী ছিলেন। বানু কেবলমাত্র প্রেমসম্পদেই শাহজাহানকে ভাগ্যবান করেন নাই, তিনিই তাঁহার ললাটে রাজটীকা দীপ্ত করিবার মুখ্য কারণ। শাহজাহান রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া তাঁহাকে মমতাজ জেমানী, অর্থাৎ 'তৎকালের গৌরব' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহার অদৃষ্টে এই সুখভোগ ঘটে নাই। শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে বানু ইহলোক হইতে অপসৃত হন।

প্রিয়তমা মহিষীর অকালমৃত্যুতে শাহজাহান অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন, এবং যাবজ্জীবন তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়াবিরহবিধুর শাহজাহান কখনও রাজকার্য্য-উদাসীন, বিলাস-বিমুখ, অথবা আড়ম্বরবিতৃষ্ণ হন নাই।

মোগল পাদশাহগণ রাজ্যাভিষেকোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। উৎসবকালে পাদশাহগণের মহার্ঘ দ্রব্যভাণ্ডের সহিত 'তৌল' হইবার নিয়ম ছিল; 'তৌল' ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সেই দ্রব্যরাশি আমীর ওমরাহগণের মধ্যে বিতরিত হইত। শাহজাহান সমারোহের নানাবিধ অভিনব উপায় উদ্ভাবিত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পাদশাহগণের উৎসবক্রিয়া নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রথামত মহার্ঘ দ্রব্যভাণ্ডের সহিত 'তৌল' হন, তদ্ব্যতীত মণিমুক্তাপূর্ণ ভাণ্ড মস্তকোপরি সঞ্চালন করিয়া সম্মুখবর্ত্তী দর্শকগণকে প্রদান করেন। ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই উৎসব উপলক্ষে মণিমুক্তা, অশ্ব, হস্তী, অস্ত্র ও বস্ত্র ক্রয় করিতে শাহজাহানের এক কোটী ষাট লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

শাহজাহানের জন্মোৎসবও মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। মণি-

রক নামক এক জন উদাসীন শাহজাহানের জন্মোৎসবের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—উষা-সমাগমে দুর্গপ্রাকার হইতে শত কামান যুগপৎ গর্জ্জন করিয়া পাদশাহের জন্মদিনের ঘোষণা করিত। তাহার পর হইতেই সমারোহের আরম্ভ। গৃহে গৃহে আনন্দকোলাহল, সুনির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপথে নাগরিকগণের সুদৃশ্য বসনভূষণের শোভা, নগরের সর্ব্বত্র প্রমোদতরঙ্গ। কমনীয়কান্তি নর্ত্তকীর লাস্যলীলা ও বিচিত্র কৌতুকরঙ্গে শীত ঋতুর (শাহজাহান ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন,) স্বল্পায়ু দিবার অবসান হইত। অপরাহ্ণে পাদশাহ রাজকুমার ও আমীর ওমরাহগণে পরিবৃত হইয়া মাতৃদর্শনে গমন করিতেন। তথা হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাহজাহান সমস্ত সভাসদকে মহাসমারোহে ভোজসভায় সম্মিলিত করিতেন। তাহার পর তিনি শোভা ও সম্পদের আধার একটী সুসজ্জিত কক্ষে গমন করিয়া রৌপ্য, মণি-মুক্তা-সংবলিত স্বর্ণ, মহার্হ ওষধি, দুষ্প্রাপ্য মশলা, স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বসন ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন দ্বারা ক্রমান্বয়ে চারি বার 'তৌল' হইতেন। 'তৌল' ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পাদশাহ সমবেত দরিদ্রগণকে সেই দ্রব্যরাশি দান করিতেন।

কেবলমাত্র শূন্যগর্ভ বাহ্যাড়ম্বরেই শাহজাহানের শাসনকাল অতিবাহিত হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সময়েই মোগলসাম্রাজ্য উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। আকবর শাহ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকৃত করিয়া সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থা ও প্রজাহিতকর বিধানসমূহ প্রবর্ত্তিত করিয়া সুশাসনের সূত্রপাত করেন। শাহজাহানের অধ্যবসায়ে আকবরের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা পুর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অন্তর্ব্বিগ্রহ শাহজাহানের রাজত্বকালে

ছিল না; সমগ্র সাম্রাজ্যে অখণ্ড শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়; দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

পাদশাহ বিলাসপটু ও আরামপ্রিয় ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কখনও রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই, শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলাবিধানে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। তিনি রাজকর্ম্মচারী নিয়োগকালে প্রতিভাশালী কার্য্যদক্ষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিতেন। এজন্য তাঁহার রাজত্বকালে শাসনবন্ধন কখনও শিথিল হয় নাই। পরন্তু তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় অভিনব সুবন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণাপথের জরিপের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোগল রাজত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক খাফি খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আকবর দেশ-বিজয়ে ও সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন; কিন্তু শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য-বিধানে ও রাজকার্য্যের সুচারু পরিচালনে ভারতবর্ষের কোনও নর-পতিই শাহজাহানের সমকক্ষ ছিলেন না।

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ট্যাভার্নিয়ার শাহজাহানের শাসনাধীন ভারত-বর্ষের সমস্ত তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, শাহজাহান অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করি-তেন। এই বিদেশী ভ্রমণকারীও পাদশাহের শাসনসম্বন্ধীয় দৃঢ়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শাহজাহানের সুশাসনে চোর-দস্যুর ভয় ও রাজপুরুষগণের অত্যাচার বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ ও সমৃদ্ধির অবধি ছিল না।

এই সুশাসনের ফলে রাজস্ব প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত ও রাজকোষ পূর্ণ হইয়াছিল। পরিপূর্ণ রাজকোষই রাজ্যের প্রধান শক্তি। শাহ-জাহান এইরূপ শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজকোষে

বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। একারণ পাদশাহ মুক্তহস্তে অজস্র ব্যয় করিতেন। দেশে অখণ্ড শান্তি বিরাজিত ছিল। সেই সময়ে বলদৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যকামী নরপতিগণ অকারণে দিল্লীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না; এবং বিদ্রোহ অশান্তিও রাজ্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে দক্ষিণাপথে যুদ্ধ হইয়াছিল। শাহজাহান ভারতের সীমান্তেও দীর্ঘকালব্যাপী সমরে লিপ্ত ছিলেন। আড়ম্বরপ্রিয় পাদশাহ রাজধানীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন ও শিল্পের উৎকর্ষসাধনে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। শাহজাহান প্রজা-পুঞ্জের হিতসাধন জন্য পূর্ত্তকার্য্যেও বিপুল অর্থব্যয় করেন। ফলতঃ, তাঁহার সময়ে রাশি রাশি অর্থ নানা পথে জলের মত ব্যয়িত হয়।

শাহজাহানের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথে তিনটি স্বাধীন মোসলেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল;—আমেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। আক-বরশাহ দক্ষিণাপথবিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমেদনগর রাজ্য ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করেন। আমেদনগরের অধী-শ্বরী চাঁদ সুলতানার লোকাতীত শৌর্য্যবীর্য্যে মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হয়। আক-বর শাহের পর জাহাঙ্গীর আমেদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শক্রসেনাপতি মালিক আম্বারের প্রতিকূলাচরণে তাঁহাকে বিফল-প্রযত্ন হইতে হয়। শাহজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে মালিক আম্বার কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুকালে রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ ও দুই লক্ষ পরাক্রমশালী সৈন্য সজ্জিত ছিল। বিজাপুরাধিপতি এব্রাহিম আদিল শাহ প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি সুদৃশ্য প্রাসাদাবলীর নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী সুশোভিত করিয়াছিলেন। সুদৃশ্য প্রাসাদমালার নির্ম্মাতা বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিখ্যাত

ছিলেন। এই সময় গোলকুণ্ডা রাজ্যের উন্নতির মধ্যাহ্ন। গোলকুণ্ডাধিপতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বলবৃদ্ধি ও প্রকৃতিপুঞ্জের অমিত সমৃদ্ধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহেও আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার অভিলাষী ছিলেন।

যুদ্ধানুরাগী শাহজাহান সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যত্রয় জয় করিবার কল্পনায় আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হইল, এবং তাহার ফলে শাহজাহান অচিরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষেই খাঁজাহান লোদী নামক একজন বিশিষ্ট সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া আমেদনগরের অধিপতির সহিত মিলিত হন। এই কারণে আমেদনগরের সহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাদশাহ স্বয়ং সৈন্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সাহস ও বীরত্বে আট বৎসরের সাধনার পর আমেদনগররাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদনগর বিধ্বস্ত হইলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অধিপতিদ্বয়ও ভীত হইয়া বশ্যতাস্বীকার ও রাজকর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাহমনীরাজ্যের ভগ্নাবশেষ দুর্ভেদ্য উপরাজ্যগুলি আংশিক বা পূর্ণভাবে বশ্যতাস্বীকার করায় মোগলের ভারতবিজয় সম্পূর্ণ হইল। কাবুল হইতে উড়িষ্যা এবং হিমালয় হইতে বেরার ও আমেদনগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মোগলের সিংহাসনতলে লুণ্ঠিত হইল।

আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ নিবারিত হইবার অব্যবহিত পরেই সীমান্তপ্রদেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বাবর পাদশাহ কাবুল রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তদীয় বংশধর দিল্লীর সম্রাটগণের আধিপত্যও উত্তরাধিকারক্রমে তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। "কিন্তু কাবুলের

উত্তরে বাল্ক ও বাদক্ষণ এবং পশ্চিমে কান্দাহার দিল্লীশ্বরদিগের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। বিশেষতঃ, বাল্ক বহুকাল হইতে মোগল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। শাহজাহান বাল্ক বিজয়ের জন্য রাজপুত-রাজ জগৎসিংহকে প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানে রাজপুতগণ অসাধারণ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজপুতগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তুষারপূর্ণ দেশে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। জগৎসিংহ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য আবশ্যকমত স্বহস্তে কোদালি ধরিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অবশেষে সম্রাট্ স্বয়ং কাবুলে আসিলেন, এবং তাঁহার সন্তান মুরাদ বাল্ক জয় করিলেন। কিন্তু অচিরে উজবেগগণ পুনরায় বাল্ক আক্রমণ করিল। এবার সম্রাটের আর এক পুত্র যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বাল্ক রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুদ্ধের গতি দেখিয়া, এবং সেই প্রদেশ অধিকদিন অধীনে রাখা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, অবশেষে শাহজাহান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন; বাল্ক ও বাদক্ষণ বিজিত হইল না।

"জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কান্দাহার প্রদেশ পারস্য-রাজের হস্তে পতিত হইয়াছিল, এখন শাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লীশ্বরের হস্তে পুনঃপতিত হইল। কিন্তু পারস্য-রাজ অচিরে আবার এই স্থান জয় করিলেন। তাহার পর আওরঙ্গজেব দুইবার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা একবার এই স্থান উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই। কান্দাহার দিল্লীশ্বরগণের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য স্খলিত হইল।" (১)

এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরাগ্নির ইন্ধনসংগ্রহ করিতে মোগল রাজভাণ্ডারের অসংখ্য অর্থের অপচয় হয়। কিন্তু এতদপেক্ষাও বিপুল অর্থ

(১) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজির গঠনে, কৃষিকার্য্যের সুবিধার্থ খাল-খননে ও রাজোপকরণ-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছিল।

শাহজাহান পাদশাহের আমলে ভারতবর্ষে স্থাপত্যকার্য্য উৎকর্ষের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী আরজমন্দ বানু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অলোকসামান্য তাজমহল নির্ম্মিত হয়। প্রিয়তমা মহিষীর স্মরণচিহ্ন জগতে অতুল্য শিল্পসৌন্দর্য্যময় করিবার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। বস্তুতঃ, তাজমহল নির্ম্মাণকালে পাদশাহের চক্ষে স্বর্ণমুষ্টি ও ধূলিমুষ্টিতে কোনও প্রভেদ ছিল না। তাজমহল রত্নাদিতে ভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে শাহজাহান বিপুল অর্থব্যয় করিয়া, বোগদাদ, আরব, সিংহল ও মিশর প্রভৃতি দূরদেশ হইতে মহার্ঘ প্রস্তররাশি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাজের নির্ম্মাণকার্য্যে প্রত্যহ বাইশ সহস্র শ্রমজীবী নিরত থাকিত। দশ বৎসরে (১৬২৮—৩৮) তাজ সম্পূর্ণ হয়। শাহজাহান প্রিয়তমা মহিষীর এই অপূর্ব্ব সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণে কিঞ্চিদধিক চারি কোটী মুদ্রা ব্যয় করেন। শ্লীমেন সাহেব সস্ত্রীক তাজ দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে পত্নীর মত জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, "তাজের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা অসাধ্য ব্যাপার। এরূপ একটী সমাধি মন্দিরলাভের আশায় আমি অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি।"

আকবর শাহ আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আগ্রা নগরী অত্যধিক উষ্ণ বোধ হওয়াতে শাহজাহান পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নূতন দুর্গ ও প্রাসাদ প্রস্তুত করেন। ইহার পূর্ব্বে পাদশাহগণ দিল্লীতে আগমন করিলে ইন্দ্রপ্রস্থের 'দীনপাল' নামক প্রাসাদে বাস করিতেন। কিন্তু সে প্রাসাদ জাঁকজমকপ্রিয়

শাহজাহানের মনঃপুত হইল না। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে অভিনব প্রাসাদের ভিত্তিপত্তন হয়, এবং ইহার দশ বৎসর পরে পাদশাহ নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের বিখ্যাত দেওয়ান-খাসে প্রথম দরবার করেন। এই নূতন রাজপ্রাসাদ শোভা ও সম্পদের আধার ও বিচিত্র স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিত। শাহজাহানের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা এনায়েত খাঁ লিখিয়াছেন, "সর্ব্বজ্ঞ পাদশাহের মনে আপনার মহান্ হৃদয়ের লালসাতৃপ্তির উপযোগী * * * সুদৃশ্য দুর্গ ও মনোরম হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণের জন্য যমুনা নদীর কূলে স্বাস্থ্যকর স্থান-নির্ব্বাচনের কল্পনা উদিত হয়। (বহু অনুসন্ধানের পর পাদশাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে ও সেলিমগড়ের মধ্যপথে স্থান নির্ব্বাচন করেন।) * * * পরিশ্রমপটু শ্রমজীবিগণ ভিত্তি খনন করিতে আরম্ভ করে, এবং ১০৪৯ হিজিরী অব্দের মহরম চাঁদের নবম দিনে রজনীযোগে এই সুন্দর হর্ম্ম্যরাজির প্রথম প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হয়। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের শিল্পিগণ, কারুনিপুণ ভাস্কর, রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধর, সকলেই অবশ্যপ্রতিপাল্য রাজাদেশে সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ষাট লক্ষ টাকা ব্যয়ে, পাদশাহের সিংহাসনারোহণের দ্বাবিংশতম বর্ষে রবিউলআওয়াল চাঁদের ২৪শে তারিখে, এই হর্ম্ম্যরাজির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়।"

সৌন্দর্য্যপিপাসু শাহজাহান দিল্লী ও আগ্রার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য তিনটী সুদৃশ্য ও সুশোভন মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। আগরার জুম্মা-মস্‌জিদের নির্ম্মাণকার্য্য ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তাহার পর আগরার মতি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয় উপাসনা গৃহই বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত। মস্‌জিদনির্ম্মাণে রাজকোষের বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দিল্লীনগরী শোভিত করিবার জন্য পাদশাহ জুম্মামস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। এই সুরম্য অট্টালিকা সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যগ্রাহী

কার্গুসন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—"অট্টালিকাটি সমুচ্চ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ; ইহার তোরণত্রয়, সম্মুখভাগ ও গম্বুজ-সমূহের এরূপ মনোরম সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গঠন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে যে, সমস্ত অট্টালিকা বৈচিত্র্য ও পারিপাট্যে পরিপূর্ণ।"

শাহাজাহান প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন। তিনি প্রজার হিতকল্পে বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য খাল খনন এবং দিল্লীবাসিগণকে নির্ম্মল পানীয় জল প্রদান, এই দুই অনুষ্ঠানই শাহজাহানের কীর্ত্তি। রাবি নদ হইতে সুবৃহৎ খাল খনিত হইয়াছিল। পাদশাহ-নামা নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, শাহজান স্বয়ং এই কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। খিজরাবাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত আর একটি খাল খনিত হয়। এই খালের জলে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শাহজাহানের যত্নে ও চেষ্টায় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে এক দিকে হিসার ও অন্যদিকে দোয়াবের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূমি সজলা হইয়াছিল ; ইহাতে বিশাল ভূখণ্ড ফলশস্যে পূর্ণ হয়, লক্ষ লক্ষ নর নারী দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

ভারতীয় মোসলমান রাজন্যকুলে শাহজাহানের ন্যায় আর কোনও নরপতিই ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না। তাঁহার সহচরবৃন্দের, তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের, তাঁহার দরবারের ব্যয় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি দরবার কক্ষের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য মহার্ঘ মণিমুক্তায় বিভূষিত ময়ূর-সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। শাহজাহানের সমসাময়িক আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন,—"কালক্রমে বহুসংখ্যক মহার্ঘ রত্ন রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছিল ; ইহার প্রত্যেকখানি সূর্য্যদেবের কটিবন্ধনী সুশো-

ভিত করিবার, অথবা ভিনস দেবীর কর্ণাভরণের উপযুক্ত। সম্রাটের সিংহাসনারোহণের পরে তাঁহার মনে উদিত হয় যে, এই সকল দুষ্প্রাপ্য মণি মুক্তায় কেবলমাত্র একটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; সে কার্য্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন! * * * এই জন্য রাজ-ভাণ্ডারে যে সকল মণি মুক্তা সঞ্চিত ছিল, তদ্ব্যতীত আরও দুই কোটী টাকা মূল্যের বিভিন্নশ্রেণীর রত্ন সংগ্রহ করিবার জন্য পাদশাহ আদেশ করেন। (তাহার পর) পাঁচ হাজার মিস্কল ওজনের ও আটষট্টি হাজার টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট মণি মুক্তা সহ এই সকল রত্ন স্বর্ণকার বিভাগের অধ্যক্ষ বিবাদল খাঁকে প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে চৌদ্দ লক্ষ টাকা মূল্যের এক লক্ষ তোলা (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মিস্কল) বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রদান করা হয়। সিংহাসন-খানি দৈর্ঘ্যে তিন গজ, প্রস্থে আড়াই গজ ও উচ্চতায় পাঁচ গজ। চন্দ্রাতপের বহির্ভাগে মীনাহ (enamel) কাজ করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে রত্ন বিন্যস্ত করিয়া ও অন্তর্ভাগ পদ্মরাগ মণি প্রভৃতি মহার্ঘ রত্ন দ্বারা ঘনভাবে অলঙ্কৃত করিয়া, সিংহাসন খানি মরকতবিনির্ম্মিত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্তম্ভের উপর দুইটি করিয়া রত্নবিভূষিত ময়ূর, এবং দুইটি ময়ূরের মধ্যস্থলে পদ্মরাগমণি, হীরা, মরকত ও মুক্তায় পরিশোভিত এক একটি বৃক্ষ বিরাজিত। সিংহাসনে আরোহণের জন্য মণিমুক্তাখচিত তিনটি সোপান। এই সিংহাসনের নির্ম্মাণকার্য্যে সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং এক কোটী মুদ্রা ব্যয়িত (মজুরী?) হইয়াছিল। সিংহাসনের গদী নির্ম্মাণ করিবার জন্য মণি মুক্তায় অলঙ্কৃত এগারখানি তক্তা ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাহার মধ্যস্থানীয় তক্তাখানি পাদশাহের উপবেশনের নিমিত্ত স্থাপিত। উহার গঠনে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

ইরাণের অধিপতি শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরকে এক লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একখানি পদ্মরাগ মণি উপহার দিয়াছিলেন; তাহাও এই মধ্যস্থলীয় তক্তায় বিন্যস্ত হইয়াছে। শাহজাহান দক্ষিণাপথ-বিজয় সম্পন্ন করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এই মণি প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করেন। ইহার পৃষ্ঠে তৈমুর, মীর শাহরুখ ও মীরজা উলুগ বেগের নাম খোদিত আছে। কালক্রমে ইহা শাহ আব্বাসের হস্তগত হইলে, তিনিও তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করেন। জাহাঙ্গীর এই মণিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নামসমূহের নিম্নে স্বীয় পিতার ও নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বর্ত্তমান পাদশাহের নামও ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।”

এত অপরিমিত ব্যয় সত্ত্বেও শাহজাহান কখনও অর্থের জন্য প্রজা-পীড়ন করেন নাই, অথবা রাজকোষের দৈন্যদশা উপস্থিত হয় নাই। এই জন্যই পাদশাহের কার্য্যের সমর্থন করা যাইতে পারে। শাহ-জাহান বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্যসমূহ এরূপ শৃঙ্খলাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, আমেদনগর-বিজয়ের, কান্দাহার অভিযানের, বাল্ক যুদ্ধের, অট্টালিকারাজি-নির্ম্মাণের, রাজকার্য্যের ও দুই লক্ষ নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কিঞ্চিন্ন্যূন নগদ ছয় কোটী টাকা রাজকোষে সঞ্চিত রাখিয়া যান। (১) এতদ্ব্যতীত

---

(১) মোগল পাদশাহগণ অর্থ সঞ্চিত করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, তন্মধ্যে অন্ততঃ একটি ন্যায়ানুমোদিত ছিল না। আমরা সে বিষয়টির উল্লেখ করিতেছি। মৃত আমীর ওমরাহগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা মোগল পাদশাহ-গণের চিরন্তন প্রথা। আকবর শাহ আমীর ওমরাহগণের সম্পত্তি গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু শাহজাহানের তাহাতে অরুচি ছিল না। এ সম্বন্ধে দুইটি কৌতুকাবহ ঘটনার বিবরণ আমরা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। লেইকনাম খাঁ নামক একজন বিশিষ্ট রাজপুরুষ অগাধ ধনের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইলে তিনি গোপনে এই ধনরাশি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন, এবং তাহার পর বহুসংখ্যক ছিন্ন পাদুকা, পুরাতন লৌহ, হাড় ও শততালিবিশিষ্ট বস্ত্র দ্বারা ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখেন।

রাশি রাশি মণি মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। বের্ণিয়ার সঞ্চিত মণি মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যরাশির মূল্যের পরিমাণ ছয় কোটী মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু খাফি খাঁর মতে, সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ চব্বিশ কোটী মুদ্রার ন্যূন ছিল না। খাফি খাঁর নির্দ্দেশ অতিরঞ্জিত নহে, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ বিদ্যমান।

শাহজাহানের রাজত্বকালে কেবল যে রাজভাণ্ডার স্ফীত, আগ্রা দিল্লী বিচিত্র সৌধমালায় সুশোভিত ও দরবারের জাঁকজমক বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধিও বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ম্যাণ্ডিস্লো আগ্রা নগরীকে আয়তনে ইস্পাহানের দ্বিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আগ্রা নগরীর সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুদৃশ্য পণ্যবীথিকা, অসংখ্য স্নানাগার ও পান্থশালার প্রভৃত প্রশংসায় আপনার গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন। মোগল শাসনকালে বহু-

---

তাঁহার মৃত্যুর পর পাদশাহ অর্থলাভাশায় ঔৎসুক্য সহকারে এই ধনভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়া একান্ত অপ্রতিভ হন। একজন ধনাঢ্য হিন্দু বণিকের মৃত্যুর পর তদীয় বিলাসপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল পুত্র পিতার ধনরাশি হস্তগত করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই বিলাসপরায়ণ অপরিপক্কবুদ্ধি যুবক সমস্ত সম্পত্তি অচিরে নষ্ট করিবে আশঙ্কা করিয়া তদীয় মাতা তাহাতে বাধা দিয়া নিজে সমস্ত ধন গ্রহণ করেন। বণিকপুত্র মাতার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে। পরলোকগত বণিক অনেক সময় রাজকার্য্যে নিরত থাকিতেন। শাহজাহান এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া বিধবা বণিকপত্নীকে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া সঞ্চিত ধনের একার্দ্ধ রাজকোষে অর্পণ করিতে আদেশ দেন। তদুত্তরে বিধবা বলেন, "আমার পুত্র তাহার পিতার ধনের দাবী করিতে পারে; অভিযোগকারী আমাদের পুত্র, কাজেই উত্তরাধিকারী। আমি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করি, আমার পরলোকগত স্বামীর সহিত জাঁহাপনার কি সম্পর্ক ছিল যে, জাঁহাপনা তাঁহার পরিত্যক্ত ধনের অর্দ্ধাংশ দাবী করিতেছেন?" পাদশাহ তাঁহার এই রহস্যপূর্ণ সরল বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন, এবং তাঁহার ধনরাশির একার্দ্ধ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করেন।

সংখ্যক বিদেশী ভ্রমণকারী এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরমালার ও অমিতফলশস্যপূর্ণ দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। ম্যাণ্ডিস্লোর বিবরণ হইতে গুজরাটের সমৃদ্ধির বিবরণ, গারক ও ব্রুটনের প্রবন্ধ হইতে বঙ্গ-বিহারের ধন ধান্যের কথা ও ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণকাহিনী হইতে সমগ্র দেশের ঐশ্বর্য্যের বিষয় জানা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের বর্ণিত সমৃদ্ধির বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু পরিত্যক্ত নগরমালার ভগ্নাবশেষ, হর্ম্ম্যরাজির ও জলপ্রণালীর চিহ্ন আজ পর্য্যন্তও নানা স্থানের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আধুনিক রাজপথের পার্শ্বে প্রাচীন পথের অবশেষ, কূপ ও পান্থশালার চিহ্ন পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। এই সকল ভগ্নাবশেষ মোগল শাসনকালের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। (১)

স্বচ্ছল রাজকোষ, শান্তিপূর্ণ দেশ, সমৃদ্ধ প্রজা লইয়াও শাহজাহান পূর্ণ সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারেন নাই। তদীয় পুত্রগণের

---

(১) আমরা শাহজাহান পাদশাহের রাজত্বের যে বর্ণনা করিলাম, তাহতে পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, তাঁহার আমলে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখশান্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছিল। তখনও রাজস্ব কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার একেবারে লুপ্ত হয় নাই, এবং কখন কখন কাজিগণের অর্থলোলুপতা নিবন্ধন বিচার-ব্যভিচারও সংঘটিত হইত। ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, শুল্কগ্রাহী কর্ম্মচারিগণ অত্যাচার করিয়া অর্থশোষণ করিত। ইহাঁরা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের খামখেয়ালির বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থান জঙ্গলে আবৃত ছিল। এই সকল স্থানে চোর ডাকাত নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিত। কখন কখন রাজপুরুষ অথবা সামন্তগণ বিদ্রোহী হওয়ায় দেশমধ্যে অশান্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িত। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও শাহজাহানের শাসনসময়ে দেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং তাঁহার রাজত্বকালেই মোগল গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন আকাশে উপনীত হইয়াছিল।

পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাবই ইহার কারণ ছিল। পাদশাহের চারি পুত্র ও দুই কন্যাছিল। পুত্র,—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ; কন্যা,—জাহানারা ও রোশেনারা। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে রাজকুমারগণ রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন।

কিশোরবয়স্ক আওরঙ্গজেব আপনার বয়সের তুলনায় প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়া পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র হন। স্নেহশীল পাদশাহ কখনও কোন রাজকুমারকে উপেক্ষা করেন নাই। তথাপি অপর রাজকুমারত্রয় আওরঙ্গজেবের প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হন। বিশেষতঃ, মদগর্ব্বিত উচ্ছৃঙ্খল সুজার পক্ষে পিতার এই পক্ষপাত অসহ্য হইয়াছিল। এজন্য তিনি রাজদরবার হইতে দূরে থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তদনুসারে পাদশাহ তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসব প্রদান করিয়া দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় রাজকুমার সুজা রাজসম্মান লাভ করাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা আপনাকে অপমানিত মনে করেন। পাদশাহ তাঁহার ক্ষুব্ধচিত্ত শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলেন, "দারা, রাজকুমারগণের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা আমার হৃদয়ের অধিক নিকটবর্ত্তী; এজন্য তোমাকে সন্নিধানে রাখিয়াছি।" কিন্তু দারা তাঁহার বাক্যে শান্ত না হওয়াতে তিনি তাঁহাকে ছয়হাজারী মনসব প্রদান করেন। সৌভ্রাত্র বহুকাল পূর্ব্বেই তৈমুরবংশীয় রাজকুমারগণের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। শাহজাহানের পুত্রগণও পরস্পরকে ঘৃণা করিতেন। রাজকুমারগণের মনোমালিন্য নিবন্ধন রাজসংসারে অশান্তির অবধি ছিল না। পাদশাহ ভ্রাতৃবর্গের মনোমালিন্যের মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে কার্য্যভার প্রদান করিয়া দূরদেশে প্রেরণ করেন। সুজা বঙ্গদেশের, আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের

ও মুরাদ গুজরাটের শাসন-কর্ত্তার পদলাভ করেন। দারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজসন্নিধানেই থাকেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় সুফল ফলিল না। রাজকুমারগণ সকলেই কার্য্যপটু ও শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিলেন। তাঁহারা ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশ-সমূহের শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়া ধনবলে ও জনবলে পরাক্রম-শালী হইয়া উঠিলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন অধিকার করিবার উপায়-উদ্ভাবনে নিরত হইলেন। তাঁহাদের অবিশ্রান্ত চক্রা-ন্তের ফলে রাজপুরুষগণ পাদশাহের জীবদ্দশাতেই এক এক পক্ষ অব-লম্বন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনাভিলাষী রাজকুমার-গণের সংঘর্ষ আরম্ভ হইবে, এবং তাহার ফলে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় পাদশাহের হৃদয়ে অশান্তির সীমা ছিল না।

এই প্রকার মানসিক অশান্তির সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পাদশাহ সহসা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। শাহজাহানের বার্দ্ধক্যকালে জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শেকোর হস্তে অধিকাংশ রাজকার্য্যের ভার পতিত হইয়াছিল। বের্ণিয়ার লিখিয়াছেন, "শাহজাহান দারাকে আদেশ প্রচার করিবার ও রাজসিংহাসনের নিম্নে ওমরাহ শ্রেণীর মধ্যে সিংহাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব বোধ হইত, যেন প্রায় সমানক্ষমতাপন্ন দুই জন রাজা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেছেন।" কাত্রু লিখিয়াছেন,—"তাঁহার (শাহজাহানের) জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যশাসন বিষয়ে অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। তিনি যদৃচ্ছা-ক্রমে হস্তীর ক্রীড়ার জন্য আদেশ প্রচার করিতে পারিতেন; এ ক্ষমতা-পরিচালনের অধিকার কেবলমাত্র পাদশাহগণেরেই ছিল।" শাহজাহান রোগাক্রান্ত হইলে দারা প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্যনির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় জনরব প্রচারিত হইল যে, শাহজাহান

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দারা শেকো পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ও একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই জন্য প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকেই মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, এবং তিনি নিজেও মনে মনে আপনাকে ভাবী সম্রাট জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অপর রাজকুমারগণও তক্ত-তাউসে অধিরোহণ করিবার আশায় জলাঞ্জলি দেন নাই। শাহজাহান পীড়িত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা তদুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে রাজকুমারত্রয় স্ব স্ব শাসিত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া শোণিতলোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে, পাদশাহ জীবিত আছেন। তথাপি তাঁহারা রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজকুমারত্রয়ের মধ্যে সুজাই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এ জন্য দারা শেকো সর্ব্বাগ্রে তাঁহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। বারাণসীর সন্নিকটে উভয় সৈন্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সুজা রাজসৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

সুজা পরাস্ত হইলে রাজসৈন্য আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্সকে শিক্ষা দিবার জন্য ধাবিত হইল। আওরঙ্গজেব দেখিলেন যে, রাজসৈন্য পরাজিত করিতে পারিলেও তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। মুরাদ বক্স তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং সুজা রাজসৈন্যের পরাক্রমে নিস্তেজ ও হীনবল হইলেও, পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় সচেষ্ট। এই জন্য আওরঙ্গজেব নিজের প্রকৃত মনোভাব গুপ্ত রাখিয়া কৌশলে মুরাদকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাজসিংহাসন অধিকার করিবার মানস করিলেন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি মুরাদকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি রাজত্বের প্রয়াসী নহি। বিধর্ম্মী দারা ও ব্যসনরত সুজা সিংহাসনে

আরোহণ করিতে না পারিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। একমাত্র তুমিই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। আমার ইচ্ছা, তোমাকে সাহায্য করি। তুমি সিংহাসনে আরোহণ করিলেই আমি ফকিরী গ্রহণ করিব। ভাই! তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার অনুমতি দাও।" মুরাদ বক্স আওরঙ্গজেবের ছলনায় প্রতারিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, এবং উভয় ভ্রাতা একত্র আগ্রার সন্নিধানে উপনীত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত (১) ও বৃদ্ধ পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া, রাজধানী অধিকার করিলেন। দারা শেকো শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার আশায় সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করিলেন।

আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্স দারার অনুসরণ করিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। সরলহৃদয় মুরাদ শৌর্য্যবীর্য্যে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি আন্তরিক সাধুতা ও সত্যানুরাগ নিবন্ধন মহাত্মা সাদির উপদেশবাক্যে

---

(১) ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের জুনমাসের প্রথম ভাগে চাম্বল নদীর তীরে সামগড় (যুদ্ধের পর এইস্থানে ফতেবাদ নামপ্রাপ্ত হয়, ফতেবাদ শব্দের অর্থ,—বিজয় স্থান) নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বিজয়শ্রী প্রথমে দারার দিকে হেলিয়া পড়েন। আওরঙ্গজেবের সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, কেবল মাত্র এক সহস্র সৈন্য তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে। এই দারুণ সঙ্কটকালেও আওরঙ্গজেবের স্থিরবুদ্ধি ও অসম সাহস তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল না। তিনি পরাজয় আসন্ন দেখিয়াও পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে বন্ধুগণ! নিরুৎসাহ হইও না, ঈশ্বর আছেন; পলায়ন করিলে কোন ফললাভ হইবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল দক্ষিণাপথ এখান হইতে কত দূর, তাহা স্মরণ করিও। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন।" এই উৎসাহবাক্য শেষ হইলে তিনি নিজের যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগের উপায় তিরোহিত করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় হস্তীর পদদ্বয় শিকল দ্বারা বন্ধন করিতে আদেশ করেন। এই আদেশে সৈন্যবৃন্দের অবসন্ন প্রাণে তাড়িত সঞ্চারিত হয়, তাহারা প্রভুর কার্য্যে আত্মবিসর্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়া প্রবল বেগে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর বিজয়লক্ষ্মী আওরঙ্গজেবের অঙ্কশায়িনী হন। এই যুদ্ধে মুরাদ বক্সও প্রবল পরাক্রম ও বিপুল সাহস প্রদর্শন করিয়া অসংখ্য শত্রুসৈন্য নাশ করেন।

অবহেলা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের তোষামোদবাক্যে ও মহার্ঘ উপঢৌকনে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মথুরায় উপনীত হইয়া তিনি এই সরল ব্যবহারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ প্রদর্শন পূর্ব্বক মুরাদকে বন্দী করিয়া স্বয়ং রাজমুকুট ধারণ করিলেন। রাজ-কুমারের পদদ্বয় রৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে সেলিমগড়ের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেমিলগড়ের পথে প্রেরিত হস্তী ব্যতীত আর তিনটি সুসজ্জিত হস্তী অন্য তিন দিকে প্রেরিত হইল। রাজকুমারের পক্ষপাতী সৈন্যগণ পথিমধ্যে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব এইরূপ সতর্ক হইয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই সুজা পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। আওরঙ্গজেব দারার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া সুজাকে বিদূরিত করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। বহুক্ষণব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী সুজার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। আওরঙ্গজেব যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য্য দেখিয়া, বঞ্চনাবলে জয়লাভ করিবার কল্পনা করিলেন। তাঁহার কৌশলে সুজার দক্ষিণবাহুস্বরূপ আলীবর্দ্দী খাঁ প্রলুব্ধ হইয়া সুজাকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিবার পরামর্শ দিলেন। সুজা আলীবর্দ্দীর মন্ত্রণাক্রমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। আওরঙ্গজেব এই সংবাদ অবগত হইয়া জয়বাদ্যবাদনের আদেশ দিলেন। সুজার সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ও সুজাকে হস্তিপৃষ্ঠে না দেখিয়া মনে

করিল যে, তাহাদের প্রভু সুজা নিহত হইয়াছেন, এবং আওরঙ্গজেব জয়লাভ করিয়াছেন। তখন তাহারা রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া, যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। সুজার পরাজয় এরূপ গুরুতর হইল যে, তাঁহার পুনরভ্যুত্থানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। (১) তদবধি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে,"সুজা জিৎ বাজী আপনা হাতে হারা।"

সুজা সমূলে বিনষ্ট, দারা সিন্ধু প্রদেশে নির্ব্বাসিতপ্রায়, মুরাদ গোয়ালিয়ারের অন্ধকার কারাগারে বন্দী, তথাপি আওরঙ্গজেব আপনাকে নিরাপদ মনে না করিয়া পুনর্ব্বার দারার অনুসরণ করিলেন। দারাও শক্তিসঞ্চয় করিয়া আওরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া বেগম, শাহজাদী ও কতিপয় অনুচরের সহিত আমেদাবাদের অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এই সময় দারার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। পথিমধ্যে কৃতঘ্ন অনুচরগণ তাঁহার ধনসামগ্রী লুণ্ঠন ও শাহজাদীগণের গাত্রাভরণ অপহরণ করিল। মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী দারা নিরাপদ হইবার আশায় দুর্ব্বিষহ পথকষ্ট তুচ্ছ করিয়া আমেদাবাদে উপনীত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য মোসলমান শাসনকর্ত্তা আওরঙ্গজেবের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয়প্রদান করিলেন না। এই সংবাদ দারার নিকট পঁহুছিলে মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পাষাণও বিগলিত হইল। দারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি পরিত্রাণের আশায় সামান্য পদস্থ সৈনিকের সহিতও পরামর্শ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই

---

(১) সুজা আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হন। তথায় তিনি পুনরায় বলসংগ্রহের চেষ্টা করেন; তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া আরাকাণ রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু নিষ্ঠুর আরাকাণ-রাজের আদেশে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন।

কোন সদুপায়ের উদ্ভাবন করিতে পারিল না। দারা নিরুপায় হইয়া তদ্দেশীয় দস্যুদলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহাদের যত্নে তিনি গুজরাট উত্তীর্ণ হইয়া কচ্ছদেশের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে স্থানীয় জমীদারের আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কচ্ছের জমীদার পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এই স্থান হইতে দারা বাষ্পাকুললোচনে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি নানা স্থানে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে তিনি ধান্দরের অধিপতি মালিক জিওয়ানের (১) নিকট উপনীত হইলেন। মালিক জিওয়ান তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে আশ্রয়প্রদান করিল; কিন্তু গোপনে তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজানুগ্রহলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। মালিকের আশ্রয়গ্রহণ করিবার কয়েক দিন পরেই দারার মহিষী অনাহার ও পথের কষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দারা মহিষীকে লাহোরে সমাহিত করিবার জন্য অধিকাংশ অনুচরবর্গকে মৃতদেহ সহ তথায় প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং মালিকের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সুযোগে মালিক তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার মনন করিল। দারা নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময় মালিক তাঁহাকে ও তদীয় কনিষ্ঠ কুমার সেপের শেকোকে বন্দী করিবার জন্য অনুচরগণ সহ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মালিক সেপের শেকোকে ধৃত করিতে উদ্যত হইলে, তিনি বিপুল সাহসে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তীর ও ধনু গ্রহণ করিয়া তিন জন অনুচরকে ভূশায়ী করিলেন। সেপের

(১) ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এই ব্যক্তিকে জুনের অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা খাফিখাঁর ইতিহাসের অনুসরণ করিলাম।

শেকো একে বালক, তাহাতে শত্রুগণ সংখ্যায় অধিক; সুতরাং তিনি অচিরে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; মালিক তাঁহাকে 'পিছমোড়া' করিয়া বন্ধন করিল। এই গোলযোগে দারা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন; দেখিলেন, যে আশ্রয়দাতা, সেই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত! তিনি মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "কৃতঘ্ন! শীঘ্র তোমার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন কর। আমরা আওরঙ্গজেবের দুরকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছি; কিন্তু মনে রাখিও, তোমার জীবনদান ব্যতীত (১) আর কোনও পাপে আমি ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার যোগ্য নহি। আরও মনে রাখিও, কেহ কখনও কোন রাজকুমারকে 'পিছমোড়া' করিয়া বাঁধে নাই।" মালিক দারার বাক্যে বিচলিত হইয়া সেপের শেকোর বন্ধনমোচন করিয়া দিল, এবং তাঁহাদের পাহারার জন্য অনুচরবর্গকে নিযুক্ত রাখিল। ইহার পর মালিক তাঁহাদের ধনরত্ন অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল।

মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী অধিকারী বন্দিবেশে দিল্লীতে আনীত হইলেন; অতি সামান্য জীর্ণবস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে প্রকাশ্য রাজপথে পরিভ্রমণ করান হইল। নগরবাসিগণ দারার দুর্দ্দশা দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলে শোকাকুল হইল। তাহাদের কাতরধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত হইতে লাগিল। আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে মৌলবীগণ গুপ্তসভায় সমবেত হইয়া দারাকে বিধর্ম্মী স্থির করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

দারা কারাগারে রাজকুমার সেপের শেকোর সহিত অবস্থান করিতে-

---

(১) একবার শাহজাহান কোনও দুষ্কার্য্যের প্রতিফলস্বরূপ মালিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দারার অনুরোধে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন।

ছিলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইবার পর আওরঙ্গজেবের অনুচরগণ তাঁহার নিকট হইতে রাজকুমারকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। তিনি এই ঘটনায় মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া, শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে খৃষ্টধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি এক জন খৃষ্টধর্ম্মযাজককে কারাকক্ষে আনয়ন করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু এ অনুমতি পাইলেন না। এই দুর্দ্দশার সময় তিনি ঈশ্বরের করুণালাভের প্রয়াসী হইলেন। দারা একাধিকবার বলিয়াছিলেন, "মোহাম্মদ আমাকে বিনাশ করিয়াছেন, যীশু আমাকে রক্ষা করিবেন।" এই সময়ে নাজির নামক এক দুরাত্মা দারাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। দারার ছিন্ন মস্তক আওরঙ্গজেবের নিকট নীত হইল। আওরঙ্গজেব, যথার্থই দারার মস্তক কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং তাহার পর সেই শির কারারুদ্ধ পিতার নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। (১)

আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃগণের মধ্যে একমাত্র মুরাদ বক্স অবশিষ্ট রহিলেন। তিনিও গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। এই স্থানে সরস্থন বাই নাম্নী প্রিয়তমা উপপত্নী তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। প্রস্তরময় কঠিন কারাগারে তাঁহার দিন দীর্ঘনিশ্বাসে ও অশ্রুজলে অতিবাহিত হইতেছিল। কতিপয় অনুরক্ত মোগলের উদ্যোগে মুরাদ রজ্জুনির্ম্মিত সোপানের সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিবার বন্দোবস্ত

(১) বের্ণিয়ার লিখিয়াছেন,—আওরঙ্গজেব ছিন্নমস্তক-পরীক্ষান্তে বলেন,—"Ah (Ai) Bedbakt ! A wretched one ! let this shocking sight no more offend my eyes, but take away the head, and let it be buried in Humayon's tomb." আমরা এ স্থলে কাক্রর (মেনুসীর) অনুসরণ করিয়াছি।

করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী একাকিনী কারাগার মধ্যে অবস্থান করিতে অস্বীকৃত হইয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া উঠিল; মুরাদ আর পলায়ন করিতে পারিলেন না। এই ঘটনা আওরঙ্গজেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি মুরাদকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজবিপ্লবের সূত্রপাতকালে মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে তিনি একজন রাজপুরুষকে বধ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের জনৈক প্রসাদাকাঙ্ক্ষী অনুচর তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারাভিনয়ের পর মুরাদের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

শাহজাহান অবরুদ্ধাবস্থায় সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় ফরাসী পরিব্রাজক বের্ণিয়ার মোগল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনিও বলেন যে, আওরঙ্গজেব সযত্নে অবরুদ্ধ পিতার পরিচর্য্যা করিতেন, তাঁহার তৎকালীন ব্যবহার যথার্থই সম্মানব্যঞ্জক ও প্রীতিপূর্ণ বোধ হইত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এক স্বাধীনতা ব্যতীত আওরঙ্গজেবের পক্ষে পিতাকে অদেয় আর কিছুই ছিল না। তাঁহারা ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং পিতা পুত্রের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেও শাহজাহানের ভোগলালসার হ্রাস হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেন। আবার কখনও কখনও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা উপস্থিত হইত,—তখন তিনি মোল্লাগণকে কোরাণপাঠ করিবার আদেশ দিতেন!

শাহজাহানের বন্দিদশায় তদীয় প্রিয়তমা কন্যা জাহানারাই তাঁহার জীবনের আলোকস্বরূপিণী ছিলেন। ভক্তিমতী কন্যার প্রীতিপূর্ণ সেবা শুশ্রূষাই তাঁহার সান্ত্বনার হেতু হইয়াছিল। বেণিয়ার জাহানারাকে অনিন্দ্যসুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও পিতৃস্নেহপরায়ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শাহজাহান তাঁহাকে আদর করিয়া "পাদশাহ বেগম" উপাধি প্রদান করেন। কি গৃহস্থলীর তত্ত্বাবধান, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণা, সকল বিষয়েই শাহজাহান তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। জাহানারাও পিতার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে শাহজাহান কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনিও স্বেচ্ছায় কারাবাসিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিস্নিগ্ধ সেবাশুশ্রূষায় শাহজাহানের কারাক্লেশ যে বহুলপরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (১)

(১) "জাহানারা পিতার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। জাহানারার শেষজীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। * * * তাহারই পার্শ্বে মরি! মরি! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! যখন মোগলকুলের কংস আওরঙ্গজেব আপন পিতা শাহজাহানকে বন্দী করিলেন, তাঁহার কন্যা জাহানারা চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া পিতার সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কারাবাসিনী হন। তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মরকবর, মধ্যস্থান শ্যামল দুর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে একটি শ্বেত মর্ম্মরফলকে তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে:—

বহুমূল্য আভরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণশ্রেষ্ঠ আবরণ দীনাআত্মা জাহানারা
সম্রাট কন্যার।"

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

আলমগীর। (১)

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া ও ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হইয়া ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। যে সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য তিনি পাপে দ্বিধাশূন্য হইয়াছিলেন, এবং যাহার গৌরববৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের কামনায় আজীবন অক্লান্তভাবে সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগেই সেই সাম্রাজ্য অবনত হয়।

আকবরের অনন্য সাধারণ উদারতাগুণে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি হিন্দু মোসলমানকে প্রীতিসূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব পূর্ব্বপুরুষের অনুসৃত উদারনীতি পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ নীতির অনুবর্ত্তী হন; ইহার ফলে আকবর গ্রথিত প্রীতিসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, এবং মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসবীজ উপ্ত হয়।

আওরঙ্গজেব আকবরের উদারনীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে নীতির সমীচীনতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রকার দ্বিধা ছিল না। আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্য লাভের অব্যবহিত পরেই কারারুদ্ধ পিতাকে লিখিয়াছিলেন, "* * * শ্রেষ্ঠতম বিজেতাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নরপতি নহেন। পৃথিবীর বহুজাতি অনেকবার অসভ্য বর্ব্বর কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত রাজ্য সকল কতিপয় বৎসর মধ্যেই শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যিনি অপক্ষপাতে প্রজাপালন

---

(১) আওরঙ্গজেব সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আলমগীর (জগৎজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ইতিহাসে আওরঙ্গজেব নামেই সমধিক পরিচিত।

জীবনের সার ব্রত করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ নরপতি।” এরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব কি জন্য আকবর শাহের উদারনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপথাবলম্বী হইয়া সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যাটক বের্ণিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন, মোগল রাজকুমারবৃন্দের শৈশবশিক্ষার বন্দোবস্ত অতি কদর্য্য ছিল। খোজা প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবের হস্তে তাঁহাদের লালনপালনের ভার অর্পিত হইত। আওরঙ্গজেবের শৈশবকালও এই সকল জীবের কুসংসর্গেই অতিবাহিত হয়।

আওরঙ্গজেব ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পরে নূরজাহানের কুটিল চক্রে জাহাঙ্গীর পাদশাহের সঙ্গে শাহজাহানের মনোবাদ উপস্থিত হয়। শাহজাহান পিতার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই পরাজিত হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই ভাবে তিন চারি বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি অনন্যোপায় হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্ব্বক পিতার ক্রোধশান্তি করেন, এবং দক্ষিণাপথে নিরাপদে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সময় শাহজাহান স্বীয় সদ্ব্যবহারের প্রতিভূস্বরূপ পুত্র দারা ও আওরঙ্গজেবকে পিতার নিকট প্রেরণ করেন। একারণ আওরঙ্গজেব বাল্যকালেই পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। বালক আওরঙ্গজেব পিতামহের নিকট কিরূপ শিক্ষালাভ করেন, তদ্বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। সম্ভবতঃ নূরজাহানের বিদ্বেষকলুষিত তত্ত্বাবধানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেবের বয়স যখন ন্যূনাধিক নয় বৎসর, তখন জাহাঙ্গীর

কালগ্রাসে পতিত হন, এবং শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। শাহজাহান রাজপদ লাভ করিয়া আওরঙ্গজেবের শিক্ষার জন্য মোল্যা শালে নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। সমুচিত শিক্ষা দ্বারা বালকের চিত্ত ও চরিত্র গঠনের ক্ষমতা শালের ছিল না। তিনি কতিপয় বৎসর আওরঙ্গজেবকে আরবি ব্যাকরণ, নিরর্থক শব্দতত্ত্ব এবং নীরস দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া তাঁহার স্মৃতিশক্তি ভারগ্রস্ত করেন। শালে পৃথিবীস্থ বিভিন্ন জাতির বিবরণ,—তাহাদের সামরিক বল, তাহাদের শাসনপ্রণালী, তাহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে কোন উপদেশই আওরঙ্গজেবকে প্রদান করেন নাই। বিশ্রুতনামা সাম্রাজ্য সকলের অভ্যুদয় ও পতনের কারণ অথবা মানব-জাতির সুখ দুঃখের গূঢ় রহস্য,—আওরঙ্গজেব গুরুর নিকট ইহার কোন তত্ত্বই শিক্ষালাভ করেন নাই। রাজা প্রজার কি সম্পর্ক, এবং সে সম্পর্ক কি প্রকার পবিত্র, আওরঙ্গজেব যাহাতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য শালে এক দিনের নিমিত্তও যত্ন করেন নাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, যে শিক্ষা মনুষ্যের সম্মুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে "মহত্ত্ব ও মাধুরী এবং প্রীতি ও নীতির ভিন্ন ভিন্ন পটলে" অভ্যস্ত করে, তাহা আওরঙ্গজেবের ভাগ্যে ঘটিয়াছিলনা।

ফলতঃ, আওরঙ্গজেব কি শৈশবে, কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কোন কালেই সুশিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শিক্ষা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেও সম্যক অবগত ছিলেন। আও-রঙ্গজেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তদীয় শিক্ষাগুরু শালে পুরস্কার-লোভে তাঁহার নিকট উপনীত হন। এই সময় পাদশাহ তাঁহার শিক্ষা-দানের বহু ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া বলেন, "হে মোল্লাজি, আপনি স্বগ্রামে

প্রস্থান করুন ; আপনি কে, এবং আপনার কি ঘটিয়াছে, তাহা যেন অতঃপর কেহ জানিতে না পারে।”

মোল্লাজির নীরস শিক্ষায় আওরঙ্গজেবের হৃদয় ও মন শুষ্ক হইয়া উঠে। এই শুষ্কতা নিবন্ধন তাঁহার হৃদয় প্রীতির অভিসিঞ্চনে সিক্ত হইতে পারে নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন,—ইহাই মনুষ্যের প্রবল কামনা ; একামনা প্রীতির আকর্ষণ জাত। এই যে পৃথিবীব্যাপী বিশ্বাস,—এই যে একহৃদয় অন্য হৃদয়ে নির্ভর করিয়া সংসারের জটিল-বর্ত্মে নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করিতেছে, ইহার মূল প্রীতির মোহন মন্ত্র। প্রীতিলেশহীন আওরঙ্গজেব পরের অনুরাগ লাভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি অন্যের প্রতি নির্ভর করিবার পূর্ব্বে বহুবার অগ্রে ও পশ্চাতে দৃষ্টি করিতেন। বস্তুতঃ আওরঙ্গজেব অতিশয় সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, লোকের সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের অস্তিত্বে সহসা বিশ্বাস করিতেন না। প্রীতিতত্ত্ব অতি গভীর। প্রীতি “হৃদয়ের একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম” ; কিন্তু শিক্ষার দোষে অথবা অন্য কোন কারণে মনুষ্যপ্রীতিলেশহীন হইলে মন অশান্ত হইয়া উঠে, এবং জীবন মরীচিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। “তখন সুখের সঙ্গীতের মধ্যে বিষাদের সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়।”

একারণ, আওরঙ্গজেব আজন্ম বিলাসে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও যৌবনের প্রারম্ভে সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব যখন সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক, তখন শাহজাহান তাঁহাকে শাসনকর্ত্তার পদে বরণ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনায় মগ্ন থাকিতেন। এবং বহুমূল্য রাজোচিত বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই পবিত্রতার আচ্ছাদনস্বরূপ শুভ্রবেশ পরিধান করিতেন। তিনি

চব্বিশ বৎসর বয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। তাহার পর আওরঙ্গজেব পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার বিজন প্রদেশে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সংসারত্যাগী ফকীরের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শাহজাহান আওরঙ্গজেবের সংসারবিতৃষ্ণার বিষয় অবগত হইয়া এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার বৃত্তি রহিত করেন, এবং তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদার লাঘব করেন। আওরঙ্গজেব বিলাসে বিতৃষ্ণ হইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন; বৈরাগ্যও মোহন দৃশ্য উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু অনাসক্ত ত্যাগী ফকীরের ন্যায় জীবনযাপন করিতে করিতে বৈরাগ্যের শান্তি ও মাধুর্য্য অন্তর্হিত হইয়া গেল! আওরঙ্গজেব এক বৎসর নির্জ্জন কুটীরে বাস করিয়া পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার বৈরাগ্যের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; সন্ন্যাসী যুবক রাজনীতিক্ষেত্রে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া সৈন্য পরিচালনের ভারগ্রহণ করিলেন! বিলাস-বিরক্ত বীতস্পৃহ পুত্রকে পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিতে দেখিয়া শাহজাহান প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে বাল্‌খ দেশের শাসনার্থ প্রেরণ করিলেন। এখানে তিনি অসাধারণ মনস্বিতা, অতুল কার্য্যকুশলতা এবং অসম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া সর্ব্বসাধারণের বরেণ্য হইলেন। এই সময় হইতে আওরঙ্গজেব পুনঃ পুনঃ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। ইহার পর হইতে আওরঙ্গজেব কার্য্যের আবর্ত্তে বারংবার ঘূর্ণ্যমান হন। শাসনক্ষমতার আস্বাদ পাইয়া তিনি ক্ষমতালোলুপ হইলেন, এবং দিল্লীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দুরাকাজ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

অবশেষে আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির যন্ত্ররূপে

পরিণত হইল। যখন আওরঙ্গজেবের চরিত্র এই ভাবে গঠিত হইল, তখন শাহজাহান তাঁহাকে পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়েই তিনি একজন কূটবুদ্ধি রাজনীতি-বিশারদ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আত্ম-গোপন করিয়া তিনি গোপনে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ইহার পর হইতে তিনি প্রত্যেক অসদনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবিশ্বাসের আবরণ দিতেন। শাহজাহান রোগশয্যায় শয়ান হইলে তিনি পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ম দক্ষিণাপথ হইতে যাত্রা করিবার সময় সমবেত সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী, আমি ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি।" আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার জন্ম যখন ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তখনও তিনি ধর্ম্মের ভান পরি-ত্যাগ করেন নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার পর আওরঙ্গজেব তদীয় বিধবা মহিষীর অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা মহিষীকে বিবাহ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়! এই প্রকারে প্রত্যেক অসদনুষ্ঠানেই তিনি নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন।

আওরঙ্গজেব তক্তভাউসে অধিরোহণ করিবার জন্য কোনরূপ পাপা-নুষ্ঠানেই কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। একারণ তিনি বিশিষ্ট মোসলমান সমাজের বিরাগভাজন হন। তিনি মোসলমান সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভ করিবার জন্ম কৃতসংকল্প হন। আওরঙ্গজেব পরধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশই মোসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অব-ধারণ করেন! ভারতবর্ষের অধিকাংশ মোসলমানই সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। আওরঙ্গজেব নিজেও সুন্নি ছিলেন। সুন্নিগণ মোহাম্মদের

বিরোধী হিন্দু ও মোহাম্মদের ভক্ত শিয়া উভয়কেই তুল্যরূপ বিদ্বেষ করিতেন। একারণ আওরঙ্গজেব তাঁহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইবার আশায় রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই হিন্দু ও শিয়াদিগের দলনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ব্যবহারে বোধ হইত, যেন তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অশ্রুজলে স্বীয় কলঙ্ককালিমা বিধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পরধর্ম্ম নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং তাঁহার পরধর্ম্ম বিদ্বেষের মূল প্রথমে প্রকৃতিগত ছিল না। কিন্তু কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হইলে তাহা অবশেষে প্রকৃতিগত হইয়া উঠে। এজন্য পাদশাহের পরধর্ম্মবিদ্বেষও শেষে আন্তরিক ও অকৃত্রিম হইয়া পড়ে। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই বিদ্বেষ পূর্ণমাত্রায় প্রকট হয় নাই; ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মানুসারে পর্য্যায় মত পূর্ণতালাভ করে।

মোগল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ মোসলমান রাজকর্ম্মচারী শিয়া-মতাবলম্বী ছিলেন। এই সকল রাজকর্ম্মচারী মোগল-সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, সর্ব্বান্তঃকরণে সাম্রাজ্যের উন্নতিকামনায় নিরত থাকিতেন, প্রভুর কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেই চরিতার্থ হইতেন, আপনাদের উন্নতি মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। আওরঙ্গজেব এই স্বজাতীয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, বরং তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিশ্বাসী বলিয়া হিন্দুর ন্যায় ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহারে বিশ্বস্ত মোসলমান রাজপুরুষগণও বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহারা আর মোগলসাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। কিন্তু আওরঙ্গজেবের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতাপে সকলেই সন্ত্রস্ত ছিলেন, সুতরাং কোন রাজপুরুষই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হন

নাই। এই জন্যই তাঁহাদের মনোভাব পাদশাহের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ, অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

আওরঙ্গজেব শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে আকবরের প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্ম্মবিদ্বেষবশে তিনি একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করেন। আওরঙ্গজেবের রাজ্যলাভের পূর্ব্বে মোগল সাম্রাজ্যে হিন্দু সেনাপতিগণ সৈন্যপরিচালন করিতেন; হিন্দু শাসনকর্ত্তৃগণ দেশশাসন করিতেন; যে সকল সেরেস্তার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে শিক্ষিত লোকের আবশ্যক হইত, তাহা একমাত্র হিন্দুরই একচেটিয়া ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে রাজপুত সেনাই মোগলবাহিনীর প্রাণ ছিল। কিন্তু পরধর্ম্মবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। (১) কার্য্যপটু হিন্দু কর্ম্মচারিগণ পদচ্যুত হইলেন, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধশিক্ষিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মোসলমানগণ উচ্চপদে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। ইহার ফল বিষময় হইল। আওরঙ্গজেব নিজে এস্লাম ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনমতে ন্যায়বিচার ও প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু নব-নিযুক্ত অকর্ম্মণ্য ও অশিক্ষিত মোসলমান কর্ম্মচারিগণের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁহাদের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রত্যেকপ্রদেশ অচিরে হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এখানেই উৎপীড়নের অবসান হইয়াছিল না। আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিবার নিত্য নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করি-

---

(১) "The Hindu writers have been entirely excluded from holding public offices"—*Mir-at-i-Alam.*

তেন। (১) তিনি মোসলমানদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিলেন। এইরূপে হিন্দু মোসলমানের মধ্যে বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে মোসলমানগণ হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পাদশাহের রাজস্ব অনেক কমিয়া গেল। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কর্ম্মচারীদিগের পরামর্শে পাদশাহ নিয়ম করিলেন,—হিন্দুদিগকে শতকরা পাঁচ টাকা ও মোসলমানদিগকে শতকরা আড়াই টাকা শুল্ক দিতে হইবে।

আওরঙ্গজেব ঘৃণ্য জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দু প্রজাদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মবিদ্বেষের ফলেই জিজিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। মোসলমান শাসনের অধীনে যত প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইত, তন্মধ্যে হিন্দুগণ জিজিয়াকেই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ও অসহ্য মনে করিতেন। জিজিয়া প্রবর্ত্তিত হইবার পর একদিন আওরঙ্গজেব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উপাসনার্থ মস্‌জিদে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় পঞ্চাশ সহস্র হিন্দু অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরকণ্ঠে জিজিয়া কর রহিত করিবার জন্য পাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিল; পাদশাহ তাহাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার সঙ্গীয় হস্তী ও অশ্ব কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু প্রাণত্যাগ করিল। তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ জিজিয়ার পুনঃপ্রবর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি অসংখ্য দেবালয় মস্‌জিদে পরিণত করিলেন; দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া মস্‌জিদের সোপানাবলী প্রস্তুত করিলেন। হিন্দুর পুণ্য দেবক্ষেত্র বারাণসীর দেবশ্রেষ্ঠ বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভূলুণ্ঠিত হইল, এবং তাহার

(১) আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ কিরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আর একটি আদেশের উল্লেখ করিতেছি। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ লিখিয়াছেন যে, পাদশাহের আদেশে হিন্দুদিগের ডুলিতে অথবা আরব অশ্বে আরোহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

স্থলে মোসলমানের মস্‌জিদ বিরাজ করিতে লাগিল। (১) মোসলমান মৌলবীগণ হিন্দুদিগকে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া হিন্দুরক্তে পৃথিবী অনুরঞ্জিত করিতে লাগিল।

কেহ কেহ রাজানুগ্রহলাভের প্রলোভনে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত; কিন্তু হিন্দু জনসাধারণ স্বধর্ম্মবিসর্জ্জনে স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা এসলাম ধর্ম্মের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে নিহত করিতে লাগিল। ধর্ম্মার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ইহকালে প্রতিষ্ঠা ও পরকালে স্বর্গলাভ করিবার কামনা জনসাধারণের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। এমন কি, এক বৃদ্ধা রমণীর নেতৃত্বে বহুসংখ্যক হিন্দু সশস্ত্র হইয়া আগ্রা হইতে দিল্লীর অভিমুখে অভিযান করিয়াছিল। ইহাদিগকে দলন করিবার জন্য স্বয়ং আওরঙ্গজেব রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হায়! হিন্দুর সে দিন কোথায় গেল! সে শৌর্য্য-বীর্য্যের উজ্জ্বলরবি কোন্ অন্ধ-তমসময়-সাগর-নীরে অস্তমিত

---

(১) আওরঙ্গজেব কেন দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ ও দেবালয় ভগ্ন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, একজন ঐতিহাসিক তাহার কৌতুকাবহ কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই সময়ে হিন্দুগণ মোসলমানদিগকে হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব ইহাতেই উত্তেজিত হইয়া এই আদেশ প্রদান করেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরসমূহের কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একজন মোসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"All the worshipping places of the infidels and the great temples of these infamous people have been thrown down and destroyed in a manner which excites astonishment at the successful completion of so difficult a task. His Majesty personally teaches the Sacred Kalima to many infidels with success and invests them with Khelats and other favours." *Mr-at-i-Alam*

হইল! হিন্দু সাধারণকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যাচারের বিরাম ছিল না। এই অত্যাচারে পিষ্ট হইয়া কৃষক শ্রেণী শস্যক্ষেত্র হইতে বিদায়গ্রহণ করিল; শিল্পিগণ স্ব স্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল। এ কারণে প্রাদেশিক রাজস্বের হ্রাস হইল।

আর এক কারণেও অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আওরঙ্গজেব অত্যন্ত কপট ও সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন,—কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। এ কারণ তিনি একজন কর্ম্মচারীকে কোন বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। সন্দিগ্ধচিত্ত পাদশাহ একজন রাজপুরুষকে কোনও কার্য্যের ভার দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারী স্বরূপ আর একজন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে রাজপুরুষগণের দায়িত্ব দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িত, কেহই কর্ত্তব্যপালনে তাদৃশ মনোযোগী হইতেন না। এজন্য আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। (১) রাজপুরুষগণ দীর্ঘকাল এক

(১) পাদশাহ সন্দিগ্ধতা নিবন্ধন রাজপুরুষগণের সঙ্গে কিরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা মির জুম্লার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। শাহাজাহানের রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে মির জুম্লা নামক একজন কোটীপতি ও প্রতিপত্তিশালী সেনাপতি তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করেন। মির জুম্লা ক্রমশঃ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ হইয়া উঠেন। আওরঙ্গজেবের কূটবুদ্ধির সহিত যদি মির জুম্লার ধনবল ও বাহুবল সম্মিলিত না হইত, তাহা হইলে তিনি দিল্লীর রাজসিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া মির জুম্লাকে বাঙ্গলার স্ববাদারের পদে নিযুক্ত করেন। মির জুম্লা বঙ্গদেশে রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। আওরঙ্গজেব তাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী বীর পুরুষের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হন নাই, বরং একজন ক্ষমতাশালী উচ্চাভিলাষী বীর পুরুষের তিরোভাব দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব রাজপুরুষগণের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা অনুমিত হইতে পারে। সন্দিগ্ধচিত পাদশাহ অধিকাংশ রাজপুরুষের সঙ্গেই প্রীতিসূত্রে সংবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কোন কোন ব্যবহারে রাজপুরুষগণের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ

স্থানে অবস্থান করিলে তাঁহারা অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিবেন আশঙ্কা করিয়া পাদশাহ তাঁহাদিগকে অধিক দিন এক প্রদেশে থাকিতে দিতেন না। এ কারণ রাজপুরুষগণ যেখানে গমন করিতেন, সেখানে তাঁহারা প্রবাসীর ন্যায় বাস করিতেন; আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশের প্রকৃত হিতকামনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। শাসনাধীন প্রদেশ পরিত্যাগ করিবার পুর্ব্বে কোনও প্রকারে অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইত। সুতরাং অত্যাচারের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসকবর্গের যথেচ্ছার দমনের কোনও উপায় ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে স্বয়ং আওরঙ্গজেব তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু পাদশাহের দরবারে উপস্থিত হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও যাহাতে আপনাদের অত্যাচার-কাহিনী পাদশাহের কর্ণগোচর না হয়, সে বিষয়ে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। সুতরাং অন্যায় অত্যাচারের একশেষ হইতে লাগিল। আকবর শাহের সুশাসনগুণে জনসাধারণ মোগল-শাসনের অনুরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু আওরঙ্গজেব পাদশাহের শাসনচক্রে পিষ্ট হইয়া তাহারা আর মোগল-শাসনের পক্ষপাতী রহিল না।

আওরঙ্গজেবের লিখিত একখানি পত্র হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—"আমি সূক্ষ্মভাবে প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক মৃত কর্ম্মচারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করি, ইহা আপনার ইচ্ছা। কোন ওমরাহ বা ধনাঢ্য বণিকের শেষ নিশ্বাস পতিত হইবা মাত্র, কোন কোন স্থলে বা জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই তদীয় কোষাগার মোহর বন্ধ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির, এমন কি সামান্য জহরতের বিবরণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থিত চাকর বা কর্ম্মচারীকে অবরুদ্ধ রাখিতে অথবা প্রহার করিতে আমরা অভ্যস্ত। এ প্রথা বেশ সুবিধাজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা যে অন্যায় ও নিষ্ঠুর, তাহা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে?" কিন্তু আওরঙ্গজেব কার্য্যকালে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

পক্ষান্তরে পাদশাহের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহার ইন্ধনসংগ্রহ করিতেই রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের বীরত্ব, রণকৌশল, শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় পরিশ্রম করিতেন; স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালন করিতেন; রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় প্রত্যেক কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; এমন কি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাবুলের ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানেও একজন সামান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার কাহারও অধিকার ছিল না। কিন্তু তাঁহার আদৌ দূরদর্শিতা ছিল না; তিনি যে সংকীর্ণ নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন, অচিরেই তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তথাপি তিনি স্ব-প্রবর্ত্তিত কু-নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার অবিবেকিতায় মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল বিচলিত হইয়া উঠিল। আওরঙ্গজেব প্রতিভাশালী বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খ্যাত ছিলেন; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার নামে কম্পিত হইত। কেবল এই কারণেই তাঁহার শাসনকালে মোগল-সাম্রাজ্য ভূলুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু পাদশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতাপ, প্রভাব ও প্রতিভা অস্তমিত হয়, এবং একজন দুর্ব্বলচিত্ত অকর্ম্মণ্য সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন শিথিলমূল মহীরুহের ন্যায় বলহীন মোগল-সাম্রাজ্য সামান্য ঝঞ্ঝায় চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, দক্ষিণাপথের পার্ব্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রতিলক (১) শিবাজী ধীরে ধীরে শক্তি-

(১) দক্ষিণাপথের যে অংশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত, তাহার উত্তরে সুরাট ও সাতপুরা পর্ব্বত, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্ব্বে বরদা নদী। এই

সঞ্চয় ও স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আওরঙ্গজেব প্রথমে তাঁহাকে 'পার্ব্বত্য মূষিক' বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু যখন শিবাজী ক্রমশঃ প্রবল হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিলেন, তখন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সূচিত হইল।

শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবার জন্য আয়োজন করিলেন। তিনি একদিন গভীর রজনীতে কেবল মাত্র ২৫ জন ভীষণযোদ্ধা মাওয়ালী সৈন্যসহ বরযাত্রীর দলে মিশিয়া অন্যের অলক্ষ্যে শায়েস্তা খাঁর বাসভবনের নিকট উপনীত হইলেন, এবং তারপর সে প্রাসাদের অভ্যন্তরে সুকৌশলে প্রবেশ করিয়া শত্রু-দিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। এই আকস্মিক আক্রমণে সুপ্তো-থিত মোসলমানগণ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের মধ্যে যে যে দিকে সুবিধা দেখিল, সে সেই দিকেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে শায়েস্তা খাঁর একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইল, তিনি আরঙ্গাবাদের অভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া "মহাবল পরাক্রান্ত অম্বরাধি-পতি জয়সিংহকে দিলাওয়ার খাঁর সহিত শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব দেখিয়া শিবাজী বিনাযুদ্ধেই পরাজয়স্বীকার ও সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার বত্রিশটী দুর্গের মধ্যে কুড়িটি সম্রাটকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং অব-

---

বিস্তৃত ভূমির পরিমাণ ১০,২০০০ বর্গমাইল। এই দেশের একাংশ বিজাপুরের অধীন, এবং অপরাংশ আমেদনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু শাহজাহান পাদশাহ আমেদনগর রাজ্যের ধ্বংস করেন। শিবাজীর অভ্যুদয়কালে মহারাষ্ট্র ভূমির একাংশ বিজাপুর রাজ্যের অধীন, এবং অপরাংশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিষ্ট বারটি দুর্গ সম্রাটের অধীনে ভোগ করিবেন, স্বীকার করিলেন। ইহার কিছু পরই জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লীযাত্রা করেন। সম্রাট এই সময় শিবাজীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাঁহাকে চিরবিশ্বস্ত ভৃত্য করিতে পারিতেন, কিন্তু আপন ক্রূরতা ও ধূর্ত্তবুদ্ধি নিবন্ধন শিবাজীকে প্রথমে অবমাননা, পরে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া দিল্লীতে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। শিবাজী চক্রান্ত করিয়া, দিল্লী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আওরঙ্গজেবের চিরশত্রু হইয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।" (১) পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কখনও শিবাজী যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন, কখনও বা বিজয়শ্রী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব কখনও শিবাজীকে দমন করিতে পারেন নাই। এই ভাবে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। এই অব্দে পাদশাহ মহাবত খাঁকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে চল্লিশ সহস্র মোগলসৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে শিবাজী কখনও সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হন নাই। এইবার তিনি প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্মবল পরীক্ষার সঙ্কল্প করি-

---

(১) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত:—"শিবাজী দিল্লীতে নজরবন্দী হইয়া যে কৌতুককর উপায়ে মুক্তিলাভ করেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। শিবাজী পাদশাহকে বলিয়া পাঠান, "আমার সব লোকজন দিল্লীর জল বায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। অতএব তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।" আওরঙ্গজেব শিবাজীর চাতুরীর মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। শিবাজীর সব লোকজন স্বদেশে প্রতিগমন করে। অতঃপর শিবাজী একদিন পাদশাহকে জানান যে, তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার আরোগ্যলাভের সংবাদ প্রচারিত হয়। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার পর বিবিধ শ্রেণীর সাধুগণকে ঝুড়ি ভরিয়া ভরিয়া মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহারদ্রব্য প্রেরিত হইতে থাকে। প্রহরীরা প্রথমে প্রথমে ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু ক্রমে অসতর্ক হইয়া পড়ে। শিবাজী সুযোগ মত একদিন সন্ধ্যাকালে পুত্রসহ ঝুড়িতে লুক্কায়িত হইয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন।"

লেন। মোগল সৈন্যের সহিত শিবাজীর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল; বহুসংখ্যক মোগল সেনা ও বাইশ জন সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

এই সময়ে অকস্মাৎ আফগান রাজ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। অগত্যা আওরঙ্গজেব শিবাজীর সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন। ইউসফজাই জাতি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া মোগল সেনাপতিকে পরাজিত ও গিরিসঙ্কটবাসী মোগল সেনাদিগকে নিহত করিল। দুই বৎসর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণ আংশিক বশ্যতাস্বীকার করিল। আওরঙ্গজেবও প্রফুল্লচিত্তে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আফগান ভূমিতে শান্তি সংস্থাপিত হইতে না হইতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। সত্যনামী নামক একটি অস্ত্রধারী হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় এই সময় নারনৌলে বাস করিত। একজন শান্তিরক্ষকের উৎপীড়নে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী অসন্তুষ্ট জমীদারগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন; সমগ্র আগ্রা ও আজমীর প্রদেশে অশান্তির সীমা রহিল না। কিন্তু পাদশাহ অনায়াসে এই বিদ্রোহের দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত করিলেন। (১)

কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে যাপন করিতে পারিলেন না। আওরঙ্গজেবের প্রবল উৎপীড়নে প্রত্যেক প্রদেশে অসন্তোষের বীজ উপ্ত

---

(১) ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আওরঙ্গজেব প্রথম হইতেই হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিতেছিলেন, কিন্তু সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের পর হইতেই সে নিপীড়ন অতিশয় প্রবলাকার ধারণ করে। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষানল প্রধূমিত হইতেছিল, সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহপবনে সেই অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে। এই সময় হিন্দু কুলরক্ষক মহাবল পরাক্রান্ত জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ পরলোকগত হওয়ায় আওরঙ্গজেব নিশ্চিন্তচিত্তে মনেরসাধমিটাইয়া হিন্দুদিগকে নিপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হন।

হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রদেশের অধিবাসীই সহসা অগ্রসর হইয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় নাই। কিন্তু সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ নিবারিত হইবার অব্যবহিত পরেই আওরঙ্গজেবের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন রাজপুতনায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণকালে অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ ও যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুর নিপীড়ন জন্য অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অসন্তোষের বিষয় পাদশাহের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাদৃশ ক্ষমতাশালী সেনাপতিযুগলের অসন্তোষ অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার কূট কৌশলে জয়সিংহ পৃথিবী হইতে অপসারিত হন। (১) সুতরাং অতঃপর রাজা যশোবন্ত সিংহ ভিন্ন হিন্দুর আর কোনও রক্ষক রহিল না। যশোবন্ত সিংহ রাজকার্য্যের অনুরোধে কাবুলে গমন করেন। হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজার লোকান্তর ঘটিল।

রাজা যশোবন্ত সিংহ কাবুলে লোকান্তরিত হইলে, তদীয় বিধবা মহিষী ও পুত্রদ্বয় দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মতিচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব দিল্লীতে তাঁহাদের শিবির অবরুদ্ধ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের প্রভুভক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাসের অনন্যসাধারণ বীরত্বে যশোবন্তের মহিষী ও রাজকুমারদ্বয় পাদশাহের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। (১)

(১) "Jay Singh died at Brampore * * and seems to have been poisoned by the procurement of Aurengzeb." Orme's Historical Fragments.

(১) এই বিষয়ে আওরঙ্গজেবকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সুবিখ্যাত ইতিহাসলেখক খাফি খাঁ লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

'Without waiting for permission from Aurengzeb, and without

রাজপুতানা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে সম্মানে ও বীরত্বে মিবার ও মাড়োয়ার তখন অগ্রগণ্য। মাড়োয়ারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহ স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া মোসলমান পাদশাহের দাসত্ব-স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারাধিপতি কখনও মোসলমান

---

even obtaining a pass from the subadar of the province they set off towards the Capital. When they reached the ferry of Attock they were unable to produce any pass, so the commander of the boats refused to let them proceed. They then attacked him, killed and wounded some of his men, and by force made good their way over the river and went onwards towards Dehli. There was an oldstanding grievance in the Emperor's heart respecting Raja Jaswant's tribute, which was aggravated by these presumptuous proceedings of the Rajputs. He ordered the Kotwal to sorround the camp of the Rajputs, and keep guards over them." এই বর্ণনা সত্য বোধ হয় না। যশোবন্তের বিধবা মহিষী তেজস্বিনী বীরনারী ছিলেন। তিনি কিরূপ শৌর্য্যশালিনী ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। যশোবন্ত সিংহ একবার রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। এই ঘটনায় যশোবন্ত-মহিষী এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীকে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই! আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দিনী করিলে তিনি যে কৌশলে পরিত্রাণলাভ করেন, তাহাও তাঁহার প্রখর উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক। রাণীর কতিপয় অনুচর কার্য্যব্যপদেশে স্বদেশে গমন করিতে পাদশাহের অনুমতিলাভ করে। তাহাদের যাত্রার প্রাক্কালে রাজপুত্রদ্বয়ের সমবয়স্ক দুইজন বালক রাজ-ভূষণে ভূষিত হইল, এবং একজন সঙ্গিনী রাজপুত-রমণী রাণীর বেশ পরিধান করিল। ভণ্ডবেশ ধারণের পর ইহাদিগকে শিবিরে রাখিয়া রাণী প্রহরিগণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া রাজপুত্রদ্বয় ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে রাজপুতানায় পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের পলায়নবার্ত্তা প্রচারিত হইলে পাঁচ সহস্র মোগল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাস অমিতপরাক্রমে মোগল সৈন্যদিগকে একটি গিরি-সঙ্কটে অবরুদ্ধ করিলেন; ইত্যবকাশে যশোবন্তের মহিষী নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইলেন। আওরঙ্গজেব পূর্ণমাত্রায় হিন্দুদিগকে নিগৃহীত করিলে এই বীর-রমণী পাদশাহের অভীষ্টসিদ্ধির পথে অন্তরায় হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে করায়ত্ত করিবার জন্য এইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পাদশাহের আদেশে অবনতমস্তক হন নাই; তাঁহাদের পদগৌরব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। (১) মিবারের অধিপতির উপাধি রাণা রাজাধিরাজ ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে জিজিয়া-কর প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করেন। মোগলের নামে রাজমুদ্রা প্রচলিত করিলে, রাজ্যমধ্যে গো-হত্যার অনুমতি প্রদান করিলে, হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন করিয়া তাহার স্থলে মসজিদ নির্ম্মাণ করিলে, মোসলমান শাস্ত্রানুসারে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, রাজসিংহ ও তদীয় প্রজাবর্গ জিজিয়া হইতে অব্যাহতিলাভ করিবেন, পাদশাহের এইরূপ আদেশ ছিল। রাণা রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের এই অনুচিত প্রস্তাবে মর্ম্মাহত হইয়া নির্ভীকচিত্তে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে পাদশাহকে এইরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাণা রাজসিংহ এই অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না; আওরঙ্গজেব কখনও আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময় যশোবন্তের বিধবা মহিষী পাদশাহের হস্তে নিগৃহীত হইলেন। রাজসিংহ অগ্রসর হইয়া রাণী ও রাজপুত্রদ্বয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

মিবারাধিপতি জিজিয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, এবং যশোবন্তের বিধবা মহিষীকে আশ্রয়প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আওরঙ্গজেব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং সমগ্র রাজপুত-ভূমি

---

(১) "The Mogul had often endeavoured to subject them to amenable vassalage, but had never been able to obtain their acquiescence to more than ceremonious acknowledgment, and rated subsidies of troops."—*Orme's Historical Fragments.*

বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাবুল, দক্ষিণাপথ ও বঙ্গদেশ হইতে শাহজাদাদিগকে সসৈন্যে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের আসিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি মিবারের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। তাঁহার অভিযানবার্ত্তা প্রচারিত হইলে রাজসিংহ হিন্দু রাজন্যবর্গকে স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের গৌরবরক্ষার্থ আপনার পতাকামূলে আহ্বান করিলেন।

আওরঙ্গজেব রাজস্থান আক্রমণ করিলেন। পাদশাহ-সৈন্য রাজপুতানায় প্রবেশ করিবামাত্র যুদ্ধনীতিবিশারদ রাজসিংহ সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মোগল সৈন্য অমানুষিক পরিশ্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা রাজপুতানার পথঘাট চিনিত না। পথভ্রান্ত হইয়া পাদশাহ অচিরাৎ সসৈন্যে একটি পর্ব্বতের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ শত্রুসৈন্যের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া রন্ধ্রপথের সম্মুখভাগে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের নির্গমের পথরুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহাদের পথ পরিষ্কৃত করিবার সমস্ত শ্রম ও যত্ন রাজপুতবীরগণের কৌশলে ব্যর্থ হইয়া গেল।

উদিপুরী নাম্নী আওরঙ্গজেবের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী প্রিয়তমা মহিষী তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি শত্রুহস্তে পতিত হইয়া রাজসিংহের নিকট আনীতা হইলেন। রাণা তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। আওরঙ্গজেব পর্ব্বতরন্ধ্রে সসৈন্যে দুই দিন অবরুদ্ধ থাকিয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিলেন। মোগলসৈন্য খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। রাজসিংহ দয়াপরবশ হইয়া পর্ব্বতাশ্রয়ী রাজপুত সৈন্যকে স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। মোগলসৈন্য নির্গমের পথ পরিষ্কৃত করিয়া পর্ব্বতরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইল। পাদশাহ

নিরাপদ হইবামাত্র রাণা তদীয় মহিষীকে রক্ষী সৈন্যসহ প্রত্যর্পণ করিলেন।

পাদশাহ মানবের সুকোমল বৃত্তিসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই লোকে প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ কারণ তিনি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার ক্রোধানল হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার জন্য রাজসিংহ এইরূপ সদাশয়তা ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আওরঙ্গজেব যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন না! কিন্তু রাজপুতের অতুল বীরত্বে ও কৌশলে তিনি পুনর্ব্বার পার্ব্বত্যপথে অবরুদ্ধ হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তদীয় পুত্র আজীম ও আকবর সসৈন্যে উপনীত হইলেন। আওরঙ্গজেব পুত্রদ্বয়ের হস্তে মিবার-বিজয়ের ভার সমর্পণ করিয়া রাজপুতভূমি পরিত্যাগ পরিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্য দীর্ঘকালেও রাজপুতদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না। রাজসিংহের অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশহিতৈষণায় সমগ্র ভারত মুগ্ধ হইল। রাজসিংহের অবদান মৃতপ্রায় ভারত এখনও বিস্মৃত হয় নাই;—কখনও হইবে কি? যাহা হউক, তাঁহার বীরত্ব ও কৌশলে মোগলসৈন্য পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইল। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব বাধ্য হইয়া রাজসিংহের মনোমত সন্ধি করিলেন।

ইহার পরেই রাজকুমার আকবর অকস্মাৎ রাজপুতগণের সহিত মিলিত ও বিদ্রোহী হইয়া সত্তর সহস্র সৈন্যের সহিত পিতার মস্তক হইতে রাজ-মুকুট কাড়িয়া লইবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সময় পাদশাহ অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। শাহজাহানের শোচনীয় পরিণাম তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। দুরাকাঙ্ক্ষ পুত্র রাজ্যলাভলালসা

চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকেও শাহজাহানের দশাগ্রস্ত করিতে পারে, এই চিন্তায় পাদশাহ আকুল হইলেন। কিন্তু তিনি হতবুদ্ধি না হইয়া পুত্রের বিষদন্ত ভগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি পুত্রকে লিখিলেন, "আমি তোমার কার্য্যকৌশলে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি ; তুমি রাজপুতদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছ, তাহা উৎকৃষ্ট।" পাদশাহের চক্রান্তে এই পত্র রাজপুত অধিনায়কগণের হস্তে পতিত হইল। সুতরাং রাজপুতগণ সন্দিগ্ধ হইয়া আকবরকে পরিত্যাগ করিলেন। আকবর নিরুপায় হইয়া পাঁচ শত সৈন্যসহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাপন্ন হইলেন। তথা হইতে তিনি পারস্য দেশে গমন করেন। পারস্যেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত হয়।

উদয়পুরাধিপতি রাণার সহিত সন্ধিস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতেই রাজপুত-যুদ্ধের অবসান হইল না। তখনও পশ্চিমাঞ্চলের রাজপুত বীরগণ অস্ত্রপরিত্যাগ করেন নাই। পাদশাহ অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব রাজপুতানায় শান্তিসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সে শান্তি ভোগ করিতে পারিলেন না। এই সময়েই রাজপুতবীরগণ মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। রাজপুত সেনাপতিগণ এক শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগলসাম্রাজ্যের প্রধান সহায় ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের সকল প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন।

যে সময় আওরঙ্গজেব আফগানভূমির বিদ্রোহদমন ও রাজস্থানের অগ্নিনির্ব্বাণে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় শিবাজী ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরাজ্যের সংগঠনসমাপ্ত করেন। জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া

শিবাজী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে অমরলোকে যাত্রা করিলেন। শিবাজীর তিরোভাবের পর তাঁহার পুত্র শম্ভূজী পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। এই সময় মহারাষ্ট্ররাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল; তাহার ফলে মহারাষ্ট্রশক্তি কিয়ৎকালের জন্য হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। (১)

দক্ষিণাপথের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের নরপতিগণ শাহজাহান পাদশাহের সময়ে আংশিকভাবে দিল্লীর বশ্যতাস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; এই রাজ্যদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবার অভিলাষে তিনি কয়েকবার সৈন্যপ্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক দিকে শিবাজী ও অন্য দিকে রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি এ বিষয়ে অবহিত হইবার অবকাশ পান নাই। এক্ষণে শিবাজীর স্বর্গারোহণে মহারাষ্ট্র হীনবল হইল, এবং রাজস্থানের সমরানল নির্ব্বাপিত হইল, সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া আওরঙ্গজেব সমগ্র শক্তি দক্ষিণাপথের রাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিলেন।

---

(১) শিবাজীর দেহত্যাগের পর তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আওরঙ্গজেব যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"শিবাজী একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। আমি যে সময় ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যসমূহ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, সে সময় কেবল একমাত্র শিবাজীই একটি নূতন রাজ্যসংগঠনের চেষ্টায় সাহসী হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে উনিশ বৎসর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি; তথাপি তাঁহার রাজ্য সর্ব্বদাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।" ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ শিবাজীকে 'নরকের কুকুর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই খাফি যদি শিবাজীর কোনও প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে তাহার প্রত্যেক বর্ণ যে সত্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন :—

"Sivaji had always striven to maintain the honour of the people in his territories. He perserved in a course of rebellion in plundering caravans and troubling mankind, but he entirely abstained other disgraceful acts, and was careful to maintain the honour of women and children of Mahammadans when they fell into his hands."

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। এমন যুদ্ধায়োজন পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইল; ইহাদিগের সাহায্যের জন্য অসংখ্য সুশিক্ষিত পদাতিক সজ্জিত হইল; বহুসংখ্যক কামান প্রস্তুত ও তোপখানার তত্ত্বাবধানের জন্য ইউরোপীয়গণ নিযুক্ত হইল। পাদশাহ আরঙ্গাবাদে উপনীত হইয়া শিবিরসংস্থাপন করিলেন।

প্রথমতঃ, মহারাষ্ট্র রাজ্য জয় করিবার জন্য আওরঙ্গজেব চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সেনা কথনও সম্মুখযুদ্ধ করিত না। মোগল সৈন্য মহারাষ্ট্ররাজ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা পর্ব্বতোপরি আশ্রয়গ্রহণ করিল; চারিদিকের পথ ঘাট রুদ্ধ করিয়া দিল। মোগলশিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। মোগল সেনাপতি কতিপয় অশ্বারোহীসেনা সহ পলায়ন করিয়া আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

আওরঙ্গজেব আরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া সোলাপুরে গমন করিলেন। তথায় শিবিরসংস্থাপন করিয়া স্বীয় পুত্র আজীমকে বীজাপুর রাজ্য বিজয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বিজাপুরের অধিপতি শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মোগলগণ বিজাপুর-সেনার কৌশলে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইল। এই সুযোগে শম্ভূজী মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত গুজরাটপ্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। মোগল সেনাপতিগণ বিজাপুরাধিপতিকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আওরঙ্গজেব বিজাপুররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র সৈন্যসহ গোলকুণ্ডারাজ্য আক্রমণ করিলেন; শম্ভূজী মোগলের অধিকৃত প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেও কিছু বলিলেন না। এই সময় মদন পন্থ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান গোলকুণ্ডার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি মোগলের গতিরোধের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলকুণ্ডার সেনাপতি এব্রাহিম খাঁর সহিত মদন পন্থের মনোমালিন্য ছিল। ঈর্ষ্যায় অন্ধ হইয়া সেনাপতি এব্রাহিম খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগলের সহিত মিলিত হইলেন। গোলকুণ্ডাধিপতি অনন্যোপায় হইয়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ দুই কোটী মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়া আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিলেন।

অতঃপর আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজাপুর রাজ্যের রাজধানী অবরুদ্ধ হইল। এইবার বিজাপুররাজ্যবিলুপ্ত হইল।

বিজাপুর রাজ্যের ধ্বংস করিয়া পাদশাহ পুনর্ব্বার গোলকুণ্ডার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। গোলকুণ্ডাধিপতির সহিত আওরঙ্গজেব সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি পুনর্ব্বার গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। গোলকুণ্ডার অধিপতি আবুহোসেন আওরঙ্গজেবকে শান্ত করিবার জন্য অন্তঃপুরবাসিনী পুরাঙ্গনাদের অঙ্গাভরণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু নির্ম্মম আওরঙ্গজেব তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। আবুহোসেন মোসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বিধর্ম্মী মহারাষ্ট্রাধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, (১) এই অপরাধে আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। আবুহোসেন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

এতকাল পরে পাদশাহের বহুকালের সাধ মিটিল; ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বহুকালের আশা সফল হইল। কিন্তু এই পররাজ্যহরণের চেষ্টাতেই মোগল-সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সমগ্র বল প্রায় নিঃশেষিত

---

(১) পাদশাহের গতিরোধ জন্য সাহায্য পাইবার আশায় আবুহোসেন মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন।

হইয়া গেল। গোলকুণ্ডা রাজ্য বিনষ্ট হইবার পরই মোগল-সাম্রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের সুশাসনগুণে দক্ষিণাপথ শান্তিপূর্ণ ছিল। এই দুই রাজ্যের বিলোপের সহিত সে সুশাসন-পদ্ধতিও অন্তর্হিত হইল। পক্ষান্তরে আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের শান্তি-রক্ষার জন্য কোনও নূতন শাসনপ্রণালীও প্রবর্ত্তিত করিলেন না। সন্দিগ্ধচিত্ত পাদশাহ কোন সেনাপতিকে উপযুক্ত সেনা সহ দক্ষিণাপথের শাসনভার অর্পণ করিতে পারিলেন না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অধিপতিগণ রাজ্যরক্ষা ও শাসনসৌকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা দুই লক্ষ সৈন্য রক্ষা করিতেন। কিন্তু এই রাজ্যদ্বয় বিধ্বস্ত হইলে মোগলঅধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কেবলমাত্র ৩৪০০০ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কর্ম্মচ্যুত সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট সেনানায়কগণের অধীনে দলবদ্ধ হইল; অনেকে মহারাষ্ট্র নায়কগণের সহিত যোগদান করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণ প্রাধান্যলাভ করেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। আওরঙ্গজেব সর্ব্বদা যুদ্ধব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং তজ্জন্য স্থির হইয়া অধিক দিন এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন না। এই কারণে তিনি দক্ষিণাপথের শাশনব্যবস্থা করিতে পারে নাই। সমগ্র দক্ষিণাপথে অরাজকতা ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে দক্ষিণাপথের শাসনযন্ত্র বিকল হইয়াছিল; ষড়যন্ত্রের বিরাম ছিল না; সমগ্র দেশ বিদ্রোহবহ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছিল। পাদশাহ এই বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু উহার সংস্পর্শে তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা দগ্ধ হইয়া গেল।

দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্যদ্বয় বিলুপ্ত করিয়াই আওরঙ্গ-জেব নিবৃত্ত হইলেন না। এই রাজ্যদ্বয়ের অধিকারেই তাঁহার সমস্ত

শক্তি ও বল প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল; যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা মহারাষ্ট্রশক্তির বিজয়ে নিয়োজিত হইল। সম্রাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমনের জন্য একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া বৃদ্ধবয়সেও কষ্টসহিষ্ণুতা ও রণকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র দেশ দুরতিক্রম নদী ও দুরারোহ পর্ব্বতমালায় সমাবৃত। এই সকল প্রাকৃতিক অন্তরায়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্র দেশের ন্যায় সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দেশ সম্ভবতঃ পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। (১) ঈদৃশ দুর্ল্লঙ্ঘ্য দেশে অভিযানকালে আওরঙ্গজেব পুনঃ পুনঃ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে কথনও কথনও এমন স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিতে হইত যে, তিনি সসৈন্যে খাদ্যাভাবে অনাহারে কালযাপন করিতে বাধ্য হইতেন। মহারাষ্ট্রদেশে গ্রীষ্মঋতু অগ্নিসদৃশ; এই সময় জলকষ্টে মোগলসৈন্য অত্যন্ত কাতর হইত; তদ্ব্যতীত একাধিকবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। একে মোগল সৈন্যের কষ্টের অবধি ছিল না, তদুপরি শত্রুর গুপ্ত আক্রমণে তাহাদের দুর্দ্দশা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এত বিপদেও আওরঙ্গজেব অটল ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও বল নিঃশেষিত হইয়া গেল। আওরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্য এইরূপ বিপন্ন করিয়াও মহারাষ্ট্রশক্তির ধ্বংস করিতে পারিলেন না। "অনেক দুর্গ আওরঙ্গজেবের হস্তগত হইল, অনেক যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাস্ত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হইল না, মহারাষ্ট্রীয়গণ বিজিত হইল না। মহা-

---

(১) "In a military point of view there is probably no stronger country in the world."—*Grant Duff.*

রাষ্ট্রীয়দিগের অশ্বারোহী ক্ষিপ্রগামী, তাহাদিগের কোন একটি রাজ-ধানীতে সমগ্র বল স্থাপিত ছিল না; শিবাজীর মৃত্যুর পর কোনও একজনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল না; সুতরাং এক স্থানে পরাস্ত হইলে তাহারা অন্য স্থানে জড় হইত, একটি দুর্গ হারাইলে অন্য এক-টিতে যাইত, এক জন বন্দী হইলে আর দশ জনে যুদ্ধ করিত; সম্মুখ-যুদ্ধ না করিয়া চারিদিকে মোগলদিগের দেশলুণ্ঠন ও সর্ব্বদা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশপ্রদান করিত। বিংশতি বৎসরব্যাপী বহুসংখ্যক যুদ্ধেও এরূপ জাতির ক্ষমতা চূর্ণ করিতে না পারিয়া, শ্রান্ত, পীড়িত, বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট আওরঙ্গজেব (১) দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিলেন।

অবসন্নচিত্ত আওরঙ্গজেব দেখিলেন যে, ভ্রাতৃরক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিয়া যে জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য পিতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া একাদিক্রমে দীর্ঘকাল দক্ষিণাপথে অবস্থান করাতে সাম্রাজ্যের উত্তরভাগে আওরঙ্গজেবের শাসনবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজে প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তথাপি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে নানাবিধ বিশৃ-ঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজপুতগণ সম্মিলিত হইয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণ ও মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া-ছিল। আগ্রার অদূরে জাঠগণ শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। শিখ জাতি ধীরে ধীরে অভ্যুত্থিত হইতেছিল। সে সময়ে শিখগণ মুলতানে বিল-ক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র দক্ষিণাপথ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ দক্ষিণাপথের অধিকাংশ নগর লুণ্ঠিত করিয়াছিল, গ্রামসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহাদের

(১) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

পদমর্দ্দনে শস্যক্ষেত্র তৃণশূন্য হইয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বল ও উচ্ছৃঙ্খল মোগলসৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে পাদশাহকে প্রাপ্য-বেতনের জন্য উত্যক্ত করিতেছিল। রাজকোষ শূন্য, অর্থাগমের পথ রুদ্ধ; সুতরাং সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না। (১)

আওরঙ্গজেব দেখিলেন, এক দিকে বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে, অপর দিকে মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মৃত্যুবিভীষিকায় ভগ্নহৃদয় আওরঙ্গজেব ব্যাকুল হইলেন; তিনি প্রিয়তম পুত্র কামবক্সকে লিখিলেন, "প্রাণাধিক, আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি, আমার সঙ্গে কেহ যাইবে না। তুমি নিরুপায় হইবে ভাবিয়া আমি শোকাকুল হইতেছি। কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইবে? আমি যত যন্ত্রণা দিয়াছি, যত পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, যত অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রত্যেকটির ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে। আমি পৃথিবীতে কিছু লইয়া আসি নাই, কিন্তু দুর্ব্বহ পাপের ভার মাথায় লইয়া যাইতেছি। আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে বর্ত্তমান দেখিতেছি। আমি মহা পাপিষ্ঠ, জানি না, পরলোকে আমি কত যন্ত্রণাভোগ করিব। মোসল-

---

(১) সৈন্যগণ কতদূর অশিষ্ট হইয়াছিল, এবং অর্থসংগ্রহের জন্য পাদশাহ কিরূপ ব্যতিব্যস্ত ও নিম্নগামী হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা নিম্নে লেনপুল সাহেবের পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"The army was for a long time very regularly paid. Zemilli Carreri, in 1695, says the troops were paid punctually every two months, and would not bear any irregularity. He (Aurang Zeb) says on one occasion to Zulfikar Khan, that he is stunned with clamour of these infernal foot soldiers who are croaking like crows in an invaded rookery. In another letter he reminds him of the wants of the exchequer and presses him for hidden treasures and to hunt out any that may have fallen into the hands of individual."

মানদিগকে বধ করিও না, এবং আমার মস্তকে সে কলঙ্কের ভার পতিত হইতে দিও না। আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রগণকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম। যাত্রাকালে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমি এখনও বড় বেদনা পাইতেছি। তোমার পীড়িতা মাতা উদিপুরী বেগম (১) সানন্দে আমার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। শান্তি!" আওরঙ্গজেবকে দীর্ঘকাল এই মানসিক অশান্তি ভোগকরিতে হয় নাই। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের আমেদনগরে মোগল পাদশাহ প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

আওরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত সম্রাট। তিনি বুদ্ধিমান, কার্য্যপটু ও পরিশ্রমী ছিলেন। (২) জেমেলী কারেরী নামক একজন পরিব্রাজক যে সময় আওরঙ্গজেবের দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। এই বিদেশীর বর্ণনায় জানা যায়, এই বৃদ্ধবয়সেও সম্রাট শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া, ওমরাহগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজকার্য্যের আলোচনা করিতেন। তিনি উপাধানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বিনাচশমায় আবেদন-পত্র পাঠ করিতেন, এবং নিজ হস্তে উহাতে মন্তব্য লিখিয়া দিতেন। তৎকালে তাঁহার আনন্দ-ব্যঞ্জক সহাস্যমুখ দেখিলে বোধ হইত, যেন তিনি অক্লান্তভাবে রাজ-কার্য্যের পরিদর্শন করিতেছেন। নব্বই বৎসর বয়সে আওরঙ্গজেব কাল-গ্রাসে পতিত হন। ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ বলেন, তখনও তাঁহার

---

(১) পাদশাহ জীবনে একমাত্র উদিপুরীকে ভাল বাসিয়াছিলেন। উদিপুরী জর্জ্জিয়া নিবাসিনী খৃষ্টান বালিকা। দারাশেকো তাঁহাকে দাসব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব উদিপুরীকে গ্রহণ করেন।

(২) আওরঙ্গজেব রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অবিশ্রান্তভাবে গুরুতর পরিশ্রম করি-তেন। তাদৃশ গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে আশঙ্কা করিয়া, একবার একজন

পঞ্চেন্দ্রিয় সতেজ ছিল, কেবলমাত্র শ্রবণশক্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু অন্যে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত না।

মোগল পাদশাহগণ সকলেই অল্লাধিক বিলাসপটু, মদিরাসক্ত ও বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। আকবর শাহের দুই পুত্র অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। জাহাঙ্গীরও প্রসিদ্ধ মদ্যপ ছিলেন। জাহাঙ্গীর পাদশাহের পুত্র শাহজাহান অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ছিলেন; তিনি বৃদ্ধবয়সে কারারুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁহার ভোগবিলাসের নিবৃত্তি হয় নাই। সুন্দরী রমণীর নৃত্যলীলায় ও সিরাজী মদিরার অত্যুগ্র সৌরভে কারাগারেও বৃদ্ধ শাহজাহান উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেন। রাজসংসারের দৃষ্টান্তে মোগল আমীর ওমরাহগণও ভোগবিলাসী হইয়াছিলেন। যে সকল মোগল বীর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতবিজয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরাক্রমশালী ছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব যে সময় পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন, তখন যাঁহারা মোগলদরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেন, তাঁহারা ব্যসনাসক্ত পারিষদে পরিণত হইয়াছিলেন। বাবরের অভিযানকালে সম্মুখে কোনও নদী পড়িলে তিনি সন্তরণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইতেন।

বিশিষ্ট ওমরাহ তাঁহাকে পরিশ্রমের পরিমাণ লঘু করিবার জন্য উপদেশচ্ছলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে আওরঙ্গজেব বলেন, "কোন বিপদ উপস্থিত হইলে প্রজার রক্ষার জন্য রাজার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি সাদি যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'রাজত্ব পরিত্যাগ কর, অথবা নির্দ্ধারণ কর যে, তোমরা ব্যতীত আর কেহ রাজ্যশাসন করিবে না।' যদি তুমি আমার প্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাকে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। স্বভাবতঃই আমরা আরামপ্রিয়; আমাদের এরূপ মন্ত্রণাদাতার আবশ্যক নাই। আমাদের মহিষিগণও আমাদিগকে বিশ্রাম ও বিলাসের কুসুমাবৃত পথে ভ্রমণ করিবার বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে।"

কিন্তু শাহজাহানের পারিষদগণ মহার্হ মখমলনির্ম্মিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এবং শিবিকাযোগে রণক্ষেত্রে গমন করিতেন। (১)

রাজসংসারের বিলাসে বৰ্দ্ধিত হইয়াও আওরঙ্গজেব ভোগলালসা সংযত করিয়াছিলেন। তিনি কখনও মদিরা স্পর্শ করেন নাই। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মোগল-দরবারে বিলাস-স্রোতের প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হন। এ জন্য তিনি ওমরাহবর্গের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। যদিও তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই, তথাপি তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় বিলাসতরঙ্গ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল। (২)

আওরঙ্গজেব বাহিক আচার ব্যবহারে কখনও এসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রের

---

(১) তৈমুরলঙ্গের স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়প্রকাশ করিলে তদীয় সভাসদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,—"By the favour of Almighty God we may conquer India, but if we establish ourselves permanently therein, our race will degenerate, and our children will become like the nation of those regions and in a few generations their strength and valour will diminish."

তৈমুরের সভাসদ্‌বর্গের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল।

(২) আওরঙ্গজেব ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চা রহিত করিবার অনুজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহাতে গায়ক, অভিনেতা ও নর্ত্তকী-সম্প্রদায় যে প্রণালীতে আপনাদের প্রতিকূল মতপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা কৌতুকাবহ। মোগল পাদশাহগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদের গবাক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে দর্শন দিতেন। একদা আওরঙ্গজেব তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি লোক সাড়ম্বরে সাধারণ সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে। কাহার সমাধির জন্য এত সমারোহ, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য পাদশাহ দুতপ্রেরণ করিলেন। প্রেরিত দূত ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল যে, সংগীতের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহাকে সমাহিত করিবার জন্য সংগীতের ভৃত্যগণ সমারোহে সমাধিক্ষেত্রে গমন করিতেছে। পাদশাহ প্রত্যুত্তরে বলেন, "ইহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাকে গভীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে বলিয়া দাও, যেন সমাধি হইতে কোনও শব্দ কখনও আমার কর্ণে না পঁহছে।"

অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করেন নাই। এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়ার যাহা কিছু করণীয়, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার প্রতিপালন করিতেন। এসলাম-শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালীতে তিনি প্রতি বৎসর কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধ এক লক্ষ মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। শুক্রবার, অন্যান্য পবিত্র তিথি ও রমজানে পাদশাহ উপবাস করিতেন। রমজানে প্রত্যহ রাত্রিকালে কোরাণপাঠে ও সাধুপুরুষগণের সংসর্গে অর্দ্ধরাত্রি যাপন করিবার নিয়ম ছিল। তিনি মক্কাযাত্রিগণের সুবিধার জন্য নানাবিধ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কখনও নিষিদ্ধ-মাংস ভক্ষণ করেন নাই। তিনি গীতবাদ্যের বিরোধী ছিলেন; কোনও গীতবাদ্য-ব্যবসায়ী আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতেন। পাদশাহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়িতেন, কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম হইত না। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তিনি পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্যে পরিবেষ্টিত, তখনও উপাসনার সময় উপস্থিত হইবামাত্র নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া প্রশান্তচিত্তে নমাজ পড়িতেন। মোহাম্মদের অনুশাসন অনুসারে কোনও বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে আওরঙ্গজেব স্বহস্তে টুপি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। কথিত আছে, তিনি ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কেবলমাত্র ৪৷৹ টাকা ব্যয় করিয়া নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেব বিদ্রোহোন্মুখ সেনাপতি ও পুত্রগণের দমনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে শান্ত করিতেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ খাফি খাঁর বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শাহজাদা আজিম স্বাধীনতাভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া, আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করিলেন। শাহজাদা আজিম ভীতিবিহ্বল হইয়া রাজাদেশপালনে বিলম্ব করেন।

আওরঙ্গজেব মৃগয়া-ব্যপদেশে কেবলমাত্র কতিপয় অনুচরসহ বহির্গত হইয়া বিদ্রোহোন্মুখ পুত্রকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তদনুসারে আজিম নির্দ্দিষ্ট মিলনস্থানের অভিমুখে যাত্রা করেন। আওরঙ্গজেব পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক রণনিপুণ যোদ্ধা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন। আজিম মিলনস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, সম্রাটের কৌশলে তাঁহার অনুচরসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। সম্রাটের শিবিরসম্মুখে উপনীত হইবার প্রাক্কালে তিন জন মাত্র অনুচর অবশিষ্ট ছিল। আজিম অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে কেহ অশ্বরক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল না, সুতরাং তিনি দুই জন অনুচরকে তথায় নিযুক্ত রাখিয়া, এক জন মাত্র অনুচর সহ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আওরঙ্গজেবের দর্শনলাভের পূর্ব্বেই আজিম ও তাঁহার একমাত্র অনুচর অস্ত্রপরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। আজিম ভীতিবিহ্বলচিত্তে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে পাদশাহ তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। আওরঙ্গজেব শিকারে বহির্গত হইবার জন্য বন্দুক হস্তে প্রস্তুত ছিলেন; তিনি পুত্রের হস্তে বন্দুক দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় বংশপরম্পরাগত একখানি অদ্ভুত তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া পুত্রের হস্তে দিয়া গ্রীষ্মাধিক্যের ভান করিয়া গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া পুত্রকে নিরস্ত্র-দেহ প্রদর্শন করিলেন। তাহার পর পাদশাহ পুত্রকে মহার্ঘ উপঢৌকনরাশি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। এই ঘটনার পর হইতে আজিম পাদশাহের পত্র পাইলেই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া কম্পিতহস্তে পাঠ করিতেন, এবং যতক্ষণ পত্রপাঠ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ তিনি স্থির হইতে পারিতেন না।

আওরঙ্গজেব নানাবিধ রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই রাজত্বকালে

বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। ইহার একমাত্র কারণ, তিনি অত্যন্ত আত্মপরায়ণ, স্বার্থান্ধ, পরধর্ম্মপীড়ক ও কপট শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু খাফি খাঁ আওরঙ্গজেবের সমস্ত বিফলতার অন্য কারণের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকগণকে উপহার দিয়া উপসংহার করিতেছি;—"তৈমুরবংশীয় নরপতিকুলে, এমন কি, দিল্লীর সমস্ত সুলতানের মধ্যে একমাত্র সেকেন্দর লোদী ব্যতীত আর কেহই ঈশ্বরনিষ্ঠা, বিলাসবিমুখতা ও ন্যায়পরতার জন্য আওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন না। সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিজ্ঞতায় কোন নরপতিই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন-প্রতিপালনে প্রবল অনুরাগ নিবন্ধন তিনি শাস্তিপ্রদানে বিরত থাকিতেন। শাস্তি না দিয়া রাজ্যশাসন করা যায় না। ঈর্ষ্যাবশে আমীর ওমরাহগণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার কার্য্যকল্পনায় কোনও ফলোদয় হয় নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যের সম্পাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইত, এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইত।"

মোগলের অধঃপতন।

অবতরণিকা।

এসিয়াখণ্ডে বিপুলবৈভবশালী বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে। এই সকল সাম্রাজ্য প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়তলে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা ও বাহুবলই এসিয়াখণ্ডের লোক-বিশ্রুত সাম্রাজ্য সমূহের মূলাধার ছিল। তাহার অভাব হইলেই রাজশক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িত। ভারতবর্ষেও এই নিয়মবশে ভূতলে অতুল মোগল-সাম্রাজ্য উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়াছে। বাবরের অসাধারণ প্রতিভা ও অজেয় বাহুবলই, ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করে। হিন্দুজাতি তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সিংহাসন তাহাদের হৃদয়তলে সংস্থাপিত হইতে পারে নাই। প্রজাহিতকর শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন জন্য অবসর প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাবর অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হন। বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ূনের তাদৃশ প্রতিভা ও বাহুবল ছিল না। এজন্য বাবরের অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নবপ্রতিষ্ঠিত মোগল-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। হুমায়ূন শক্তিশালী শত্রুর প্রথম আক্রমণেই হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত হন। তার পর সমদর্শী আকবর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বহু সাধনায় হিন্দু মোসলমান, তুর্কি, পাঠান, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি নানাজাতি,—নানা সম্প্রদায়কে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার মোগল সাম্রাজ্যের সংগঠন করেন। সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপি সাধনার পর আকবর সুগঠিত, সুশাসিত, সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত প্রবল

প্রতাপ ছিল। কিন্তু রাজকুমার সেলিম (জাহাঙ্গীর) তাদৃশ অতুল প্রতাপান্বিত পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আকবরের পরলোক গমনের পর রাজকুমার সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সাম্রাজ্যাধিপতি হন। সেনাপতি মহাবত খাঁ ও রাজকুমার খরম (শাহজাহান) বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজকুমার খরম শাহজাহান নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক বিপুল বিক্রমে রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই তদীয় পুত্রগণ রাজ্য লালসায় পরস্পরের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃরক্ত-রঞ্জিত-হস্তে পিতার মস্তক হইতে রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পুত্রগণ পিতার অনুসরণ করিতে পারেন, এই ভয়ে আওরঙ্গজেব সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। ফলতঃ, মোগল-শাসন-কালে রাজকুমারগণের বিদ্রোহাচরণ সহজ সাধ্য ছিল; ইহা মোগল-শাসনের মূলগত দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মোগল-সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে ব্যাপকতার অভাব ছিল, পাদশাহ নিজে রাজ্য শাসন জন্য যে মন্ত্রগ্রহণ করিতেন, রাজপুরুষগণ তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন না। তাঁহারা সময় সময় স্বার্থপরতার একশেষ প্রদর্শন করিতেন। মোগল রাজকুমারগণের পক্ষে বিদ্রোহ অবলম্বন করা একরূপ নিয়মে পরিণত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এজন্য উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন প্রকার স্থিরতা থাকিত না। ইহার ফলে রাজকার্য্যে অনেক সময় শৃঙ্খলার অভাব ঘটিত, এবং রাজপুরুষগণ রাজাদেশ প্রতিপালনে অমনোযোগী হইতেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধীন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ মোগল রাজ্যের অনুগত ছিলেন না; কেবল মাত্র বাহুবলের

অভাবে মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সেনাপতিই জায়গীর ভোগী ছিলেন। দিল্লীর আদেশ প্রতিহত করিতে পারিলেই তাঁহাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইত।

এই সকল দৌর্ব্বল্যের অভ্যন্তরে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস বীজ নিহিত ছিল। আওরঙ্গজেবের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন এই ধ্বংসবীজ উপ্ত হয়। তাঁহার হৃদয় বেগশালী ছিল না; তিনি সন্দিগ্ধ স্বভাবের জন্য রাজপুরুষগণের অপ্রিয় এবং ধর্ম্মবিদ্বেষ ও পরপীড়নের জন্য হিন্দু জাতির ঘৃণ্য ছিলেন। কর্ম্মক্লিষ্ট পাদশাহ বৃদ্ধ বয়সে কোন বিষয়েই শান্তি পাইতেন না। তাঁহার সঙ্গে কাহারও সহানুভূতি ছিল না। তিনি নিজেও, কি আত্মীয় স্বজন, কি রাজপুরুষ,—কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; এবং তাঁহাদের মধ্যেও কেহ তাঁহার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। আরওঙ্গজেবের দুর্লোভ নিবন্ধন সুদীর্ঘ কালব্যাপি যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ইহার ইন্ধন সংগ্রহ করিতে অসংখ্য সৈন্য ধ্বংস এবং রাজকোষ শূন্য হয়। তাঁহার ধর্ম্মবিদ্বেষ ও তন্মূলক অত্যাচার বশতঃ হিন্দুজাতির স্বাধীনতা-লাভ বাসনা এবং ধর্ম্মবিদ্বেষ একসঙ্গে জাগরিত হইয়াছিল; ইহাতে তাহারা নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। এই সকল কারণে, মোগল-রাজ-শক্তি ক্রমশঃ অবনত হইতে আরম্ভ করে। আওরঙ্গজেবের মনোবল, তেজস্বিতা, শাসনপটুতা যথেষ্ট ছিল। এজন্য তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, তাঁহার ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার পূর্ব্বে, মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রতিভাত হয় নাই। (১)

(১) After that (death of Aurangzeb) the Prince (Bedar Bakt,

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতের অক্ষয়ভূষণ মহাপুরুষ শিবাজি মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ে অভিনব জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণগত সাধনার ফলে কৃষিজীবী মহারাষ্ট্রগণ অপূর্ব্ব বলদৃপ্ত সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এই বলদৃপ্ত সৈন্যের সহায়তায় মোগল-সাম্রাজ্যের পার্শ্বেই এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র দক্ষিণাপথে মোগলের বিজয়-পতকা উড্ডীন হইয়াছিল। তত্রত্য শাসন কার্য্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মহারাষ্ট্র শক্তি ধ্বংস করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে পাদশাহ জীবনের শেষভাগ দক্ষিণাপথে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এক কাশ্মীর ব্যতীত আর কোন হিমালয় প্রদেশে মোগলের আধিপত্য বদ্ধমূল ছিল না। একারণ মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসার্থিগণের পক্ষে পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বল সঞ্চয় করিবার সুবিধা ছিল। পঞ্জাব প্রদেশে মহাপ্রাণ গোবিন্দসিংহের প্রতিভাবলে শিখগণ জাতিভেদ ভুলিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া যুদ্ধ-কৌশলে পটু হইয়া ধর্ম্ম-দীপ্ত সামরিক জীবন লাভ করে, এবং মোগল-রাজশক্তির বিনাশসাধনপূর্ব্বক তাহার অস্তগত গৌরব-রবির পশ্চাতে এক অভিনব রাজ্যের গঠন করিয়া শান্তি ও প্রেমের পূর্ণচন্দ্র সমুদিত করিতে বদ্ধ পরিকর হয়।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ দুর্ব্বল হৃদয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা রাজপুরুষদিগকে শক্তিসহকারে পরিচালনা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য আত্মপরায়ণ ও কলহপ্রিয়

---

grand Son of Aurangzeb) said to Murid Khan, you all know that realm of Hindustan will now fall into anarchy. People did not know the value of the Emperor Khaf Khan.

মন্ত্রিসমাজের উপর নির্ভর করিতে হইত। প্রজাবিদ্রোহ পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান, মন্ত্রী আত্ম-হিত-চিন্তায় মগ্ন, ইহাই শেষ দশায় মোগল-শাসনের অঙ্গ হইয়াছিল।

এই সকল কারণে, আওরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী দিল্লীর ইতিহাস কেবল মাত্র অধঃপতনের বিবরণে পরিপূর্ণ; কিন্তু সে বিবরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আদ্যন্ত নানারসে আপ্লুত। এক্ষণে আমরা সে কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাহাদুর শাহ।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিংশ দিবসে বৃদ্ধ আওরঙ্গজেব কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী নিয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় মোয়াজিম পাদশাহের মৃত্যুকালে কাবুলের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয় পুত্র আজিম শাহজাদা মোয়াজিমের সহোদর ভ্রাতা, এবং পাদশাহের মৃত্যুকালে দক্ষিণাপথে রাজশিবিরে উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া, রাজপুতগণের সঙ্গে সম্মিলিত হন, এবং তার পর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পরিয়া, পলায়ন পূর্ব্বক মক্কায় গমন করেন। ইহার পর, তিনি আর কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। পঞ্চম পুত্র কামবক্স পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার মৃত্যুকালে বিজাপুরের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

পাদশাহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে শাহজাদা আজিম অবিলম্বে আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন, এবং সসৈন্যে আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হন। এদিকে শাহজাদা মোয়াজিমও

পিতার পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া অলস রহিলেন না। তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিয়া, সসৈন্যে লাহোরে আগমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া, স্বীয় বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুনিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পুত্রকে আগ্রার দুর্গ অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য ও গোলন্দাজ লইয়া দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা তাঁহাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিল। তিনি রাজকোষের প্রচুর ধন রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, দলে দলে তাঁহার-পতাকামূলে সমাগত হইতে লাগিল। অন্যদিকে আজিমের ধনলিপ্সা এবং তাঁহার পুত্র ও সেনাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন জনসাধারণ বিরক্ত হইয়া উঠিল। মোয়াজিম দিল্লীনগরী পরিত্যাগ করিরা মথুরায় আগমন করিলেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া আজিমকে অর্দ্ধ সাম্রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শান্তিপ্রিয় ও মৃদুস্বভাব মোয়াজিমের প্রস্তাবে তাহার ভ্রাতার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইল। তিনি অবজ্ঞাভরে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ভ্রাতৃরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিবার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঢোলপুর ও আগ্রার মধ্যপথে উভয় সৈন্যের তুমুল সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। আজিম রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, বিজয়-লক্ষ্মী মোয়াজিমের অঙ্কশায়িনী হইলেন। হত্যাকারী সেনা-নায়ক পুরস্কার লোভে আজিমের ছিন্নশির মোয়াজিমের নিকট আনয়ন করিলেন। তিনি ভ্রাতার ছিন্ন শির দর্শনে অধীরচিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃহন্তাকে তিরস্কার করিয়া মৃতদেহ রাজকীয় সমারোহে সমাধিস্থ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অতঃপর শাহাজাদা মোয়াজিম বাহাদুর শাহ উপাধিধারণ করিয়া

পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রথমেই আপন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুনিম খাঁকে "খান খানান" উপাধি ও প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। নূতন সম্রাট এই শঙ্কটকালেও সদাশয়, দয়ার্দ্রচিত্ত, অমায়িক ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষীয় বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আজিমের পুরমহিলাগণের সঙ্গেও সদ্ব্যবহারের একশেষ করেন। বেগম খুদিসা জেব উন্নিসাকে পাদাশাহবেগম উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দেন।

রাজনীতি বিশারদ মুনিম খঁা অবিলম্বে রাজ্যের শাসন-প্রণালী সংস্কার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ পাদশাহ পিতামহ শাহজাহানের ন্যায় সাড়ম্বরে দরবারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজ সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে তাঁহার সপ্তদশ জন পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র আসন পরিগ্রহ করিতেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে বিজিত রাজকুমারগণ দণ্ডায়মান থাকিতেন। সভামণ্ডপ সর্ব্বদা বিচিত্র সজ্জায় ভূষিত ও আমীর ওমরাহগণে পরিশোভিত হইয়া সমুজ্জ্বল থাকিত। পাদশাহ তাঁহাদিগকে সময় সময়, নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিয়া আপনার বৈভব ও দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেন। একজন ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, "কেমন করিয়া আমি সেই দিল্লী দরবারের সমুজ্জ্বল দৃশ্যের বর্ণনা করিব?"

পাদশাহ বহু রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যদি সমগ্র হিন্দুজাতি আওরঙ্গজেবের অবিমৃষ্যকারিতায় মোগল-শাসনে বীতস্পৃহ না হইত, তবে বাহাদুর শাহ অমায়িকতাগুণে হিন্দু বীরগণের সহায়তা লাভ করিতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কৃতকার্য্যে হিন্দুজাতির মোসলমানবিদ্বেষ ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। যদিচ তাঁহার শাসনকালে এই

বিদ্বেষ প্রকট হইতে পারে নাই, তথাপি ইহা প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে ধূমায়মান হইতেছিল, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরই অবিলম্বে উহা প্রজ্জ্বল আকার ধারণ করিল। আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই রাজপুত-ও জাঠ জাতি মোগলের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিয়াছিল। এক্ষণ পঞ্চনদ ভূমির নব প্রতিষ্ঠিত শিখ-শক্তি দিল্লীর ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই সকল প্রকাশ্য শত্রু হইতে পাদশাহের প্রথম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল না। গৃহ-শত্রুই তাঁহাকে প্রথমে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনারোহণ কালে আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র অস্থির-মতি কাম বক্স বিজাপুরের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি ভ্রাতার সৌভাগ্য সন্দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। তিনি কখন কখন তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিতেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে পাদশাহের পক্ষাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহাদিগকে অনর্থক শাস্তি দিয়া ও ভ্রাতাকে দাম্ভিকতাসূচক পত্র লিখিয়া অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন। এই ভাবে বৎসরাধিক গত হইলে, পাদশাহ তাঁহাকে শান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া (১৭০৮ খৃঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বিনা রক্তপাতে বন্দী করিয়া আনিতে মুনিম খাঁকে আদেশ দিলেন। কামবক্স তাঁহাদের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থ রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। এই সময়, আওরঙ্গজেবের প্রাচীন সেনাপতি জুলফিকর খাঁ দক্ষিণাপথে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কামবক্সের মনোমালিন্য ছিল। তিনি সসৈন্যে রাজকুমারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মুনিম খাঁ তাঁহাকে বারণ করিয়া রাজাদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়, পাদশাহ আহারান্তে দিবা-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এজন্য রাজাদেশ পাইতে বিলম্ব হইল। জুলফিকর খাঁ রাজানুমতি গ্রহণ না করিয়াই, কামবক্সকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। অগত্যা মুনিম খাঁও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজকুমার রণক্ষেত্রে শৌর্য্য-বীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। তিনি অত্যধিক রক্তমোক্ষণে অচিরে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; জুলফিকর খাঁ তাঁহাকে তদবস্থায় বন্দী করিয়া রাজ-শিবিরে লইয়া গেলেন। একজন সুবিজ্ঞ ইউরোপিয়ান চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অভিমানী কামবক্স কাহারও শুশ্রূষা অথবা কোন প্রকার পথ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যাকালে পাদশাহ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, নিজের কোর্ত্তা দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। ইহার পর স্নেহশীল পাদশাহ বলিলেন, "আমার ভ্রাতাকে যে এ অবস্থায় দেখিব, তাহা কখনও ভাবি নাই।" তদুত্তরে কামবক্স অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "তৈমুরবংশীয় রাজকুমার যে কাপুরু-ষতা ও ভীরুতার অপবাদ মস্তকে লইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইবে, আমিও তাহা ভাবি নাই।" অতঃপর পাদশাহ স্বহস্তে তাহাকে মাংসের কিঞ্চিৎ তরল সার পান করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাষ্পাকুল-লোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই রাত্রিতেই অভিমানী রাজকুমার কালগ্রাসে পতিত হন।

অতঃপর পাদশাহ জুলফিকরকে দক্ষিণাপথের সুবাদারের পদ প্রদান করিয়া, রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। জুলফিকর মহা-রাষ্ট্রীয়দিগকে মোগলের অনুকূল করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে কামবক্সের সঙ্গে যুদ্ধকালে রাজপক্ষাবলম্বী মিনহাজ সিন্ধিয়াকে

বহু রাজসম্মানে ভূষিত করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্র-সেনাপতিদের মধ্যে কোন কারণে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল, জুলফিকর খাঁ এক পক্ষ এবং মুনিম খাঁ অপর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পাদশাহ চক্ষুলজ্জা বশতঃ কাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এই দ্বন্দ্ব উপলক্ষে সামন্তবর্গ সমস্ত দক্ষিণাপথ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য দিকে রাজপুতগণের মোগল বিদ্বেষ ক্রমশঃ নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া শাসনকার্য্যে বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে লাগিল; নব-প্রতিষ্ঠিত শিখজাতির অস্ত্র সঞ্চালনে মোগলশক্তির ভিত্তিভূমি পঞ্চনদ প্রদেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

বাহাদুর শাহ রাজপুত ও শিখ উভয়শক্তির সঙ্গে এককালে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এজন্য যে কোনরূপে রাজপুত জাতির সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে শিখকে পর্য্যুদস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অম্বর ও যোধপুরের অধিপতিদিগকে দরবারে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মোগল দরবারে উপনীত হইলে পাদশাহ তাঁহাদের সমস্ত অসন্তোষের কারণ নিবারণ করিয়া রাজপুত জাতির সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু অধিপতি যুগল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উদয়পুরে গমন করিয়া রাণার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। মহাত্মা টড নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, এই ত্রিসম্মিলনের ফলে বাবরের সিংহাসন ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পর মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলের গৃহকলহোপলক্ষে পক্ষভুক্ত হইয়া বিবাদের মূলীভূত সাম্রাজ্যের অধিকাংশ গ্রাস করিতে সমর্থ হন।

যাহা হউক, রাজপুতগণের সঙ্গে শান্তি সংস্থাপন করিয়া বাহাদুর শাহ উদীয়মান শিখ জাতিকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আপনার সমস্ত

শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন। প্রধান মন্ত্রী মুনিম খাঁ শিখ-দিগকে মন্থন করিতে বিপুলবাহিনীসহ গমন করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর শিখ সৈন্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল; ও তাহাদের অধিনেতা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। মুনিম খাঁ বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই মুনিম খাঁ (১) পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মন্ত্রি-নিয়োগ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইল। শাহজাদা আজিম ওস্থান পরলোকগত উজীরের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের সুবাদার জুলফিকর খাঁকে মন্ত্রী পদ প্রদান করিয়া উজীরের পুত্রদ্বয় মধ্যে একজনকে সৈন্যের অধিনায়কত্ব ও অপর জনকে দক্ষিণাপথের শাসন কর্ত্তৃত্ব দিবার প্রস্তাব করিলেন। জুলফিকর খাঁ প্রায় স্বাধীনভাবে দক্ষিণাপথের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, এজন্য তিনি শাসনকর্ত্তৃপদ পরিত্যাগ করিয়া উজীরের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। আজিম ওস্থান অন্য কাহাকেও উজীর নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বহুদর্শী ও কার্য্যপটু ছিলেন না। এজন্য রাজকার্য্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল। আমরা এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। মুনিম খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাদশাহ

---

(১) মুনিম খাঁ সুফিমতাবলম্বী এবং দরিদ্র বন্ধু ছিলেন। তিনি সমস্ত জীবনে কখনও কাহাকেও কোন কারণে মনঃক্ষুণ্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য প্রত্যেক সহরে একটি করিয়া মস্‌জিদ্ ও সরাই নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করেন। এজন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের কার্য্য দোষে ভূমি গ্রহণোপলক্ষে অনেক স্থানে নানা প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। সৎ-কার্য্যোপলক্ষেও যে মানুষ উৎপীড়িত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ খাফি খাঁ এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

খোতবায় আলীর নামের শেষে "ওয়ালী" শব্দ যোগ করিতে আদেশ করিলেন। "ওয়ালী" শব্দের অর্থ—উত্তরাধিকারী। পাদশাহ শিয়া সম্প্রদায়ের সন্তোষ বিধান জন্যই "ওয়ালী" শব্দ যোগ করিতে আদেশ করেন। ইহাতে ইহাই স্বীকৃত হয় যে, মহাত্মা আলী প্রেরিত মহা-পুরুষ মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই রাজাদেশে সমগ্র সুন্নি সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এবং নানা স্থানে উৎপাতের সূত্রপাত করে। আমেদাবাদের খোতবা পাঠক নৃশংসভাবে নিহত হয়। শাহ-জাদা আজিম ওস্থান গোপনে গোপনে বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে মিলিত ছিলেন। লাহোরেই সুন্নি-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলা-কার ধারণ করে। এজন্য বাহাদুরশাহ হাজি ইয়ার মোহাম্মদ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান সুন্নিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তাঁহারা উপস্থিত হইলে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইল। হাজি ইয়ার মোহাম্মদ রাজ-সভার আদব কায়দা উল্লঙ্ঘন করিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ ভাবে কথা কহিতে ভীত হইতেছ না?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি সৃষ্টি কর্ত্তার নিকট চারিটি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, (১) জ্ঞানার্জ্জন, (২) ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন, (৩) তীর্থ পর্য্যটন, (৪) ধর্ম্ম রক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁহার কৃপায় আমার তিনটী প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। ন্যায়পরায়ণ রাজার অনুগ্রহে শেষটিও পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। বহুবিচার বিতর্কেও কোন ফল হইল না। সুন্নি-সম্প্রদায় বলসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। আজিম ওস্থান প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করায়, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষ্যা-নলে জ্বলিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রা, রাজপুত, শিখ, সকলেই দিল্লীর রাজশক্তি ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত ছিলেন। বাহাদুর শাহ চারিদিকেই

এইরূপ নানাভাবে বিব্রত হইয়া সুন্নি-সম্প্রদায়কে শান্ত করিবার জন্য স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করিলেন।

সুন্নি-সম্প্রদায়ের গোলযোগ উপশমিত হইতে না হইতেই পাদশাহ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন, এবং রাজকুমারগণ চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গন্ধলুব্ধ শকুনি পালের ন্যায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তাঁহারা সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন; রাজপুরুষগণ স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষকের পক্ষাশ্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ শঙ্কটকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃদুস্বভাব আড়ম্বরপ্রিয় বাহাদুর শাহ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্ব হ্রাসপ্রাপ্ত এবং অর্থাগমের অন্যান্য পথ বহুল পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পাদশাহের দানশীলতার বিরাম ছিল না। এ কারণ রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। পাদশাহ চক্ষুলজ্জা বশতঃ কাহারও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান অথবা কাহারও ত্রুটী সংশোধন করিতে পারিতেন না বলিয়া রাজগৌরবও প্রভাহীন হয়। (১)

বাহাদুর শাহের পরলোক গমনের পর অরাজকতার রাজত্ব আরম্ভ হইল, চারি দিকে বিভীষিকার ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনেকে

---

(১) খাফি খাঁ তাঁহার চরিত্র বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন,—"For jenerosity, munificence, boundless good nature, extenunation of faults, and forgiveness of offences very few monarchs have been found equal to Bahadur Shah in the histories of the past times, and specially in the race of Timur. But though he had no vice in his character, such complacency and such negligence were exhibited in the protection of the state and in the government and the management of the country, that worthy sarcastic people found the date of his accession in the words Shah-i-he Khabr," Heedless King."

ভয়ে সপরিবারে সহর পরিত্যাগ করিল। রাজপথে জনপ্রবাহাধিক্য নিবন্ধন গমনাগমন দুঃসাধ্য হইল। সৈন্যগণ বাকী বেতনের জন্য চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল ; কেহই কাহাকেও সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল না। দুর্ব্বৃত্তদের "প'বার" উপস্থিত হইল, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। এই সর্ব্বব্যাপী অরাজকতার মধ্যে রাজকুমার

জাহান্দর শাহ

দক্ষিণাপথের প্রবল সুবাদার জুলফিকর খাঁর সহায়তায় পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। জুলফিকর খাঁর প্রবল প্রতাপে অচিরে সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইল। নবাভিষিক্ত সম্রাটের ভ্রাতৃগণ ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়া দিলেন। তিনি রাজপদে আসীন হইয়া জুলফিকরকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণাপথের শাসন কার্য্যে স্বীয় প্রতিনিধি দ্বারা নির্ব্বাহ করাইবার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে তিনি দায়ূদ খাঁকে দক্ষিণাপথে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক স্বকার্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জুলফিকরের পিতা আসদ খাঁ জীবিত ছিলেন ; তিনি উকীল ই-মুৎলক (সম্রাটের প্রতিনিধি) উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া রাজপ্রসাদ লাভ করিলেন।

জাহান্দর শাহের সিংহাসনারোহণের অল্প পরেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার ন্যায়বিলাসপটু, কর্ম্মবিমুখ ও আত্মপরায়ণ শাসনকর্ত্তা আর কখনও বাবরের রাজতক্ত কলঙ্কিত করেন নাই। জাহান্দর শাহ একজন নীচ প্রকৃতি কুলটার আয়ত্ত ছিলেন, এই রমণী তাঁহার উপপত্নী,—তাহার নাম লাল কুয়র। রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি লালকুয়র ও তাহার আত্মীয় অন্তরঙ্গের হস্ত ক্রীড়নকে পরিণত হইয়া

পড়িলেন। তিনি প্রিয়তমা উপপত্নীর মনস্তুষ্টি বিধান জন্য অর্থ ও স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বার্ষিক দুই কোটি টাকা তাঁহার বৃত্তি বরাদ্দ হইল। তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মণিমুক্তার মূল্য স্বতন্ত্রভাবে রাজকোষ হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইল। পাদশাহ লাল কুয়রের ভ্রাতাকে এলাহাবাদের শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু উজীর তাহার নিয়োগপত্র প্রদান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এজন্য লাল কুয়র তাঁহার বিরুদ্ধে পাদশাহকে বলিয়া দিলেন। পাদশাহ তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা, রাজপুরুষ-গণ উৎকোচ গ্রাহী, উৎকোচ না পাইলে তাঁহারা কোন কাজ করেন না।" পাদশাহ ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার উপপত্নীর নিকট আপনি কি উৎকোচ প্রত্যাশা করেন? জুলফিকর বলিলেন, এক সহস্র সেতারি ও ওস্তাদ-ই-নক্কাশি (Drawing master) আমার উৎকোচের পরিমাণ।" পাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন?" জুলফিকর খাঁ তদুত্তরে বলিলেন, "আপনি আমাদের ন্যায় রাজপুরুষগণের প্রাপ্য পদ তাহাদিগকে প্রদান করিতে-ছেন; অতএব আমাদের পক্ষে তাহাদের ব্যবসায় শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে।" পাদশাহ এই উত্তরে ঈষদ্ হাস্য করিয়া আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। পাদশাহ নিজে বিলাসস্রোতে নিমগ্ন হইয়া রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং তদীয় মন্ত্রিগণও তাঁহার দুর্ব্ব্যব-হারে বিরক্ত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন হইয়াছিলেন। জাহান্দর শাহের অল্প পরিসর রাজত্বকালে অত্যাচার ও ব্যভিচারের পূর্ণ প্রভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। (১) জুলফিকর খাঁর দেওয়ান ও কর্ম্মনায়ক

(১) খাফি খাঁ তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It was a fine time for

শম্ভুচাঁদ এরূপ অকথ্য অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন যে, তাঁহার নিশ্বাস স্পর্শে নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে কলুষিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

ঈদৃশ রাজত্ব শীঘ্রই শেষ দশায় উপনীত হইল। জাহান্দর শাহের সিংহাসনারোহণ কালে আজিম ওস্যানের পুত্র ফরক শিয়র বঙ্গদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। একারণ তাঁহাকে তৈমুর বংশীয় অন্যান্য রাজকুমারের ন্যায় ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় নাই। জাহান্দর শাহের রাজত্বের তৃতীয় মাসে তিনি রাজ সিংহাসন অধিকার কল্পে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় আজিমওস্যানের প্রিয়পাত্র সৈয়দ কুলোদ্ভব হোসেন আলী খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এবং তদীয় ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্যা খাঁ এলাহাবাদের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ফরক শিয়র বিহারে পঁহুছিয়া দীনভাবে হোসেন আলী খাঁর সহায়তা প্রার্থী হইলেন। তিনি স্বীয় প্রভু পুত্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইহার পর আবদুল্যা খাঁও তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। এলাহাবাদের পার্শ্বদেশে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জুল ফিকর খাঁ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আমীর ওমরাহই জাহান্দর শাহের দুশ্চরিত্র, কুসংসর্গ লিপ্সা ও দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তাঁহার ধ্বংসকামী হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রসন্নচিত্তে অস্ত্রধারণ করিলেন না। এ দিকে অশ্রান্ত বাণ

---

minstrels and singers, and all the tribes of dancers and actors There seemed to be likelihood that Kazis would turn toss pots, and Muftis become tipplers."

বর্ষণে লালকুয়র ও গাথকদের হস্তীগুলি অশান্ত হইয়া উঠিল। এই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে জাহান্দর শাহের হস্তীও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন তিনি ভয় ব্যাকুলচিত্তে লালকুয়রকে সঙ্গে লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গোপনে পলায়ন করিলেন। ইহার পর রাজ-পক্ষাবলম্বী সেনানায়কগণ একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। এ কারণ জুলফিকর খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধভঙ্গ করিয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জাহান্দর শাহ শ্মশ্রুমুণ্ডন করিয়া ছদ্মবেশে দিল্লীতে উপনীত হইলেন, কিন্তু অত্যধিক ভীরুতা নিবন্ধন দুর্গে প্রবেশ না করিয়া আসদ খাঁর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জাহান্দর শাহের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী ভাবী সম্রাটের শুভদৃষ্টি লাভ করিবার কল্পনায় তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

ফরকশিয়র।

রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী লাভ করিয়া (১) ফরকশিয়র রাজ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার আদেশে জাহান্দর শাহ, জুলফিকর খাঁ ও তদীয় পিতা আসদ খাঁ নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। আওরঙ্গজেবের আত্মপরায়ণতা ও পরধর্ম্ম বিদ্বেষ নিবন্ধন অতুল মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হয়, বাহাদুর শাহের দুর্ব্বলতা এবং জাহান্দর শাহের ব্যভিচার সে অধঃপতনের পথ প্রসর করে; তারপর ফরক শিয়রের সিংহাসনারোহণের মুহূর্ত্ত হইতে তৈমুর বংশের বিনাশের দিন দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

---

(১) এই বিজয়শ্রী লাভ করিতে ফরক শিয়রের পক্ষীয় বহুলোক হতাহত হইয়াছিল। স্বয়ং হোসেন আলী খাঁ আহত হইয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পতিত হন। যুদ্ধাবসানে সকলে তাঁহাকে মৃতদেহ রাশির মধ্যে খুঁজিতে আরম্ভ করে। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। জয়লাভের শুভ সংবাদ তাঁহার অবসন্ন দেহে সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন করে, তিনি অচিরে সুস্থ হন।

ফরক শিয়র রাজপদে আসীন হইয়া হোসেন আলী খাঁকে মীর বক্সীর পদে এবং আবদুল্যা খাঁকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। সৈয়দ যুগল তাঁহার রাজ্য লাভের মূলাধার ছিলেন, এই হেতু তাঁহাকে নামে মাত্র সম্রাটরূপে সম্মান করিয়া আপনারাই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

নূতন সম্রাট অপরিণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ, ভীরু স্বভাব ও দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। যিনি সর্ব্বশেষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, দুর্ব্বলচিত্ত পাদশাহ ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে অসমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইতেন। তাঁহার এই দুর্ব্বল স্বভাব সৈয়দ যুগলের অখণ্ড প্রভুত্বের অন্তরায় স্বরূপ ছিল। তাঁহারা প্রথমতঃ পাদশাহের তাদৃশ স্বভাবের বিষয় অনুভব করিতে পারেন নাই। এ জন্য তাঁহারা মন্ত্রণাদাতা রাজপুরুষ-দিগকে দূরে রাখিতে যত্ন করেন নাই। মুলতান নিবাসী মীর জুম্লা বঙ্গদেশের কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফরক শিয়রের সিংহাসনা-রোহণের অব্যবহিত পরেই এই ব্যক্তি তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে হোসেন আলী খাঁ যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহাত্মা টড লিখিয়াছেন যে, অজিত সিংহের হস্তে মোগল সৈন্য পরাজিত হয়, এবং সেনাপতি হোসেন আলী খাঁ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। কিন্তু মোসলমান ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মীর জুম্লা প্রথম হইতেই সৈয়দ যুগলের ক্ষমতা ধ্বংসের অভিলাষী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই হোসেন আলী খাঁকে দরবার হইতে দূরে রাখিবার অভিপ্রায়ে মীর জুম্লার মন্ত্রণায় যোধপুরাধিপতির বিরুদ্ধে তাঁহার অধীনে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। মোগল সৈন্যের

আগমনে অজিত সিংহ ভীতিবিহ্বল হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হন। পাদশাহ মীর জুম্লাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন; তিনি প্রকাশ্যভাবেই বলিতেন যে, মীর জুম্লার বাক্য ও স্বাক্ষর তাঁহার নিজের বাক্য ও স্বাক্ষরের তুল্য। মীর জুম্লা একজন ন্যায়নিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; তিনি পাদশাহের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার হস্তেই নিয়োগভার ন্যস্ত ছিল। এই বন্দোবস্ত উজীর আবদুল্যা খাঁর স্বার্থের বিরোধী ছিল বলিয়া তিনি উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু অধিকাংশ আমীর ওমরাহ পাদশাহ ও তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর পক্ষাবলম্বন করেন। আবদুল্যা খাঁ দরবারের মতি গতি দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, হোসেন আলী খাঁ অচিরে রাজধানীতে প্রতিগমন না করিলে তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবি। একারণে তিনি হোসেন আলী খাঁকে রাজধানীতে উপনীত হইবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। অজিত সিংহের সন্ধিপ্রার্থী হইবার সমসময়ে পূর্ব্বোক্ত পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। এ জন্য তিনিও সন্ধি সংস্থাপনার্থ উদ্‌গ্রীব হন। ইহার পর উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, এবং অজিত সিংহ স্বীয় কন্যাকে পাদশাহের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য মোগল সেনাপতির সঙ্গে রাজধানীতে প্রেরণ করেন।

হোসেন আলী খাঁ রাজপুতনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ক্ষমতা লাভ প্রয়াসী উভয় দলমধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহাতে পাদশাহ একান্ত বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইলেন। তিনি এই বিবাদের মূলোচ্ছেদ উদ্দেশ্যে প্রথম দলের চালক হোসেন আলীকে ও দ্বিতীয় দলের চালক মীর জুম্লাকে রাজদরবার হইতে দূরে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। তদনুসারে হোসেন আলী খাঁ দক্ষিণাপথের এবং মীর জুম্লা বিহার প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। হোসেন আলী খাঁ

দক্ষিণাপথে গমন করিবার সময় পাদশাহকে বলিলেন, "আমার অনুপস্থিতিতে মীর জুম্লাকে দরবারে আহ্বান অথবা আমার ভ্রাতার সঙ্গে কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করিবেন না। ইহার অন্যথাচরণ হইলে আমি তিন সপ্তাহ মধ্যে সসৈন্যে আসিয়া পঁহুছিব।"

জুলফিকর খাঁ পাদশাহের আদেশে নৃশংসভাবে নিহত হইলে তদীয় প্রতিনিধি দায়ূদ খাঁ দক্ষিণাপথের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। হোসেন আলী খাঁ তথায় গমন করিলে তিনি পাদশাহের ইঙ্গিতে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তুমুল যুদ্ধের পর দায়ূদ খাঁ নিহত হইলেন। অতঃপর হোসেন আলী খাঁ শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সংবাদ রাজধানীতে পঁহুছিলে পাদশাহ বিমর্ষচিত্তে বলেন, "এরূপ সুবিখ্যাত প্রশস্তমনা বীরের মৃত্যু দুঃখজনক।" ইহাতে আবদুল্যা খাঁ উত্তর করেন, "আফগানের হস্তে আমার ভ্রাতার প্রাণনাশ হইলে জাঁহাপনা সুখী হইতেন।" (১)

এই সময় শিখ জাতি পুনর্ব্বার মস্তকোত্তলন করিয়া লাহোর হইতে আম্বালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র প্রদেশ অধিকার করিল। পাদশাহ শিখ

---

(১) বাস্তবিকই দায়ূদ খাঁ প্রশস্তমনা ছিলেন। একবার আমেদাবাদে কতিপয় মোসলমান একজন হিন্দু অধিবাসীর গৃহপার্শ্বে গো-হত্যা করায় হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া একজন মোসলমান বালককে হত্যা করে। ইহার ফলে উভয় পক্ষ দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয়। দায়ূদ খাঁ এই ব্যাপারে হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করেন। আমরা এ স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে একটি রোমান্টিক গল্পের অবতারণা করিতেছি। এই গল্পে তাঁহার হৃদয়ের প্রণয়শীলতার আভাস পাওয়া যায়। একবার তিনি উপহার স্বরূপ এক সুন্দরী হিন্দু বালিকা প্রাপ্ত হন। দায়ূদ খাঁ তাঁহাকে এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। হোসেন আলী খাঁর সঙ্গে যখন তাঁহার যুদ্ধ হয়, তখন এই রমণী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। তিনি পতির যুদ্ধযাত্রা কালে তাঁহার কোমর হইতে সগর্ব্বে তরবারি গ্রহণ করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দেন। তারপর তিনি পতির মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বহস্তে গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া জীবিত অবস্থায় সন্তান বাহির করেন, এবং পতির সঙ্গে স্বর্গারূঢ়া হন। খাফি খাঁ এই গল্পে আস্থা স্থাপন করেন নাই।

জাতিকে সমূলে বিনাশ করিতে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। শিখগণ আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ করিল, ও লোকাতীত পরাক্রমে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল। কিন্তু অচিরে তাহাদের শিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়াতে তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। ক্রূর প্রকৃতি মোগল সেনাপতি নৃশংসাচরণের একশেষ প্রদর্শন করিয়া দুই সহস্র শিখ সৈন্যের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ছিন্ন মস্তকগুলি পাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। শিখ গুরু (অধিনেতা) বন্ধুকে সহস্রাধিক অনুচর সহ হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করা হইল। বন্দী শিখবীরগণ একে একে ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া বিধাতার অভিসম্পাত মোগল সাম্রাজ্যের উপর আনয়ন করিল। বন্ধু আপনার শিশু পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিতে আদিষ্ট হইলেন; তিনি অবিচলিত চিত্তে এই আদেশ প্রতিপালন করিলেন। এই ঘোর নৃশংস কাণ্ডের পর তিনিও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। (১)

এই ঘটনার পরবৎসর মীরজুম্লা পাটনার শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া

(১) His son was placed upon his knees,—a knife was put into his hands, and he was required to take the life of his child. He did so silent and unmoved; his own flesh was then torn with red hot pincers, and amid those torments he expired, his dark soul, say the Mahometans winging its way to the regions of the damned Cunningham's History of the Sikhs. শিখগণ স্বদেশ প্রেমের মোহন মন্ত্রে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। একজন শিখ রমনী সুকৌশলে পাদশাহের নিকট স্বীয় পুত্রের জীবন ভিক্ষা করেন। পাদশাহ তাঁহার কৌশলপুর্ণ বাক্যে বিচলিত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পুর্ণ করেন। যে সময় শিখমাতা পাদশাহের আদেশলিপিসহ পুত্রের নিকট উপনীত হন, তখন ঘাতক তাহার হত্যার জন্য তরবারি উত্তোলন করিয়াছিল। বীরপুত্র মুক্তি পত্র দেখিয়া সগর্ব্বে উত্তর করেন, "মা মিথ্যাবাদিনী; আমি গুরুর সেবার জন্য মনঃপ্রাণে সমবিশ্বাসিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। আমাকে অবিলম্বে তাঁহাদের সহযাত্রী কর।"

রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজদরবার হইতে দূরে অবস্থান করায় তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিপত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল; হোসেন আলী খাঁ দক্ষিণাপথে গমন কালে যে ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও পাদশাহ বিস্মৃত হন নাই। একারণ, তিনি এবার সাদরে পরিগৃহীত হইলেন না; পাদশাহ তাঁহাকে রাজদরবার হইতে দূরে রাখিবার জন্য লাহোরের শাসনকার্য্যে প্রেরণ করিলেন।

সৈয়দ যুগলের প্রভুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, এবং পাদশাহ বিলাস স্রোতে মগ্ন হইয়া রমণীর বিলোল কটাক্ষ এবং চিত্তোন্মাদকর মৃগয়াই জীবনের সার করিয়াছিলেন। তিনি শাসনকার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিতেন না; এমন কি, প্রধান অমাত্যের পক্ষে তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করাও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় ঘৃণ্য জিজিয়া পুনর্জীবিত হয়; হিন্দু রাজপুরুষদিগকে পদচ্যুত করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের হিসাব নিকাশ তলব দেওয়া হয়। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল, এবং তাহাদের যুদ্ধ প্রণালী দিন দিন নিয়মবদ্ধ হইতেছিল। পাদশাহ সৈয়দ যুগলের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেও পারিতেন না। তিনি হোসেন আলীর বিনাশ সাধনার্থ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে গোপনে গোপনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই আত্মকলহের ফল কি হইয়াছিল? ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দুগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং মোগলের রাজশক্তি গৌরব ভ্রষ্ট হয়। হোসেন আলী খাঁ দীর্ঘকাল ব্যাপি যুদ্ধ সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র শক্তি দমন করিতে অসমর্থ হইয়া মোগলের গৌরব নাশক সন্ধি স্থাপন করিতে মনন করিলেন। (১) কিন্তু পাদশাহ

(১) এই সন্ধি অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশ সমূহে স্বাধীন

সৈয়দ যুগলের শত্রুপক্ষের পরামর্শে তাদৃশ অকীর্ত্তিকর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না, এবং যোধপুরাধিপতি রাজা অজিত সিংহ এবং কতিপয় আমীর ওমরাহের সঙ্গে মিলিত হইয়া সৈয়দগণের উচ্ছেদ সাধন জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদশাহের অস্থির মতিত্বে ও ভীরুতায় এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আবদুল্যা খাঁ আত্মরক্ষার্থ সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হোসেন আলী খাঁকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন।

তদনুসারে তিনি দশ সহস্র মহারাষ্ট্র সৈন্য লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃযুগল সহজেই অরক্ষিত রাজপুরী অধিকার করিলেন। তাঁহাদের কতিপয় অনুচর প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পাদশাহকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে ছাদের এক কোণে লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে নানারূপে অবজ্ঞাত করিয়া টানিয়া বাহির করিল। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী পুরাঙ্গনাদের করুণ ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা অনুচরদের পদধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাদের তাদৃশ করুণ ক্রন্দনেও অবিচলিত রহিল; তাহারা ফরক শিয়রকে পুরমহিলাদের পার্শ্ব হইতে বাহিরে আনয়ন করিল, তারপর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নাশ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। খাফি খাঁ এই কারগারকে তাঁহার (living tomb) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে ফরকশিয়রের কষ্টের সীমা রহিল না। তিনি মুক্তি লাভের কল্পনায় প্রহরীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। এই ঘটনা

অধিকার লাভ করেন, এবং সমগ্র দক্ষিণাপথে চৌথ ও সরদেশ মুখি আদায় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন; ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য এবং বার্ষিক দশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন।

প্রকাশিত হইয়া পড়িলে সৈয়দ যুগল আহার্য্য বস্তুতে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার ইহলীলার অবসান করিলেন। (২)

রফি-উদ-দরজাত এবং রফিদ্দৌলা।

সৈয়দ যুগল ফররুকশিয়রকে বন্দী করিয়া বিংশতি বর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক রফি-উদ-দরজাতকে (ইনি রফিউস্-শানের কনিষ্ঠ পুত্র, রফি উস্-সান বাহাদুর শাহেবের পুত্র), ময়ূর তক্ত প্রদান করেন। রাজ্য-লাভকালে রফি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। সৈয়দ যুগলের হস্তে ফররুকশিয়র নিগৃহীত ও বন্দী হইলে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, এবং রাজ-সিংহাসন শূন্য দেখিয়া নানা প্রকার অরাজকতার সূত্রপাত করে। এজন্য তাঁহারা তাড়াতাড়ি রফিকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। তাড়াতাড়িতে তাঁহার কারাবস্ত্র পরিবর্ত্তণেরও অবসর ঘটে নাই। রফির রাজত্বের তৃতীয় মাসে ফরুক শিয়র শক্রর বিষ প্রয়োগে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। নাম সর্ব্বস্ব নূতন সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না; মন্ত্রি যুগল স্বাধীন ভাবে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রফি-উদ-দরজাত এই অবস্থা স্পৃহ-ণীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; এজন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফি-দ্দৌলার

(২) ফরুক শিয়রকে হুমায়ূনের সমাধি ভবনের এক পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সহস্র দোষ ছিল, কিন্তু তিনি গরীবের মা বাপ ছিলেন। তাঁহার শবাধারের সঙ্গে দুই তিন সহস্র গরীব দুঃখী এবং বহু সন্ন্যাসী ফকির গমন করিয়াছিল। তাহা-দের গগনভেদী চীৎকার, গালাগালি এবং ধূলি নিক্ষেপে চারিদিকে বিকট দৃশ্য উপ-স্থিত হয়। সৈয়দ যুগলের বক্সী বহু সম্ভ্রান্ত লোক সঙ্গে লইয়া সমাধি স্থানে উপস্থিত হন। ক্ষুব্ধ জন প্রবাহ তাঁহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করে। পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করে নাই। তৃতীয় দিবস ইতর শ্রেণীর বহুলোক সমাধি স্থানে মিলিত হইয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত পূর্ব্বক গরীব দুঃখীকে বিতরণ করে, এবং সমস্ত রাত্রি সেখানেই সম্মিলিত থাকে।

নামে শিক্কা ও খোতবা প্রচলনের প্রস্তাব করিয়া নিজে এ প্রহসন হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। উজীর ও তদীয় ভ্রাতা এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া রফিদ্দৌলার নামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন। ইহার তিন দিন পরেই রফি-উদ-দরজাত রাজ যক্ষ্মা রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব সপ্তাহাধিক অৰ্দ্ধ বৎসর স্থায়ী ছিল। তদীয় জেষ্ঠ ভ্রাতাও রাজ তক্তে আরোহণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। তিনি সিংহাসনা-রোহণের তিন মাস মধ্যেই দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। এই দুই ভ্রাতার আমলে হিন্দুর শক্তি বৰ্দ্ধিত ও দিল্লীর প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছিল। জয় সিংহ ও অজিত সিংহ রাজপুত রাজন্যগণ মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। জয় সিংহ সসৈন্যে আগ্রার দ্বারদেশে উপনীত হন এবং অজিত সিংহ ফরকশিয়রের বিধবা মহিষীকে (ইনি অজিত সিংহের কন্যা) বলপূৰ্ব্বক স্বদেশে লইয়া যান। সৈয়দ যুগল ইহাদিগকে প্রশমিত করিবার জন্য জয় সিংহকে সুরাটের এবং অজিত সিংহকে আজমীর ও আমেদাবাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহাদের আধিপত্য দিল্লীর পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্রদেশে সংস্থাপিত হয়। ভরতপুরবাসী জাট সম্প্রদায়ের অধিনায়ক চূড়ামণি আগ্রা দুর্গ প্রাচীরের অদূরেই আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়া-ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশ সমূহে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব এবং সমগ্র দক্ষিণা পথে চৌথ ও সরদেশমুখিআদায় করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ শাহ।

রফিদ্দৌলার মৃত্যুর পর সৈয়দ যুগল জাহান শাহের পুত্র (জাহান

শাহ জাহান্দর শাহের পুত্র) রোসন আক্তরকে রাজপদ প্রদান করিলেন। নব নির্ব্বাচিত সম্রাট রূপবান, বুদ্ধিমান ও গুণবান ছিলেন। সৈয়দ যুগল তাঁহাকেও পূর্ব্ববর্ত্তী পাদশাহগণের ন্যায় ক্রীড়া পুত্তলে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচরগণ দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিলেন। রোসন আক্তর মোহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া শাসন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া সৈয়দ যুগল অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে, মোহাম্মদ শাহের স্বভাব স্বাধীনতা প্রয়াসী, ও তিনি শূন্য গর্ভ রাজনামের জন্য কাহারও হস্তে আত্ম বিক্রয় করিবার পাত্র নহেন। একারণ, তাঁহারা পাদশাহের গতি বিধি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। এই হেতু মোহাম্মদ শাহ তাঁহাদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য সহজে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাদৃশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বন্দোবস্ত দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহাকে অধিক দিন প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই। এই সময় চিনকিলিচ খাঁ মালব দেশের শাসন কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রণকুশল বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বহুসংখ্যক পদচ্যুত ও অসন্তুষ্ট সৈন্য তাঁহার দলভুক্ত ছিল। মোহাম্মদ শাহ সৈয়দ যুগলের ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য চিনকিলিচ খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সৈয়দ যুগল এই অভিনব বিপদের বিষয় অনবগত ছিলেন না। তাঁহারা হিন্দু রাজন্য বৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদের বলবৃদ্ধির প্রয়াসী হইলেন।

ভ্রাতৃ যুগল যথোপযুক্ত বল সঞ্চার করিয়া চিনকিলিচখাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে মালবপ্রদেশের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট স্থানের শাসান ভার অর্পণের প্রস্তাব করি-

লেন। চিনকিলিচখাঁ এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন; সৈয়দ যুগল তাঁহাকে রাজধাণীতে আহ্বান করিয়া রাজস্বাক্ষর যুক্ত আদেশ পত্র প্রেরণ করিলেন। পাদশাহ তাঁহাকে এই সুযোগে সসৈন্যে রাজধানীতে উপনীত হইতে গোপনে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া রাজধানীর অভিমুখে বিপুল বাহিনী সহ ধাবিত হইলেন।

এই সংবাদ রাজধাণীতে পহুঁছিলে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; রাজ পক্ষের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অবিরত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। আবহুল্যা খাঁ ও তদীয় ভ্রাতা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, এবং আত্ম প্রাধান্য রক্ষার উপায় সহসা উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বহু মন্ত্রণার পর আবহুল্যা খাঁ আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন, এবং হোসেন আলী খাঁ পাদশাহকে সঙ্গে লইয়া চিন-কিলিচখাঁর গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হোসেন আলী খাঁ পথিমধ্যে পাদশাহের ষড়যন্ত্র গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে রাজপক্ষের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। কিন্তু শেষোক্ত দলের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন অবিলম্বে সমস্ত গোলযোগ নিরাকৃত হইল; এবং পাদশাহ স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উজির আবহুল্যা খাঁকে পদ-চ্যুত করা হুইল; মোহাম্মদ আমীন তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

আবহুল্যা খাঁ পূর্ব্বোক্ত সংবাদ অবগত হইয়া রফি-উস্-সানের পুত্র মোহাম্মদ এব্রাহিমকে রাজপদে বরণ করিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। তারপর তিনি জাট ও অন্যান্য হিন্দু সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া মোহাম্মদ শাহ ও তদীয় পক্ষাবলম্বী সৈন্যদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহাম্মদ শাহ রোহিলা প্রভৃতি

মোসলমান সৈন্যের সহায়তা লাভ করিয়া বলশালী হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বে মথুরার নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই দিনের যুদ্ধের পর মোহাম্মদ এব্রাহিম ও আবদুল্যা খাঁ শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন; এবং তাঁহাদের অনুচরেরা যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। ইহার কিয়দ্দিবস পরেই আবদুল্যা খাঁ শত্রুর ষড়যন্ত্রে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন। (১) তদীয় করধৃত মোহাম্মদ এব্রাহিমও সেই সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

অতঃপর মোহাম্মদ শাহ রাহু মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; এবং মোগল সাম্রাজ্যের নষ্ট গৌরবোদ্ধারের আশা সকলের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। চিনকিলিচ খাঁ দক্ষিণাপথের নিজামের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই উজীর মোহাম্মদ আমীন পরলোক গমন করিলেন, এবং চিনকিলিচ খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দক্ষিণাপথে মুবারিজ খাঁকে স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োজিত করিলেন, এবং তারপর স্বয়ং রাজধানীতে আগমন করিয়া কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলেন। সাদত খাঁ অযোধ্যার শাসন কর্ত্তৃপদ লাভ করিলেন। একজন হিন্দু মালব দেশের নিজামতি কার্য্য নির্ব্বাহ

(১) The Mughals at length so worked upon the Emperor * * that he consented to the poisoning of the Sayed. Ibratnama. তাদৃশ প্রতিষ্ঠাপন্ন বিচক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। খাঁফি খাঁ নির্লোভ, সদাশয়, দয়ার্দ্র চিত্ত, গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের, বিশেষতঃ হোসেন আলী খাঁর অনেক প্রশংসাবাদ করিয়াছেন এবং পরপীড়ন ও অন্যান্য দোষের ভাগ রতনচাঁদ প্রভৃতি হিন্দু কর্ম্মচারিগণের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। যাহা হউক, আমরা এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সুরাটের একজন বণিক এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সুরাট বন্দরের রাজকর্ম্মচারী এই অর্থরাশি বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। পরলোকগত বণিকের পুত্র এই বিষয় হোসেন আলী খাঁর গোচরে আনয়ন করেন। তিনি এই বিপুল ধন ছাড়িয়া দিবার জন্য সুরাটের রাজকর্ম্মচারীকে আদেশ করেন।

করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ঘৃণ্য জিজিয়া কর রহিত করিয়া হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করা হইল। যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহ আগ্রার সুবাদারের পদ লাভ করিলেন।

চিনকিলিচ খাঁ শক্তি সম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন জন্য তাঁহার স্বভাব কিয়ৎপরিমাণে পরধর্ম্ম বিদ্বেষ পরায়ণ ও কঠোর ছিল। তিনি জিজিয়া রহিতের বিপক্ষ ছিলেন। আওরঙ্গজেব দরবারের জন্য যে সকল রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী বিলাসী পাদশাহগণের প্রীতিকর না হওয়াতে অভিনব রীতি নীতি অনুসৃত হয়। নব নিয়োজিত উজীর নব্যরীতি নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন রীতি নীতি প্রবর্ত্তন করিতে যত্ন শীল হইলেন।

কিন্তু ইহাতে তিনি নব্য পারিষদগণের উপহাসাস্পদ হইলেন; তিনি দরবারে উপনীত হইয়া প্রাচীন প্রথামত অভিবাদন করিলে তাহারা বলিত, "দেখ, দক্ষিণাপথের বানর কি ভাবে নৃত্য করে।" উজীর তাদৃশ দুর্ব্বাক্যের বিষয় অনবগত রহিলেন না, কিন্তু পারিষদগণের সকলেই পাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলিতে পারিলেন না; এজন্য মর্ম্মে মরিয়া রহিলেন। চিনকিলিচ খাঁ স্বকার্য্য সাধনে তৎপর ছিলেন; তাঁহার কার্য্যে অনেকের স্বার্থ হানি হইয়াছিল। এই স্বার্থপর দল তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিল। ইহাদের অনেকেই পাদশাহের পার্শ্বচর ছিল। সুতরাং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। এই সব কারণে তাঁহার নিকট মন্ত্রি পদ অস্পৃহণীয় হইয়া উঠিল। তিনি মৃগয়া ব্যপ-

দেশে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তারপর দক্ষিণাপথে গমন করিয়া স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কমর উদ্দীন খাঁ প্রধান অমাত্যের পদে বৃত হইলেন।

এই সময় সমস্ত দক্ষিণাপথে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। চিনকিলিচ খাঁর প্রবল প্রতাপে ও সুশাসনে দেশমধ্যে পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হইল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। তৎকালে ভারতবর্ষে দুইজন শাসনপতির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল; নিজাম চিনকিলিচ খাঁ এবং পেশওয়া বাজিরাও। বাজিরাওর প্রাণগত সাধনায় মহারাষ্ট্র শক্তির গৌরব রবি মধ্যাহ্নাকাশে সমুপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভুমিতে হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির পথ নিরঙ্কুশ ছিল; একমাত্র নিজাম বাহাদুর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিদ্যমান ছিলেন। এজন্য মহারাষ্ট্র নায়ক বাজিরাও তাঁহাকে দগ্ধ করিবার জন্য সমরানল প্রজ্জলিত করিয়া রাখিলেন। এই যুদ্ধ একাদিক্রমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত প্রজ্জলিত রহিল। নিজাম বাহাদুর তরবারি হস্তে ছুটাছুটী করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি রণক্ষেত্র হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার কল্পনায় মহারাষ্ট্র শক্তির তেজোপ্রবাহ মোগলাধীন দেশাভিমুখে সঞ্চালিত করিয়া দিলেন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। পেশওয়া নিজামের শাসনাধীন দেশ আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন; এবং নিজাম মহারাষ্ট্র সৈন্যের মোগলাধীন দেশ আক্রমণে কোন বাধা দিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

খাফি খাঁ নিজাম বাহাদুরের রাজভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি কদাচ রাজভক্তির পথ হইতে এক তিলও বিচ-

লিত হইতেন না। নিজাম বাহাদুর গোঁড়া মোসলমান ছিলেন, হিন্দুর প্রতিপত্তি কথনও তাঁহার নিকট বাঞ্ছনীয় ছিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি যে স্বায় প্রভুর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র সৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া হিন্দুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের বিস্ময় জন্মিতে পারে। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন কালে মোসলমান রাজ-পুরুষগণের কর্ম্মনীতি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র ছিল। এই সময় তাঁহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান কতদূর সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে ন্যায়-নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ নিজাম বাহাদুরের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা অনুভব করিতে পারি।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত সন্ধি অনুসারে মহারাট্টা অধিনায়কগণ প্রথমতঃ মালবদেশ আক্রমণ করিলেন। মালবের শাসনকর্ত্তা শত্রু সৈন্যের গতিরোধ জন্য বিপুল বিক্রমে দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিতে পারিলেন না। মালবদেশ মহারাট্টা সৈন্যের করতলগত হইল। ইহার পর তাহাদের অন্যতম অধিনায়ক মহলরাও হোলকার আগ্রার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে সসৈন্যে উপনীত হইয়া দোয়াব লুণ্ঠন করিলেন। দিল্লীর রাজপুরুষগণ মহারাষ্ট্র সৈন্যের আগমনে ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়াতে পাদশাহ নিরুপায় হইয়া অযোধ্যার শাসন-কর্ত্তা সাদত খাঁকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তিনি সসৈন্যে আগমন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা প্রবল বন্যার ন্যায় পুনরায় মোগল শাসনাধীন দেশে পতিত হইল। পাদশাহ তাহাদের গতিরোধ জন্য নিজাম বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন। তিনিও এখন স্বীয় অনুসৃত নীতির ভ্রম বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইল যে, দিল্লীর রাজশক্তি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণই

ভারতবর্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবেন, এবং তাহার ফল তাঁহার নিজের অস্তিত্বের পক্ষেও শুভকর হইবে না। এ জন্য তিনি রাজ আহ্বানানুসারে রাজধানীতে গমন করিলেন। কিন্তু এই সময় পাদশাহের ক্ষমতা এতদূর সীমাবদ্ধ হইয়াছিল যে, নিজাম বাহাদুর বহু যত্নেও চতুঃত্রিংশৎ সহস্রাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই তিনি দোয়াব প্রদেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্র সৈন্যের গতিরোধ জন্য ভূপালে গমন করিলেন। দিল্লীর দরবারের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন এই স্থানে তাঁহাকে শত্রু সৈন্য পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। তিনি দ্বাবিংশতি অহোরাত্র অবরুদ্ধ থাকিয়া মালবদেশ এবং চাম্বল ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

যে সময় ভারতবর্ষ এই ভাবে হিন্দু মোসলমানের সংঘর্ষে আলোড়িত হইতেছিল, তখন নাদির শাহ বিপুল বাহিনীসহ কালান্তক যমের ন্যায় পঞ্চনদ ভূমির দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। নাদির শাহ পারস্যের অন্তর্গত খোরসান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কালেই পিতৃহীন হয়েন, এবং তদীয় পিতৃব্য সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন। সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি উজবেগের হস্তে বন্দী হন, এবং চারি বৎসর অবরুদ্ধাবস্থায় অতিবাহিত করিয়া কৌশলক্রমে পরিত্রাণ লাভ করেন। অতঃপর তিনি কতিপয় বৎসর দস্যুবৃত্তিতে যাপন করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠেন; এই সময় পারস্যের অধিপতি শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। প্রথম জীবনে নাদিরের হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের অভাব ছিল না; তাঁহার যত্ন ও রণকৌশলে রাজ্যভ্রষ্ট পারস্যের অধিপতি পুনর্ব্বার পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। এ পর্য্যন্ত নাদির শাহের কার্য্য স্বদেশ প্রেমের

অনুগত ছিল। কিন্তু ইহার পর সৈন্য বৃন্দের গভীর অনুরাগ ও ভাগ্য-লক্ষ্মীর অচিন্ত্য কৃপা তাঁহার চিত্তবিকার জন্মাইয়া দেয়; এবং তিনি পারস্যের অধিপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেন। রাজপদ গ্রহণের পর পররাজ্য লুণ্ঠন ও নরনারীর রক্তে পৃথিবী রঞ্জনই তাঁহার জীবনের সারব্রত হইয়াছিল। সিংহাসনারো-হণের তৃতীয় বর্ষের প্রারম্ভে তিনি মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত কাবুল ও কান্দাহারের অভিমুখে স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন। এই সকল দেশ সহজে বিজিত হওয়াতে নাদির সাহের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল, তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে,—ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া দিল্লীর অপরিমিত ধনরত্ন অপহরণ করিবার জন্য সসৈন্যে পঞ্চনদ ভূমিতে আগমন করিলেন, এবং লাহোর বিধ্বস্ত করিয়া রাজধানীর অভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। (১) তিনি দিল্লীর অদূরবর্ত্তী কারনালে পঁহুছিলে পাদশাহ মোহাম্মদ শাহ সসৈন্যে আগমন করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মোহাম্মদ শাহ পরাজিত হইলেন। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সাদত খাঁ পাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন; প্রথম হইতেই তাঁহার সহিত নাদির শাহের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। তিনি আপন ইচ্ছামত রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। অতঃপর পাদশাহ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দিল্লীর রাজশক্তি আত্ম কলহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল; এ জন্য ভারত লুণ্ঠন কালে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়া নাদির শাহের বিশ্বাস

---

(১) Nadir Shah * * now marched in this direction with the design of conquering Hindustan, as some say, at the suggestion of Nizam-ul Mulk and Sadat Khan. Tarikh-i Hind.

ছিল না। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভাবি আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; এমন সময় সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াতে তিনি যথোপযুক্ত পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করিয়াই সসৈন্যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কৃতঘ্ন সাদত খাঁ এ সর্ত্ত অসমীচীন বলিয়া অভিমত প্রকাশ পূর্ব্বক কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে মন্ত্রণা দিলেন, কিছুকাল প্রতীক্ষা করিলেই অধিকতর অনুকূল সর্ত্তে সন্ধি সংস্থাপন করা যাইবে বলিয়া নিবেদন করিলেন। সন্ধির প্রস্তাবে এক মাস অতিবাহিত হইল; তখন মোহাম্মদ শাহ বিজয়ী বীরের হস্তে আত্মসমর্পণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদনুসারে তিনি পাত্র মিত্র সহ শত্রু শিবিরে উপনীত হইলেন। নাদির শাহ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর তিনি পাদশাহের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কাপুরুষতার জন্য নিন্দা করিয়া বলিলেন, "আপনি যে কেবলমাত্র দক্ষিণাপথের বিধর্ম্মী অসভ্য হিন্দু-দিগকে কর প্রদান করিতেছেন, তাহা নহে; আপনার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণকারী আগমন করিলে (যেমন আমি আসিয়াছি) আপনি ন্যায় যুদ্ধ না করিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। কথোপকথনান্তে নাদির শাহ পাদশাহের জন্য জলযোগের আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া উজীরের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন। তিনি মন্ত্রণা অন্তে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রতিগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পাদশাহ তদ্গত চিত্তে ভোজনে ব্যাপৃত রহিয়া-ছেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া জনৈক অনুচরকে বলিলেন, যিনি এরূপ অবিচলিত চিত্তে আপনার ক্ষমতা ও স্বাধীনতার বিলোপ সহ্য করিতে পারেন, তাঁহার প্রকৃতি কেমন! বিপদের সম্মুখীন হইবার দ্বিবিধ পথ রহিয়াছে;—ধৈর্য্য অবলম্বনে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে

অথবা সাহস সহকারে কার্য্য করিতে হইবে, সংসারকে অবজ্ঞা করিতে হইবে, অথবা উহাকে বশীভূত করিবার জন্যই সমস্ত চিত্তবৃত্তির পরিচালনা করিতে হইবে। মোহাম্মদ প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমার পক্ষে শেষোক্ত পথই অবলম্বনীয়।" বন্দী পাদশাহের ভোজন শেষ হইলে নাদির তাঁহাকে বলিলেন, "তৈমুর বংশের সহিত আমার বিবাদ নাই। আমার সমস্ত যুদ্ধ ব্যয় আপনাকে বহন করিতে হইবে। আমার সৈন্যের পক্ষে কয়েকদিন দিল্লীতে বাস করা আবশ্যক।"

অনন্তর নাদির শাহ পাদশাহকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে গমন করিলেন। লুণ্ঠন লোলুপ পারসীক সৈন্য নাদির শাহের কঠোর শাসনে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া রহিল; প্রথমে দিল্লীতে কোন প্রকার উপদ্রব হইল না। কিন্তু নাদিরের সহরে প্রবেশের দ্বিতীয় দিবস একজন কলহ প্রিয় পারসীক সৈন্য কপোতক্রয়ব্যপদেশে বিবাদের সূত্রপাত করিল; তাহার দুর্ব্ব্যবহারে নাগরিকগণ উত্তেজিত হইয়া রাত্রিকালে পারসীকদিগকে অস্ত্রসহ আক্রমণ করিল। ইতি মধ্যে নাদির শাহের মৃত্যুর অমূলক জনরব প্রচারিত হওয়াতে নগরবাসীদের উত্তেজনা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাহাদের হস্তে পারসীক সৈন্য দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। নাদিরের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে রাত্রির জন্য কেবল আত্ম রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বলিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা তাঁহাকে দেখিলেই শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এজন্য তিনি রাত্রি প্রভাত মাত্র অশ্বারোহণে চাঁদনী চকে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও ক্রোধোন্মত্ত নগরবাসীরা ভ্রূক্ষেপ করিল না। নাদির শাহ রসনদ্দোলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে দমন জন্য মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এমন সময় জনৈক দিল্লীবাসী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিল। এই ঘটনায় তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং তাহাতে অমিত ধনরত্ন পূর্ণ বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি শোভিত দিল্লী ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাঁহার আদেশে পারসীক সৈন্য পৈশাচিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বালবৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে দিল্লীবাসীর হত্যার জন্য তরবারি কোষো-মুক্ত করিল। নিহত নরনারীর রক্ত স্রোতে রাজপথগুলি প্লাবিত হইল। সৈন্যগণ সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী অগ্নি সংযোগে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করিল। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত পারসীক সৈন্য হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। এই নয় ঘণ্টা ব্যাপী হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য নরনারী জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। (১) নাদির শাহ রসনদ্দোলা নামক একটি লাল প্রস্তর নির্ম্মিত মসজিদের উপর বসিয়া এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মম ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া কেহই সে স্থানে উপস্থিত হইয়া দিল্লীবাসীর প্রাণ ভিক্ষা করিতে সাহস করিল না। অবশেষে মোহাম্মদ শাহ প্রজাবৃন্দের করুণ বিলাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নাদির শাহের নিকট গমন পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থী হইলেন। ইহাতে নাদির শাহের ক্রোধানল নির্ব্বা-পিত হইল। তাঁহার আদেশে তাদৃশ নগর ব্যাপী নরহত্যা ও গৃহদহন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভোজবাজির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

---

(১) কত লোক এই প্রলয় ব্যাপারে নিহত হইয়াছিল? কিন সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। ফ্রেসার সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজারের ন্যূন ও দেড় লক্ষের অধিক ছিল না। তারিখ-ই হিন্দির লেখক রস্তম আলীর মতে মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। বিয়ানি-ই-ওয়াকি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সহর কোতওয়াল অনুসন্ধান অন্তে হত্যার সংখ্যা বিশ হাজার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নাদির নামা গ্রন্থে ত্রিশ হাজার নগরবাসী নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

সহর মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইলে নাদির শাহ রাজপ্রাসাদে গমন পূর্ব্বক বিমর্ষচিত্ত সম্রাটকে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহারা এক সঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া কাফি পান করিলেন। অতঃপর নাদির শাহ মোহাম্মদের মস্তকে রাজ মুকুট পরাইয়া দিলেন। ফলতঃ দিল্লীর সম্রাট অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও আপনাকে পারস্যের করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিজয়ী বীর পঞ্চনদ প্রদেশ ও কাবুল রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন; তার পর জগদ্বিখ্যাত কহিনুর ও ময়ূরতক্ত এবং রাজ কোষের পুঞ্জীকৃত ধনরত্ন সমভিব্যহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন। (১)

নাদির শাহের আক্রমণের ফলে দিল্লীর রাজকোষ কপর্দ্দক শূন্য, এবং মোগল সাম্রাজ্য নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাজকিরা নামক ইতিহাসকর্ত্তা লিখিয়া গিয়াছেন যে, সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের সঞ্চিত ধন রাশি এক মুহূর্ত্তে হস্তান্তরিত হয়। অতঃপর স্বার্থপর রাজস্ব কর্ম্মচারিগণ রাজ কোষে অর্থ প্রেরণ বন্ধ করেন। ইহার ফলে রাজ কোষে অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, এবং সৈন্যগণ নিয়মিত বেতন না পাইয়া কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে। পক্ষান্তরে আমীর ওমরাহগণ রাজপ্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করেন, এবং তদ্দ্বারা আপনাদের স্বার্থ সাধন জন্য সৈন্য পরিপোষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। একারণ পাদশাহ তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন।

---

(১) নাদির শাহ রত্নাদি সহ ভারতবর্ষ হইতে কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন? কিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, নাদির শাহ সর্ব্বসাকুল্যে আট কোটি পাউণ্ড লইয়া যান। বয়ানি-ই-ওয়াকি নামক গ্রন্থে আশী কোটি মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। দশ টাকায় এক পাউণ্ড ধরিলে উভয় সংখ্যায় ঐক্য হইতে পারে। তাজকিরা নামক ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, একমাত্র মণি মুক্তাতেই পঞ্চাশ কোটি টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সময় রাজধানীর বহির্ভাগে পাদ শাহের সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। কাবুল হইতে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ নাদির শাহ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়া ছিলেন। শিখ জাতি সরহিন্দে ও পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী ও আগ্রা প্রদেশের একাংশে রোহিলা-আফগানেরা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অযোধ্যা প্রদেশে সাদত খাঁ পাদশাহের প্রতিনিধি ছিলেন। দিল্লীতে নাদির শাহের অবস্থিতি কালে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সাদত খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় জামতা সফদার জঙ্গ অযোধ্যার শাসন ভার লাভ করিয়া তথায় অখণ্ড প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতেছিলেন। মালব ও গুজরাট দিল্লীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়গণ সমগ্র দক্ষিণা পথগ্রাস করিয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইহার পর ক্ষমতা লোলুপ আত্মপরায়ণ রাজপুরুষগণের তাণ্ডবে ও কলহে রাজকার্য্য রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

ফলতঃ নাদির শাহের আক্রমণের পরেই জগৎপ্রথিত মোগল সাম্রাজ্য অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পরও দ্বাবিংশতি বর্ষ কাল মোগল সম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাহা সে সাম্রাজ্যের কায়া নহে, ছায়া মাত্র।

নাদির শাহের দিল্লী পরিত্যাগের পর মোহাম্মদ শাহ আপন্মুক্ত হইয়া মোগল সম্রাজ্যের হৃত গৌরব উদ্ধার জন্য যত্নশীল হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘ কাল শান্তিতে বাস করিতে পারিলেন না। আমেদ শাহ আবদালী বা দুরানী নামক একজন আফগান প্রথমতঃ নাদির শাহের চোপদারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মীর

কৃপায় কাল ক্রমে কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। নাদির শাহের মৃত্যুর পর সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে রাজকোষ হইতে তিন শত উষ্ট্রের বহনোপযোগী স্বর্ণ মুদ্রা অপহরণ করিয়া দুরানী আফগানিস্থানে উপস্থিত হন, তাহার পর আফগানদিগকে বশীভূত করিয়া হিরাট, খোরসানের কিয়দংশ, সিন্ধু ও কাশ্মীর অধিকার পূর্ব্বক এক অভিনব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

আমেদশাহ আবদালী স্বর্ণভূমি ভারতভূমি লুণ্ঠন করিয়া কীর্ত্তি সংস্থাপন জন্য ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে সসৈন্য লাহোর প্রদেশে আগমন করিলেন। পাদশাহ দেশ রক্ষার কল্পনায় জ্যেষ্ঠপুত্র আমেদশাহ ও উজীর কমরউদ্দীনকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া আবদালীর গতিরোধ জন্য প্রেরণ করিলেন। মোগল সৈন্যের রণকৌশলে আবদালী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে উজীর কমরউদ্দীন শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করাতে পাদশাহের প্রধান অবলম্বন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

উজীরের মৃত্যু সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া পাদশাহ অতিশয় শোকাকুল হইলেন, এবং সমস্ত রজনী অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দরবারের সময় পরলোকগত উজীরের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "হায় দারুণ বিধি, আমার বৃদ্ধ বয়সের প্রধান অবলম্বন ভাঙ্গিয়া দিলে। আমি এরূপ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কোথায় পাইব?" শোক প্রকাশকালে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার অশান্তিক্লিষ্ট জীবনের অবসান করিল। মোহাম্মদ শাহের রাজত্ব ত্রিংশৎবর্ষ স্থায়ী ছিল।

আমেদ শাহ।

পিতার পরলোক গমনের পর শাহজাদা আমেদশাহ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নূতন সম্রাট উজীরের শূন্যপদে অযোধ্যার

শাসনকর্ত্তা সফদার জঙ্গকে নিযুক্ত করিলেন। সফদার জঙ্গের প্রকৃত নাম আবুল মনসুর। আবুল মন্‌সুর বাণিজ্য উপলক্ষে পারস্যদেশ হইতে দিল্লীতে আগমন করেন, এবং ঘটনাক্রমে অযোধ্যার প্রতিনিধি সাদত খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। (১) আবুল মন্‌সুর প্রতিনিধির কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই ঘটনায় দিল্লীর দরবারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সাদত খাঁর মৃত্যুর পর তিনি অযোধ্যা প্রদেশের শাসনভার লাভ করেন। উজীর কমরউদ্দীন খাঁর পরলোক গমনের পর সফদারজঙ্গ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন; তিনি অযোধ্যার শাসন জন্য নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। নিজাম বাহাদুরের পুত্র গাজিউদ্দীন মোহাম্মদের রাজত্বকালে মিরবক্সীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই পদে বহাল রহিলেন।

আমেদশাহের সিংহাসনারোহণের পর অবিলম্বেই রাজপুরুষগণের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইল। এক পক্ষে সফদারজঙ্গ এবং অন্য পক্ষে গাজিউদ্দীন। এই বিবাদের সময় উজীর একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ইহাতে গাজি প্রকাশ করিলেন যে, তিনি স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মোগল শক্তিকে একজন নগণ্য জায়গীরদারের হস্তে অবজ্ঞাত করিয়াছেন। এই সন্দেহের মূলে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবার জন্য পাদশাহ অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু খোজা জাওয়েদ খাঁ উজীরের পক্ষাবলম্বন করাতে পাদশাহ তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিলেন না। (২)

---

(১) আবুল মন্‌সুরের ন্যায় সাদত খাঁও প্রথমে পারস্য দেশের একজন বণিক ছিলেন। তার পর এদেশে আগমন পূর্ব্বক আপন প্রতিভাবলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া অযোধ্যার সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হন।

(২) খোজা জাওয়েদ কে? পাদশাহ আমেদশাহের মাতা উধমবাই প্রথমে এক-

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে রাজপুরুষগণের আত্মকলহই নিয়মে পরিণত হইয়াছিল। সফদারজঙ্গ এবং তদীয় উপকারী বন্ধু জাওয়েদ খাঁর মধ্যেও বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু কেহই কাহাকেও সহসা অপদস্থ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন সফদার জঙ্গ জাওয়েদ খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন, এবং কাপুরুষতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনায় পাদশাহ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সফদারজঙ্গকে পদচ্যুত করিয়া দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং কমার উদ্দীন খাঁর পুত্রকে খানখানান উপাধি প্রদান করিয়া উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। সফদারজঙ্গ উজীরের পদ হইতে তাড়িত হইলেন, কিন্তু অযোধ্যার শাসনাধিকার তাঁহার প্রতিনিধির হস্তেই রহিয়া গেল। সফদার জঙ্গ বাহুবলে লুপ্ত ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পাদশাহ ও মিরবক্সী গাজিকে (১) পরিবেষ্টন করিলেন। কিন্তু

জন নর্ত্তকী ছিলেন ; তার পর মোহাম্মদ শাহের সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়া রাজান্তঃপুরে স্থানপ্রাপ্ত হন। কিন্তু অচিরে চরিত্র দোষের জন্য সকলের নিকট ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন ; এমন কি, পাদশাহ পুত্র আমেদকে মাতৃদর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর উধমবাই স্বীয় পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে করতলগত করিয়া Parent of the pure প্রভৃতি বিসদৃশ উপাধিলাভ করেন, এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন। রাজান্তঃপুরের প্রধান খোজা জাওয়েদ খাঁর সঙ্গে তাঁহার অবৈধ ঘনিষ্টতা ছিল। এই সূত্রে জাওয়েদ খাঁ পাদশাহের নামে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তিনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন।

(১) এই গাজি নিজামের পুত্র নহেন, পৌত্র। নিজাম বাহাদুরের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজি ও কনিষ্ঠ পুত্র সলাবত জঙ্গের মধ্যে বিবাদ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে গাজি নিহত হন, এবং সলাবত জঙ্গ শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। গাজির পুত্র গাজি দিল্লীতে মিরবক্সী নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার তরুণ বয়স, কিন্তু তিনি রণকুশল

তিনি রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া জাটদের শরণাপন্ন হইলেন। জাটগণ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করাতে গাজিউদ্দীন তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি পাদশাহের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই জাটদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মহারাষ্ট্র সেনাপতি মহলরাও এবং রঘুনাথ রাওকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা সসৈন্যে উপনীত হইলে সম্মি-লিত সৈন্যের সৈনাপত্য লইয়া খানখানানের সঙ্গে গাজির বিবাদ উপ-স্থিত হইল। বহু বাদানুবাদের পর গাজি সেনাপতির পদে বৃত হইয়া মহারাট্টা সৈন্য সহ জাটদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য গমন করিলেন। সম্মিলিত সৈন্যের আক্রমণে জাটগণ বিপন্ন হইল। কিন্তু এমন সময় মোগলশিবিরে গোলাগুলির অভাব উপস্থিত হইল; গাজি জনৈক সেনানায়ককে গোলাগুলি আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

জাটদুর্গ গাজির হস্তগত হইলে তিনি অত্যন্ত বলশালী হইবেন বলিয়া খানখানানের বিশ্বাস ছিল। গাজির তাদৃশ বললাভ তাঁহার প্রভুত্ব রক্ষার পক্ষে বিঘ্নজনক হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি গোলাগুলি প্রেরণ করিতে নিষেধ করিলেন। খানখানান এই নিষেধ করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না; পাদশাহের নিকট গাজিকে রাজমুকুট লাভের প্রয়াসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পাদশাহ জাট সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়া গাজিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে মৃগয়া ব্যপদেশে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। গাজি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অপরিজ্ঞাত রহিলেন না। তিনি পাদশাহের অভিযানের সংবাদ পাইয়া জাট দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পাদশাহ সেকেন্দ্রাবাদ নামক স্থানে উপনীত হইয়া গাজির প্রত্যাগমন সংবাদ প্রাপ্ত

বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। পিতার ন্যায় ইনিও সফদার জঙ্গের বিরোধী ছিলেন।

হইলেন; (১) তাঁহার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে ফললাভ হইবে না বিবেচনা করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।

গাজি পাদশাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজধানীতে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন! তারপর গাজি প্রতিহিংসাবশে সম্রাটের নয়নদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় আলমগীর।

অতঃপর গাজি তৈমুর বংশোদ্ভব আজিমউদ্দীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার পর তিনি খানখানানকে হত্যা করিলেন। আজিম উদ্দীন সদাশয়তা ও মহানুভবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজত্বের প্রারম্ভে সপ্ত-দশ জন অবরুদ্ধ রাজকুমারকে মুক্তি প্রদান করেন। আজিম উদ্দীন ইতিহাসে দ্বিতীয় আলমগীর নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি রাজ-সিংহাসনে বৃত হইবার পূর্ব্বে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি নাম সর্ব্বস্ব পাদশাহ হইলেন; গাজি স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়া পুত্তলে পরিণত করিলেন। রাজসিংহাসন তাঁহার নিকট কারা-গার অপেক্ষাও হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় আলমগীর গাজি-উদ্দীনের প্রভুত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন রূপেই তাঁহার সর্ব্বময় প্রভুত্ব খর্ব্ব করিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার হস্ত হইতে

---

(১) সেকেন্দ্রাবাদে পাদশাহী শিবিরে ফরকশিয়রের কন্যা প্রভৃতি রাজমহিলাগণ অবস্থান করিতেছিলেন। আখবরি-ইমুহাবত নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, একদা মহলরাও পাদশাহী শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া যান। এ বৃত্তান্ত সত্য হইলে ইহাই দিল্লীর রাজশক্তির পূর্ণ অধঃপতন ও অবমাননার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গ্রাণ্ট ডফ লিখিয়াছেন যে, কেবলমাত্র জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু স্কট সাহেব লিখিয়াছেন যে চীৎকার ও লুণ্ঠনের পর রাজমহিলাদিগকে এক দল রক্ষক সহ দিল্লীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

পরিত্রাণ লাভ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা আবদালীকে আহ্বান করিলেন। (১) আবদালী এই আত্ম কলহের সুযোগে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে অসম্মত হইলেন না। তিনি সসৈন্যে দিল্লীতে আগমন করিয়া গাজি উদ্দীনকে পদচ্যুত এবং পাদশাহকে মনোমত উজীর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। কিন্তু অব্যবহিত পরেই গাজি আফগান বীরকে সুকৌশলে আপন পক্ষাবলম্বী করিয়া পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আবদালী দিল্লীবাসীর নিকট হইতে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। এই সময় তাহাদের এতদূর দুরবস্থা হইয়াছিল যে, নাদির শাহের আক্রমণ কালে দশকোটি মুদ্রা সংগ্রহ করা অপেক্ষা আবদালীর আদেশে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করাই অধিক দুরূহ হইল। পাদশাহ সর্ব্বগ্রাসী গাজির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য মহা শত্রুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না ; উপরন্তু আমন্ত্রিত শত্রু প্রকৃতি পুঞ্জের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন ; তাঁহার অত্যাচারে রাজধানী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইল। পাদশাহ প্রকৃতি পুঞ্জের দুর্দ্দশার অপনয়ন জন্য একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না ; এক দিকে তাহাদের কাতর ধ্বনি গগণ স্পর্শ করিতেছিল, অপর দিকে পাদশাহ মোহাম্মদ শাহের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার আশায় লুণ্ঠন কারীর তোষামোদে ব্যাপৃত ছিলেন। আবদালী ন্যূনাধিক এক বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

---

(১) ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতাক্রমণের পরে ও এই আহ্বানের পূর্ব্বে আবদালী আর একবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই পাদশাহ তাঁহাকে পঞ্জাব অর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত করেন ; এবং তজ্জন্য তিনি আর অগ্রসর না হইয়াই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

আলমগীরের পুত্র আলীগহর রণকুশল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এজন্য গাজি-উদ্দীন তাঁহাকে আপন পথের কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলী গহর কৌশলে কারাভবন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দূরে পলায়ন করিলেন, এবং গাজি উদ্দীনের করাল কাল হইতে পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য মহারাষ্ট্র সেনাপতি ইটলরাওর শরণাপন্ন হইলেন। অর্দ্ধ বৎসর তাঁহারা দিল্লীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু অভিষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়াতে আলীগহর ইটলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেকেন্দ্রাবাদের জায়গীর দার নজব উদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নজব উদ্দৌলা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। একারণ আলীগহর সেকেন্দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সহ অযোধ্যা প্রদেশের প্রধান নগরী লক্ষ্ণৌতে উপনীত হইলেন। এই সময় সফদার জঙ্গের পুত্র সুজাদ্দৌলা অযোধ্যার শাসন পতি ছিলেন। তিনি স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। দিল্লীর পাদশাহের জ্যেষ্ঠ কুমার তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন না। আলীগহর বিফল মনোরথ হইয়া তথা হইতে এলাহাবাদের শাসন কর্ত্তার নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। অতঃপর তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এলাহাবাদের অভিমুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। এবার অযোধ্যার শাসনপতি সুজাদ্দৌলা তাঁহাকে হস্তগত করিয়া তাঁহার নামের সাহায্যে আপন দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে মনন করিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া এলাহাবাদে গমন করিলেন। এলাহাবাদ সুজাদ্দৌলার অধিকৃত হইল।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় অধিনায়কগণ সসৈন্যে পঞ্জাবে উপনীত হন, এবং তথায় সহজেই বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সুবাদার নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া হিন্দু সম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই উদ্যোগ পর্ব্বকালে দিল্লীর রাজবংশ বসন্ত সমাগমে তুষার রাশির ন্যায় লোক লোচনের বহির্ভূত হইতেছিল; সমগ্র ভারতবর্ষে কেহই মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতিদ্বন্দী ছিল না; এবং দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতার পূর্ণ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইত। এই সময়েই দিল্লীর দুর্গ প্রাকারে হিন্দুর বিজয় নিশান উড্ডীন করার পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ স্বরূপ ছিল। (১)

মহারাষ্ট্র সৈন্য পঞ্জাবে সংস্থাপিত হইলে আবদালী আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষাভিমুখে ধাবিত হন। এই সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিলে পাদশাহ গাজির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিপ্রায়ে আবদালীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় শাহজাহান।

ইহাতে গাজি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিলেন,

(১) একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক দিল্লীর সাম্রাজ্যের এই সময়ের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "Every petty chief, in the mean time, by counterfeited grant from Delhi, laid claim to jaigirs and districts; the country was torn to pieces with civil wars, and groaned under every species of domestic confusion. Villainy was practised in every form; all law and religion were trodden under foot, the bonds of private friendship and connexions, as well as of society and government were broken; and every individual could rely upon nothing, but strength of his arm."

এবং দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে একজন রাজকুমারকে শাহজাহান উপাধি দিয়া বসাইলেন। অপরদিকে আলমগীরের পুত্র আলীগহর এলাহাবাদে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া শাহ আলম উপাধি গ্রহণ করিলেন। গাজীর উৎপীড়নে সর্ব্ব সাধারণ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল; তাঁহার উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশঃ এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, একদা কতিপয় সৈনিক পুরুষ প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া নগ্নপদে ও শূন্য শিরে রাজপথে টানিয়া লইয়া যায়। এই সময় তাঁহার মৃত্যু বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু এ অবস্থাতেও গাজি বিরুদ্ধবাদী সৈনিক পুরুষদিগকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে বিরত ছিলেন না। অবশেষে সেনানায়কগণের মধ্যস্থতায় তিনি পরিত্রাণ লাভ করেন। তিনি আপন্মুক্ত হইয়াই নৃশংস ভাবে বিরুদ্ধবাদী সমস্ত সৈনিক পুরুষকে তরবারি মুখে সমর্পণ করেন। তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারে নগরবাসীরা কেহই তাঁহার পক্ষপাতী ছিল না। এই সব কারণে তিনি আবদালীর গতি-রোধ করিতে পারিলেন না; তাঁহার আক্রমণে দিল্লী পুনর্ব্বার বিধ্বস্ত হইল। গাজির সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল, তিনি ভগ্ন হৃদয়ে দক্ষিণা-পথে গমন করিলেন। (১)

আবদালীর সৈন্য গৃহ সকল দগ্ধ ও নরনারীকে হত্যা করিতে লাগিল। রক্ত পিপাসু সৈন্যেরা নির্দ্দোষ নরনারীর রক্তপাতে কিছুতেই বিরত হইল না। অবশেষে তাহারা মৃতদেহ রাশির পূতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া নগর পরিত্যাগ করিল,—নগরবাসীর জীবন রক্ষা

---

(১) ইহার পর গাজির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি আর ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে দেখা গিয়াছিল।

পাইল। কিন্তু তাহাদের প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত ছিল ; তাহারা তরবারির মুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দুর্ভিক্ষের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইল। দলে দলে নরনারী অনাহারে আপন আপন ভগ্নাবশেষ গৃহমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের এইরূপ দুরবস্থার সময়ে মহারাষ্ট্র নায়ক পেশওয়া আবেদালীকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিলুপ্তপ্রায় মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক তদুপরি হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিতে মনন করিলেন।

তদনুসারে তিনি সদাশিব রাও ভাওয়ের সৈনাপত্যে বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জাটবীরগণ ও রাজপুতনার রাজন্যবর্গ সসৈন্যে মহারাষ্ট্র বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। বস্তুতঃ এই অভিযানকে ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃ স্থাপন জন্য সমগ্র হিন্দুজাতির সম্মিলিত অভ্যুত্থান রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্র সেনাপতি দিল্লীতে উপনীত হইয়া দ্বিতীয় শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্বপক্ষভুক্ত মোসলমান আমীরওমরাহের সন্দেহ দূর করিবার জন্য জাহানবক্স নামক একজন রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই অর্ব্বাচীন পাদশাহের শাসনকার্য্যে কীদৃশ দক্ষতা ছিল ? শাসনকার্য্যে দক্ষতা থাকিলেই বা কি হইত ? কারণ, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার লোক ছিল না। ফলতঃ বোধ হয় যেন, মহারাষ্ট্র সেনাপতি মোসলমান রাজলক্ষ্মীর অবমাননার নিমিত্তই জাহান বক্সকে রাজার প্রতিমূর্ত্তিরূপে রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ভাও দিল্লীতে আপনার ক্ষমতার অপ-

ব্যবহার করিয়া আপামর সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠেন। তিনি মূল্যবান্ অলঙ্কারের লোভে রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও ধর্ম্ম মন্দিরের কারুকার্য্য ধ্বংস করেন। ভাও দরবার গৃহের রৌপ্য নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ ধ্বংস করিয়া সতর লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হন, এবং রাজসিংহাসন ও অন্যান্ত মূল্যবান আস্‌বাব আত্মসাৎ করেন।

হিন্দু জাতিকে মোসলমানের রাজশক্তি চূর্ণ করিবার জন্য সম্মিলিত দেখিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মোসলমানগণ আবদালীর সঙ্গে যোগ প্রদান করিলেন। হিন্দু মোসলমান উভয় পক্ষেই ঘোর যুদ্ধের আয়োজন হইল। কিন্তু কেহই অগ্রে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু অবশেষে মহারাষ্ট্র শিবিরে রসদের অভাব উপস্থিত হওয়াতে সদাশিব রাও ভাও ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ক পানিপথের বিশাল প্রান্তরে মোসলমান সৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তুমুল যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানের অঙ্ক-শায়িনী হইলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে হিন্দু সম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশাও চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জিত হইল। পানিপথের যুদ্ধে পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্র সৈন্য রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। ঈদৃশ বিপুল সৈন্য বিনষ্ট হওয়াতে মহারাষ্ট্র-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

পানিপথের যুদ্ধের পর আবদালী গুরুতর প্রয়োজন বশতঃ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময় মহারাষ্ট্র সেনাপতি সদাশিব রাও কর্ত্তৃক স্থাপিত জাহানবক্ত দিল্লীতে পাদশাহ উপাধিধারী ছিলেন। এবং শাহ আলম শূন্য গর্ভ পাদশাহ উপাধি লইয়া এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আবদালী জাহনবক্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাহ আলমকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন না। এজন্য আবদালী নজব উদ্দৌলাকে দিল্লীতে শাহ আলমের

প্রতিধির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শাহ আলম শূন্য গর্ত্ত উপাধি লইয়া দীনভাবে অযোধ্যার আধিপতি সুজাদ্দৌলার আশ্রয়ে এলাহাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার অর্থ কৃচ্ছ্রের একশেষ হইয়াছিল।

একটী ঘটনায় শাহ আলমের অর্থাভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে কুঠি সংস্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতেছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তরুণ বয়স্ক সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গলার মসনদে উপবিষ্ট হন। অচিরে তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গলার রাজপুরুষগণের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়; এবং ইংরেজ বণিক দলের সরদার অসন্তুষ্ট রাজপুরুষগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া নবাবকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত করেন, ও সেনাপতি মীরজাফরের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দেন। ইহাতে বঙ্গদেশে ইংরেজের সর্ব্বময় প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। মীরজাফর অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একারণ ইংরেজ সরদার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে শাসনভার অর্পণ করেন। মীর কাসিম স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি ইরেজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শাহ আলম শূণ্য গর্ত্ত রাজ উপাধি লইয়া এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন; এবং মহারাষ্ট্র, শিখ, জাট ও রোহিলা সৈন্য গৃধ্র কুলের ন্যায় দিল্লীর পর্য্যুসিত মৃতদেহ নখাঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন করিতেছিল। যাহা হউক মীর কাশিম যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া শাহ আলম ও অযোধ্যার অধিপতি সুজাদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা মীর কাশিমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এবারও ইংরেজ জয়লাভ করিলেন; এবং অযোধ্যার নবাব উপায়ান্তর না দেখিয়া

সন্ধির প্রার্থী হইলেন। মীর কাসিমের পর মীর জাফর পুনর্ব্বার বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হন। শাহ আলম ও সুজাদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ কালে তিনিই বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙ্গলার নবাব সমস্ত রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, এবং শাসন কার্য্যও তাঁহার নামে পরিচালিত হইত। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার ভার ইংরেজের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইংরেজ সরদার এই বন্দোবস্ত আপনাদের স্বার্থ বিরোধী মনে করিয়া শাহ আলম ও সুজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যের জন্য নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে সুজাদ্দৌলা এলাহাবাদ ও কোরা জিলা ইংরেজকে অর্পণ করিলেন। ইংরেজ সরদার শাহ আলমকে এই জেলা দুইটী এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ মুদ্রা রাজকর স্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। এই বন্দোবস্তে এই প্রদেশত্রয়ের রাজস্ব ইংরেজের হস্তগত হইল; এবং নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাক বৃত্তি লইয়া দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সব বন্দোবস্ত ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

অতঃপর শাহ আলাম এলাহাবাদে বাস করিয়া ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তি এবং এলাহাবাদ ও কোরা জেলার উপস্বত্ব দ্বারা নিরুদ্বেগে উদর পূর্ত্তি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে সাত বৎসর অতিবাহিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য শাহ আলমকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর দিল্লী ও তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ প্রতিনিধি নজাব দ্দৌলার যত্নে সমস্ত স্থানে শান্তি সংস্থাপিত হয়। পাদশাহ দিল্লীতে গমন করিলে পুনর্ব্বার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করিয়া ইংরেজ সরদার

তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয়গণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বলিলেন; কিন্তু তিনি ক্ষমতা লাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া ইংরেজের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে এলাহাবাদের শান্তি আবাস পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল না; উপরন্তু গোলাম কাদের নামক একজন দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইল। ইংরেজগণ তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন; এবং কোরা ও এলাহাবাদ জেলাও তাঁহার হস্তচ্যুত হইল।

এই সময় রাজধানীর বহির্ভাগে মোগলের কোন আধিপত্য ছিল না। গোলাম কাদের বাহুবলে চতুর্দ্দিকে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সংকল্প করিল; এবং তজ্জন্য সৈন্য পরিপোষণ করিয়া অনেক ব্যয় করিতে লাগিল। বহুব্যয় নিবন্ধন অচিরে অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইল। তখন গোলাম অর্থ লোভে পাদশাহকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এই সময় পাদশাহ আমেদ শাহের পুত্র বেদারবক্ত রাজান্তঃপুরের গুপ্ত ধনাগার হইতে দশ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া রাজসম্মানের প্রার্থী হইল। গোলাম কাদের তাঁহাকে লইয়া কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে রাজ-দরবারে উপনীত হইল, এবং সিংহাসনোপবিষ্ট পাদশাহকে নিরস্ত্র করিতে আজ্ঞা দিল। এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে গোলাম কাদের তাঁহাকে হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিল। এ আদেশও প্রতিপালিত হইল। অতঃপর গোলাম বেদেরবক্তের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল। কিন্তু নবাভিষিক্ত সম্রাট তাহাকে প্রতিশ্রুত দশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার অর্থ লালসা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, রাজমহিলা ও রাজকুমারদিগকে নির্য্যাতন না করিলে গুপ্ত ধনের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এজন্য

গোলাম কাদের রাজকুমার আকবর ও সোলেমান সেকুকে হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিলেন। তারপর দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাদিগকে প্রখর রৌদ্রে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিল। ইহাতেও অভীষ্টানুরূপ অর্থলাভ হইল না দেখিয়া গোলাম কাদের রাজান্তঃপুরের দাসীদিগকে বন্ধন করিয়া তাহাদের হস্ত পদতলে উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিল। এই ভাবে জুলাই মাসের ২৯এ তারিখ অতিবাহিত হইল। পরদিন দুর্ব্বৃত্ত অনুচরবর্গ দুর্ব্বৃত্ত প্রভুর আজ্ঞায় রাজমহিলাদিগকে ধরিয়া বসিল. তাঁহাদের পবিত্র অঙ্গ কলঙ্কিত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু গুপ্ত ধনাগারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এজন্য ১লা তারিখে শাহ আলমকে যন্ত্রণা দিয়া গুপ্ত ধনাগারের বিষয় অবগত হইবার জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তিনি গুপ্ত ধনাগারের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহেন বলিয়া দৃঢ়তা সহকারে বারম্বার প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার বিশ্বাস যে, আমি রাজকোষের অর্থ গোপন করিয়াছি। আমার নিজের শরীর ভিন্ন অর্থ আর কোথায় রাখিব? তুমি আমার উদর বিদীর্ণ করিয়া সন্তুষ্ট হও।" গোলাম কাদের অতঃপর পাদশাহকে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিল। কিন্তু কিছুতেই গুপ্ত ধনের অনুসন্ধান মিলিল না। ইহার পর পাদশাহের বৃদ্ধা মাতা ও অন্যান্য পককেশা পুরাঙ্গণার লাঞ্ছনা আরব্ধ হইল। তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। দুর্ব্বৃত্তদের পাশব অত্যাচারে জল তৃষ্ণায় দুই তিন জন রাজকুমারীর প্রাণ বিয়োগ হইল। এই ঘটনার পরদিন গোলাম কাদের বেদারবক্তের পার্শ্বে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আলস্য বিজড়িত ভাবে তাম্রকূট সেবন করিয়া বর্ব্বরতার পরিচয় দিল। ৬ই তারিখে রাজ সিংহাসন ভগ্ন করিয়া তৎসংযুক্ত

স্বর্ণ রৌপ্য আত্মসাৎ করা হইল। ইহার পর গোলাম কাদের তিন অহোরাত্রি গুপ্ত ধনের উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রাসাদ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কোন স্থানেই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাওয়া গেল না। সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হওয়াতে গোলামের ক্রোধের সীমা রহিল না। গোলাম কাদির গুপ্ত ধন বাহির করিয়া দিবার জন্য শাহ আলমকে আদেশ করিল। তিনি গুপ্তধনের বিষয় পূর্ব্ববৎ অস্বীকার করিলেন। ইহাতে গোলাম কাদের ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিল, তোমাকে পৃথিবীতে রাখিলে কোন ফললাভ হইবে না। তোমার দৃষ্টিশক্তি নাশ করিব।” এই কথা শ্রবণ করিয়া পাদশাহ আবেগ ভরে বলিলেন, “এমন কাজ করিও না, এই চোখের সাহায্যে আমি গত ৬০ বৎসর যাবৎ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাঠ করিয়া আসিতেছি, এখন দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইয়াছে। এই বৃদ্ধের চোখ দুইটি রক্ষা করিতে পার।” গোলাম শাহ আলমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চক্ষু স্পর্শ করিতে ক্ষান্ত রহিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজকুমারদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। শাহ আলম সেই বিকট দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, আমাকে অন্ধ কর, আমি আর এ দৃশ্য দেখিতে পারি না। এই বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্র গোলাম কাদের সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া উঠিল ও শাহ আলমকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার চোক দুইটি তুলিয়া ফেলিল। অতঃপর পাদশাহকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। ইহার কতিপয় দিবস পরে গোলাম কাদের মহারাষ্ট্র সেনাপতি সিন্ধিয়ার হস্তে অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেদারবক্তেরও রাজনাম ঘুচিয়া গেল। মহারাষ্ট্রীয়গণ অন্ধ শাহ আলমকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহার নামে দিল্লী শাসন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে

ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক দিল্লী জয় করিয়া অন্ধ ও উপবাসক্লিষ্ট পাদশাহকে হস্তগত করিলেন। ইংরেজগণ তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। দিল্লী ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল।

শেষ।

শাহ আলমের পৌত্র বাহাদুর শাহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তি উপভোগ করিয়া দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময় সিপাহিগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে তিনি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজ তাঁহাকে এই অপরাধে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করেন। কতিপয় বৎসর গত হইল, এই স্থানে তিনি শান্তির ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষ হইতে তৈমুর বংশের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ক গতা ধরণীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥

মোগল সাম্রাজ্য।

শাসন ব্যবস্থা।

ধর্ম্মমণ্ডলী নরপতি নির্ব্বাচন করিবেন; এবং কোরাণের আদেশ উৎকট ভাবে উল্লঙ্ঘন করিলে সে নরপতি পদচ্যুত হইবেন, ইহাই এসলাম ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু কার্য্যকালে মোসলমান জাতির রাজপদ বংশানুক্রমিক ও রাজার ক্ষমতা অখণ্ড। মোসলমান নরপতি এসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান প্রতিপালন করিবার জন্য লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী। কিন্তু তিনি পদে পদে সে বিধান উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাঁহার অনুগত করিয়া তুলিবার কোন পন্থা নাই। প্রকৃতি-পুঞ্জ বিদ্রোহ অবলম্বন ব্যতীত আর কোন উপায়েই রাজার তাদৃশ স্বেচ্ছাচারের গতিরোধ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের মোগল নরপতিগণও রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোন নিয়মাধীন ছিলেন না। তাঁহার স্বেচ্ছামত রাজকার্য্য পরিচালনা করি-তেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে আদেশ প্রদান করিতেন, তাহাই সর্ব্বসাধারণকে শিরোধার্য্য করিতে হইত। কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর, কি নগণ্য কৃষক, সকলেরই ধনপ্রাণ তাঁহাদের অঙ্গুলিসঞ্চালনে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইত। বিদ্রোহ অবলম্বন ব্যতীত ইহার প্রতিরোধ করিবার আর কোন উপায়ই ছিল না। ফলতঃ ভারতবর্ষের মোগল শাসন প্রণালী যথেচ্ছামূলক ছিল।

বাবর সসৈন্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাহুবলে লোদি বংশের হস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করেন। আফগান নরপতিগণ ভূস্বামী ছিলেন। তদনুসারে বাবরও দেশের সমস্ত ভূমির অধিকারী(Proprietor)

হন। এই ভূমির রাজস্বই মোগল নরপতিগণের অতুল ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ ছিল। প্রথমে প্রকৃতিপুঞ্জ কেবল মাত্র অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ অর্থের অধিস্বামী ছিল; কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার অনুমতি ব্যতীত তাদৃশ সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী নিয়োগ সম্বন্ধে চরম পত্র দ্বারা কোন প্রকার নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু কালবশে এ প্রথার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মোগল পাদশাহগণ কোন কোন কার্য্যের জন্য রাজপুরুষদিগকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি প্রদান করিতেন। রাজপুরুষগণ ইচ্ছামত এই সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিতে পারিতেন, এবং কোন রাজপুরুষ মৃত্যুর পূর্ব্বে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অন্যরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া না গেলে তদীয় সন্তানবর্গ কোরাণের নির্দ্দেশ মত সমস্ত সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেন। এইরূপ ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই নরপতিগণ পূর্ব্বোক্ত জায়গীর সকল বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন; তাহার প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। কোন কোন পাদশাহ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন; অনেক স্থলে তাঁহাদের তাদৃশ কার্য্যের সমর্থনও করা যাইতে পারে। সাম্রাজ্যের স্বামিত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে রাজকুমারগণ সেনাপতিদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্য বিনা বিচারে জায়গীর দান করিতেন। দু'একবার রাজবিপ্লবের পরেই পূর্ব্বোক্ত কারণে রাজস্ব বহুলপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। এজন্য পাদশাহগণ কখন কখন সাম্রাজ্যকে অর্থাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুরুগণের বিপ্লবলব্ধ জায়গীর সকল ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

পাদশাহগণই সমস্ত প্রজার সাধারণ উত্তরাধিকারী ছিলেন। মূল ধনীর সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহারা স্বয়ং প্রজার সম্পত্তি কদাচিৎ

গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কোন রাজপুরুষ প্রজাপীড়ন দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলে পাদশাহগণ তাঁহার মৃত্যুর পর সে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেন। এরূপ স্থলে মূল ধনীর সন্তান অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ কাজির নির্দ্দেশমত জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত বৃত্তি পাইতেন; তাঁহাদিগকে রাজকার্য্যেও নিযুক্ত করা হইত। কোন প্রকার ওয়ারীস বিদ্যমান থাকিলে বণিক, ব্যবসায়ী অথবা শিল্পিগণের সম্পত্তি কখনও বাজেয়াপ্ত করা হইত না।

মোগল শাসনকালে রাজপুরুষগণের মর্য্যাদা ও সম্মান বংশানুক্রমিক ছিল না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিভাবলে রাজকার্য্যে প্রতিপত্তি এবং রাজানুগ্রহে দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়া যশস্বী ও সম্মানভাজন হইতেন। কোন প্রতিভাশালী রাজপুরুষের বংশ-মর্য্যাদা থাকিলে তাহা সোণায় সোহাগার ন্যায় কার্য্য করিত; তাঁহারা বংশ-গৌরবগর্ব্বিত সম্রাটাগণের সমধিক প্রিয়পাত্র হইতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা ও পদবী রাজকার্য্যের অনুগত ছিল। কেবলমাত্র সৈনিক বিভাগে এই নিয়মের ব্যত্যয় দৃষ্টিগোচর হইত। বিচারক, সাহিত্যবিদ ও বনিকগণ অনেক সময় উপাধিলাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন এবং রাজদরবারে আমীর ওমরাহগণের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আসন লাভ করিতেন। অভিজাত সম্প্রদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; (১) আমীর, (২) খাঁ, (৩) বাহাদুর। সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সুবাদারগণ আমীরশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। খাঁ উপাধিধারিগণ সৈন্য বিভাগের বিশিষ্ট পদসমূহে নিয়োজিত ছিলেন। বাহাদুরগণ কার্য্যাদিতে বিলাতী নাইট সম্প্রদায়ের অনুরূপ ছিলেন। এই তিন শ্রেণীর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না।

হিন্দুরাজত্বকালে কর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষদিগকে পারিশ্রমিক

স্বরূপ ভূমিদান করিবার প্রথা ছিল। দক্ষিণাপথে মোসলমানের প্রবেশ-লাভ করিবার সময় বিজয়নগর প্রভৃতি রাজ্যে এইরূপ জায়গীরের প্রথা বিদ্যমান ছিল। মোসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সৈনিক-গণের পারিশ্রমিক প্রদান করিবার জন্য কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। ফেরিস্তার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নাশিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে জায়-গীর প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার রাজত্ব কালের শেষ। পক্ষান্তরে সমস্-ই-সিরাজের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফিরোজ শাহ তোগলকই (১৩৬৫ খৃঃ) প্রথমে রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ জায়গীর প্রদানের প্রথা প্রব-র্ত্তিত করেন, এবং ফিরোজের পূর্ব্ববর্ত্তী আলাউদ্দীন (১২৯৫ খৃঃ) এ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। (১) আমরা পরস্পর বিরোধী বিবরণের বর্ণনা প্রণালী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করি যে, মোসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই জায়গীরের প্রথা অনুসৃত হইয়াছিল, কিন্তু আলাউদ্দীন এ প্রথার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন; তাহার পর ফিরোজশাহ তোগলক আলাউদ্দীনের নিয়ম রহিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করেন।

---

(১) Some ancient Omrahs, who had estates conferred on them in the provinces near the Indus, had, for some time past, refused to supply their quotas to the army, for the maintenance of which they held these estates. Quoted from the reign of Nasiruddin Mamood in Dow's History of Hindostan.

This method (of paying officials) was introduced by Sultan Feroz and remains as a memorial of him. In the reigns of the former rulers of Delhi it had never been the rule to bestow villages

যাহাহউক, বাবর ভারতবর্ষে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া জায়গীর প্রদানের প্রথাই অবলম্বন করেন। তিনি সেনাপতিদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন এবং সেনাপতিগণ এই প্রকার জায়গীরের উপস্বত্ব দ্বারা অধীন সেনাদিগকে পারিশ্রমিক দিতেন। হুমায়ূনও এই প্রথাই অললম্বন করিয়াছিলেন। এই প্রথার তিনটী দোষ ছিল। প্রথমতঃ অধীন লোকের প্রতি জায়গীর ভোগী সেনাপতিগণের অখণ্ড আধিপত্য সংস্থাপিত হইত, এজন্য তাঁহারা সহজেই বিদ্রোহ অবলম্বন করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা জায়গীর ভূমির কর আদায় করিবার সময় অত্যধিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতেন। তৃতীয়তঃ, সেনাপতিগণ যে পরিমাণ সৈন্য প্রতিপালন করিবার উপযোগী জায়গীর ভোগ করিতেন, তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিতেন এই সব কারণে আকবর এই প্রথা রহিত করিয়া সৈন্যদিগকে নগদ পারিশ্রমিক প্রদান করিবার নিয়ম করেন। তিনি সেনাপতিদিগকে মনসবদার উপাধি প্রদান করেন। তাঁহারা গুণানুসারে দশহাজার, সাতহাজার, পাঁচহাজার কিম্বা তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করিতেন এবং তাহাদের বেতন রাজকোষ হইতে পাইতেন।

---

as stipends upon office-bearers * * * * * * Sultan Alauddin used to speak of this practice with disapprobation. * * * * * * Such a number of pensioners would give rise to pride and insubordination, and if they were to act in concert, there would be danger of rebellion. With these feelings there is no wonder that Alauddin refused to make grants of villages and paid his followers every year with money from the Treasury. * * * * During the forty years of his reign, he (Firoz) devoted himself to the generosity and benefit of Musalmans by distributing villages and lands among his followers :—*Tarikh-t-Firoz-shahi* by Shams-i Siraj Afif.

অধীন সৈন্যের সংখ্যানুসারে সেনাপতিদিগকে দশহাজারী, সাতহাজারী প্রভৃতি বলা হইত। সমগ্র সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের পরিচালনার নিমিত্ত কোন এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাতানুসারে সেনানায়ক নিয়োজিত করিবার নিয়ম ছিল না। প্রত্যেক মনসবদারের অধীন সৈন্যের একার্দ্ধ পদাতিক ও অপরার্দ্ধ অশ্বারোহী ছিল। পদাতিক সৈন্যের চতুর্থাংশ বন্দুকধারী ও অবশিষ্ট তিরন্দাজ ছিল। মনসবদারের অধীন সৈন্য ব্যতীত আর এক শ্রেণীর সৈন্য ছিল। তাহাদিগকে আহেদী বলিত। অনেক সময় রণ কুশল অশ্বারোহী সৈনিক একাকী মোগল সরকারে কর্ম্ম প্রার্থনা করিত ; তাহাদের দ্বারাই এই সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের বেতন মনসবদারের অধীন অশ্বারোহী সৈন্যদের পারিশ্রমিক অপেক্ষা অধিক ছিল। আহেদী সৈন্যের বেতন গুণানুসারে স্থিরীকৃত হইত। মানসবদারের অধীন অশ্বারোহী সৈন্যবৃন্দমধ্যে ভারতবাসিগণ মাসিক বিশ টাকা ও সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবাসিগণ মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইত। তিরন্দাজ পদাতিক সৈন্যের বেতন মাসিক আড়াই টাকা ও বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্যের বেতন মাসিক ছয় টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আওরঙ্গজেব পাদশাহের সময়ে আহেদী সৈন্যের বেতন মাসিক পঁচিশ টাকার ন্যূন ছিল না। মোগল পাদশাহগণ গোলন্দাজবিভাগে ইউরোপীয়ানদিগকে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব এ প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া মোসলমানদিগকে গোলন্দাজ বিভাগের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল মনসবদার আমীরশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, তাঁহারা মাসিক দুইশত হইতে সাতশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। সুবিখ্যাত বের্ণিয়ার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, মোগলাধীন মনসবদারগণের বৃত্তি যথেষ্ট ছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে অবুল ফজল মনসব-

দারগণের মাসিক বৃত্তি যে হার উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

দশ হাজারী—৬০০০০৲
আট হাজারী—৫০০০০৲
সাত হাজারী—৪৫০০০৲
পাঁচ হাজারী—৩০০০০৲
চারি হাজারী—২২০০০৲
তিন হাজারী—১৭০০০৲
দুই হাজারী—১২০০০৲
এক হাজারী— ৮২০০৲

কেবল মাত্র রাজকুমারগণকেই দশ হাজারী মনসব প্রদান করা হইত। রাজকুটুম্বগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিলে আট হাজারী ও সাত হাজারী মনসবদার হইতে পারিতেন। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতাগুণে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিতেন। আকবরের পর বাদশাহগণ পুনশ্চ জায়গীর প্রদানের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন; এবং ক্রমশঃ জায়গীর ভূমি দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীরদারগণ কালক্রমে সম্মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক বংশানুক্রমিক স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী রাজ্যের সূত্রপাত করাতেই মোগল সম্রাজ্যের পতন দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। (১)

মোগলশাসনকালে সৈন্য-সংখ্যা কত ছিল তাহা যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় নাই। বের্ণিয়ার সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আওরঙ্গজের পাদশাহের দুই লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এতদ্ব্যতীত

(১) Keen's The Turks in India, p. 160.

তিনি গোলন্দাজ এবং অশিক্ষিত পদাতিক সৈন্য পরিপোষণ করিতেন। আকবরের সময়ে এতাধিক সৈন্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না।

মোগল জাতির এক কোরাণ ব্যতীত আর কোন শাস্ত্র-গত অনুশাসন ছিল না। দেশাচার ও যুক্তিমূলক কতকগুলি বিধান প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল; এসকল বিধানের কথাও লিপিবদ্ধ ছিল। এতদ্দ্বারা কোন কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হইত। পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট এই সকল বিধানের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

পল্লীগ্রামে কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে, গ্রাম্য পঞ্চায়েত তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। কিন্তু প্রত্যেক পরগণায় একজন করিয়া কাজি নিযুক্ত থাকিতেন, এই সকল বিচারক এক এক সময়ে উৎকোচগ্রাহী হইতেন। বিচার্য্য সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ কাজিদিগকে দিতে হইত। কাজিগণ বিচারকার্য্য তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন করিতেন। কোন কাজি বিচার বিভ্রাট ঘটাইলে ও সে সংবাদ পাদশাহের কর্ণগোচর হইলে অভিযুক্ত কাজির গুরুদণ্ড হইত। এজন্য তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইতেন না। কোন বিবাদে উভয় পক্ষই হিন্দু অথবা মোসললান হইলে কাজিগণ অপক্ষপাতে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কদাচিৎ কোথায়ও বিচার বিভ্রাট ঘটাই-তেন। কিন্তু এক পক্ষ হিন্দু ও অপর পক্ষ মোসলমান হইলে অনেক সময় হাস্যকর বিচারাভিনয় হইত। কেবল মাত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকেই কাজি নিযুক্ত করিবার জন্য কোরাণের কঠোর অনুশাসন আছে। এজন্য অনেকস্থলে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণই কাজির পদে নিযুক্ত হইতেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কাজির বিচারকালে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি-বার জন্য মুফ্‌তি নামক এক শ্রেণীর শাস্ত্রবিদ্‌গণ নিযুক্ত থাকিতেন।

সমাজ, ধর্ম্ম ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে হিন্দু-দিগকে কাজির বিচারের অধীন হইতে হইত না। তাহার মীমাংসার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল।

কাজিগণ কোন অপরাধের নিমিত্ত প্রাণ দণ্ডের বিধান করিলে তাহা সুবাদারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইত। এইরূপ অনুমতি না পাইলে সে আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার নিয়ম ছিল না। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন বিবাদে অর্থী প্রত্যর্থী সন্তুষ্ট না হইলে তাহারা উর্দ্ধতন আদালতে অভিযোগ করিতে পারিত। এখানে স্বয়ং সুবাদার বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজধানীতে তিনজন উচ্চপদস্থ বিচারকর্ত্তা প্রজা-গণের অভিযোগের মীমাংসা করিতেন। তাঁহারা আসেসরগণের সাহায্যে আপীল অথবা প্রথম অভিযোগের বিচারকার্য্য সমাধা করিতেন।

এতদ্ব্যতীত মোগল পাদশাহ স্বয়ং প্রকৃতিপুঞ্জের অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার করিতেন। অভিযোগের বিষয়টী সরল ও স্পষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করা হইত। কিন্তু বিষয়টী জটিল হইলে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ ও শাস্ত্রবেত্তার অভিমত জিজ্ঞাসা করিবার নিয়ম ছিল। বিচার্য্য বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সময় সময় মীমাংসার ভার রাজধানীর আদালতের প্রতিও অর্পণ করা হইত। কিন্তু এস্থলেও অর্থী প্রত্যর্থী আদালতের মীমাংসার বিরুদ্ধে পাদশাহের নিকট পুনর্ব্বিচার প্রার্থী হইতে পারিত। পাদশাহ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাত্র মিত্র সহ দরবারে উপবেশন করিতেন। তৎকালে একজন নগণ্য প্রজাও আবেদন পত্র হস্তে উপস্থিত হইলে, পাদশাহ তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ পূর্ব্বক যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিতেন।

প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ দ্বারা মন্ত্রি সমাজ গঠিত ছিল। কোন

গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা কালে মন্ত্রিগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার নিয়ম ছিল। মন্ত্রিগণ আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করিতেন, তাহার পর পাদশাহ ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন, অথবা মনঃপুত না হইলে তাঁহাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের ইচ্ছামত আদেশ প্রচার করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে নিম্ন-শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণেরও পরামর্শ জিজ্ঞাসু হইতেন। কোন প্রদেশ সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার আবশ্যক হইলে তদ্দেশ সম্বন্ধীয় সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্ত্রণা গ্রহণ করা হইত।

মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের নাম উজীর। সমস্ত রাজকীয় ঘোষণাপত্র ও আদেশলিপি তাঁহার সহি মোহর যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। উজীরের স্বাক্ষরের পর পাদশাহ তাহাতে স্বীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেন। উজীরের দপ্তর নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য পরিচালনের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিয়োজিত ছিলেন। উজীরের হস্তে আয় ব্যয় বিভাগের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল। তিনি প্রাদেশিক রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পদগৌরবে ও ক্ষমতায় উজীরের নিম্নেই মিরবক্সী। মিরবক্সী সমর বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। ইনি উজীরের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিলেন না। প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। আবুল ফজল আকবরের সময়ের প্রত্যেক বিভাগের নির্দ্দিষ্ট কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। রাজকোষ ও টাকশালের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুগন্ধ, ফল ও পুষ্প সংক্রান্ত কার্য্যালয়, রন্ধনশালা এবং কুকুর খানা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিভাগের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই বিবরণ পাঠ করিলে নয়ন সমক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও বৈভবের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং তাহাতে সহজেই পাঠকের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রদেশ সমূহের শাসন সংরক্ষণ জন্য এক এক জন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের উপাধি সুবাদার বা নিজাম ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার প্রবল ক্ষমতা ও দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ছিল। যদিচ শাসনকর্ত্তৃগণ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পাদশাহী নিয়মাধীন ছিলেন, তথাপি তাঁহারা অনেক সময়ে এক এক জন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার ন্যায় কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বৎসরান্তে নিরূপিত রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করিলে পাদশাহ তাঁহাদের কৃত কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করিতেন না। পাদশাহের অনুমতি সাপক্ষে তাঁহারা ভূসম্পত্তি দান করিতে পারিতেন। সৈনিক ও অন্যান্য বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীর বহাল বরতরফ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কেবলমাত্র যে সকল কর্ম্মচারী পাদশাহী নিয়োগক্রমে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সুবাদারগণ পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও কোন কোন কর্ম্মচারী অন্যায়াচরণ করিলে পাদশাহের আদেশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সস্পেণ্ড করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃবর্গের ছিল। বিচারকর্ত্তৃগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে সুবাদারগণই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। দেশের শান্তি ও রাজশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য সুবাদারগণ সর্ব্বতোভাবে দায়ী ছিলেন। দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ানের উপর অর্পিত ছিল। রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যে সুবাদারগণের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কেহ রাজস্ব সংগ্রহকালে প্রতিবন্ধকাচরণ করিলে তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারাই দায়ী ছিলেন। শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যয় দেওয়ানের মারফৎ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে গ্রহণ করিতে হইত।

পদগৌরবে ও ক্ষমতায় সুবাদারের নিম্নেই দেওয়ান। দেওয়ান পাদ-

শাহী নিয়োগক্রমে নিযুক্ত হইতেন, তিনি কোন বিষয়ে সুবাদারী কর্তৃত্বাধীন ছিলেন না। রাজস্ব, শুল্ক, ও অন্যান্য রাজকর সংগ্রহের ভার দেওয়ানের হস্তে অর্পিত ছিল। দেওয়ান দেশের শাসনসংক্রান্ত নিরূপিত ব্যয় সুবাদারের নির্দ্দেশ মত প্রদান করিয়া উদ্বর্ত্ত রাজস্ব রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন। দেশের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের জন্য পাদশাহী সরকারে দেওয়ানই দায়ী থাকিতেন। এজন্য সুবাদার কোন প্রকার অন্যায খরচ করিলে অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্য নিযুক্ত করিলে দেওয়ান সে ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজকোষের অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইতে পারিতেন।

শাসন সৌকার্য্যার্থ এক একজন সুবাদারের শাসনাধীন দেশকে কতিপয় সরকারে, প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণাতে এবং প্রত্যেক পরগণা কতিপয় দাস্তরে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

প্রত্যেক সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য এক এক জন ফৌজদার রাখিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্য ব্যতীত আপন আপন বিভাগের সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। সরকার সমূহের শান্তি রক্ষা এবং সুশাসনের ভারও তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক পরগণার জন্য দেওয়ানের অধীনে একজন করিয়া ক্রোরী নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা দেওয়ানের নির্দ্ধেশমত রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রোরীগণের অধীনে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য ফসিলদারগণ নিযুক্ত ছিলেন। বৃহৎ বৃহৎ নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কোতয়াল নিযুক্ত থাকিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে রাজস্ব কর্ম্মচারিগণই শান্তিরক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

প্রত্যেক পরগণার জন্য এক এক জন কারকুন নিযুক্ত থাকিতেন।

তাঁহারা পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্যের দৈনিক বিবরণী রক্ষা করিতেন। সে বিবরণীতে শীকদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর রাখিবার নিয়ম ছিল। এই বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার প্রতি তিন মাস অন্তর রাজধানীতে প্রেরণ করিতে হইত। যাহাতে প্রাচীন রীতি-নীতির অন্যথাচরণ,—নূতন বাজেকরের প্রবর্ত্তন এবং অন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য পরগণা সমূহের কারকুনগণ আদিষ্ট ছিলেন। শীকদার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের কাগজ পত্র যথাযথরূপে লিখিত হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার ভারও তাঁহাদের হস্তেই সমর্পিত ছিল। কারকুনগণ যে সকল বিবরণী রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন, তাহার মর্ম্ম রাজস্ব বিভাগের দপ্তরে সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত ছিল। ইহার ফলে দেওয়ানগণ হিসাব নিকাশ প্রদান করিবার পূর্ব্বেই পাদশাহ সুবা সমূহের রাজস্ব সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের সমস্ত বিবরণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন। এজন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়ানগণের অপকার্য্যের প্রতিরোধক ছিল এবং তাঁহাদিগকে বহুল পরিমাণে ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিত।

মোগল পাদশাহ ইচ্ছাক্রমে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিতে পারিতেন। যথেচ্ছামূলক শাসনপ্রণালীবদ্ধ রাজ্যে এরূপ নিয়ম প্রয়োজনীয়। জ্যেষ্ঠপুত্রই উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু পাদশাহের ইচ্ছা হইলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিত। নানা কারণে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মোগল রাজপুত্রগণের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যলাভের আশা তাঁহাদিগকে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও পিতার অনুগত করিয়া রাখিত। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনাধিকারী, এসম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকাতে রাজপুত্র মাত্রেই রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এজন্য মোগল পাদশাহের মৃত্যুর পর রাজবিপ্লব

উপস্থিত হইত। এই বিপ্লবকালে প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যবৃন্দ যে রাজকুমারের পক্ষ অবলম্বন করিত, তাঁহারই রাজসিংহাসন লাভের সমধিক সম্ভাবনা থাকিত। সুতরাং রাজকুমারগণ পিতার জীবদ্দশাতেই প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যবৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত রাখিবার কল্পনায় অনেক সময়ে সৎপথ অবলম্বন করিতেন এবং প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতে যত্নশীল হইতেন। যথেচ্ছামূলক শাসনপ্রণালীবদ্ধ রাজ্যের অধিপতি তরুণ বয়স্ক অথবা দুর্ব্বলচিত্ত হইলে তাহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই সব কারণে মোগল পাদশাহের উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োজনীয়ই ছিল।

আমরা এস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার যে রেখাপাত করিলাম, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে রাজপুরুষগণের পক্ষে বিদ্রোহ অবলম্বন করা সহজ সাধ্য ছিল। মোগল পাদশাহ রাজপুরুষগণের বিদ্রোহ আশঙ্কায় অনেক সময় প্রজাহিতৈষী হইতেন। রাজপুরুষগণের বিদ্রোহ কালে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার পক্ষাবলম্বী থাকিলে তাঁহার সিংহাসন অটল থাকিত। এজন্য মোগল পাদশাহ সুশাসনে প্রজাবৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট রাখিতে যত্নশীল ছিলেন। সার টমাস্ রো লিখিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীর পাদশাহ প্রজারঞ্জনের জন্য প্রত্যহ গবাক্ষ পথে একবার উপনীত হইয়া জন সাধারণকে দর্শন দিতেন; এ নিয়মের ব্যত্যয় হইত না। কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত করিবার নিয়ম ছিল। কারণ সমস্ত প্রজা তাঁহার ক্রীতদাস তুল্য; এজন্য তিনিও পারস্পরিক সম্বন্ধে তাহাদের নিকট এক প্রকার দাসত্বে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি এক দিন দৃষ্ট না হইলে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতির উপযুক্ত হেতু প্রদর্শিত না হইলে প্রজাগণের বিদ্রোহ অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই বিবরণ হইতে অনুমিত হইবে যে, মোগল পাদশাহের পক্ষে প্রজারঞ্জন করা

কীদৃশ প্রয়োজনীয় ছিল। স্বেচ্ছাচারী রাজার সিংহাসন প্রজা প্রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা কথনও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেনা। দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার যথেচ্ছামূলক শাসন প্রণালীর প্রকৃষ্ট নীতি নহে। যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় রাজভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বেচ্ছাচারী রাজার সিংহাসন অভিসিঞ্চিত করিতে পারে, তদুপায় অবলম্বন করাই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য। মোগল পাদশাহগণ এই আদর্শে রাজ্য-শাসন করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিভাশালী দয়ার্দ্রচিত্ত প্রজারঞ্জক পাদশাহগণের সুশাসনে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর কাল উহার মহিমা ও প্রাধান্য অটুট থাকে। বাবর ভারতের প্রথম মোগল পাদশাহ। তিনি অসি হস্তে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া হিন্দুস্থানে মোগলের বিজয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উদারচেতা পুরুষসিংহ সে অসি কথনও প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তে কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি বিজিতদেশ শাসন করিতেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থপরতা দয়াধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ছিল না। এজন্য তিনি দেশ শাসনোপলক্ষে কথনও অত্যাচারের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই, পরন্তু তাহাদের মঙ্গল বিধান জন্য মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার ভারতাগমন পরস্ব লুণ্ঠন জন্য আকস্মিক আক্রমণ নহে। তিনি দেশের রাজস্বই আপনার অতুল অধ্যবসায় ও উৎকট পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বাবর সেনাপতিদিগকে পারিশ্রমিক প্রদানকালে কথনও হস্ত সঙ্কুচিত করেন নাই। এজন্য তাঁহারা রাজপ্রদত্ত অর্থেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। বাহ্যাড়ম্বর ও রূপৈশ্বর্য্যপ্রিয়তা বাবরের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য রাজ্যের স্বাভাবিক আয়ই তাঁহার সমস্ত অভাবমোচনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি কথনও বিজয়াধীন প্রকৃতিপুঞ্জের ধননাশের

প্রতি ঈর্ষ্যা কলুষিত নয়নে দৃষ্টিপাত করেন নাই। যে সকল বীরপুরুষ হিন্দুস্থানে মোগলের বিজয় বৈজয়ন্তি বহনকার্য্যে বাবরকে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার চরিত্রবলে সঙ্কুচিত ছিলেন। এজন্য তাঁহারাও প্রকৃতিপুঞ্জের সঙ্গে ব্যবহার কালে সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিতেন।

বাবরের পুত্র হুমায়ূন প্রতিভান্বিত বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রজাপ্রীতির অভাব ছিল না। তিনি নিজে কখনও প্রজার শোষণ কার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। হুমায়ূনের মস্তক হইতে দুর্দ্দান্ত শের শাহ রাজমুকুট কাড়িয়া নিয়াছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষের প্রকৃতি-পুঞ্জ হুমায়ূনের পক্ষপাতী ছিল না। রাজ্যচ্যুত হইবার পর তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল ; প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অনুরাগী থাকিলে তাঁহার তাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হইত কি না, সন্দেহের স্থল। তিনি সপ্তদশ বৎসর কাল তরঙ্গ সঙ্কুল নদীগর্ত্তে নিমজ্জিত তৃণখণ্ডের ন্যায় নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে সিংহাসন পাতিয়াছিলেন। এ সময়েও তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের পূর্ব্ববিরাগের প্রতিশোধ লইতে উৎসুক হন নাই।

হুমায়ূনের পুত্র আকবর প্রজা-প্রীতির মোহনমন্ত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্ব-সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং ন্যায় ধার্ম্মানুমোদিত পথে প্রজা পালন করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। তিনি রাজার বিনা অনুমতিতেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রজাবর্গকে অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ-পুরুষগণের শোষণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ বিধা-নের প্রণয়ন করেন।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর অস্থিরমতি নৃশংস নরপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় একবারে কোমলতা বর্জ্জিত ছিল না ; এবং তাঁহার শাসন

কার্য্য পিতৃ অনুসৃত পথেই পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্য অপক্ষপাতে ন্যায় বিচার করিতেন। এমন কি, ন্যায় বিচারের জন্য তিনি প্রিয়তমা মহিষী নুরজাহানের পালিত পুত্রকে হস্তীর পদতলে পেষণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ট্যাভারনিয়ার লিখিয়াছেন যে, শাহজাহান অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন।

শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব কূটনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি আপনার গন্তব্য পথ নিরঙ্কুশ করিবার জন্য পাপে দ্বিধা শূন্য ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত বিষ প্রয়োগে অনেকের ইহলীলার শেষ হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মান্ধতায় হিন্দুগণ অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব নিজে কখনও প্রজার ধনরত্নের প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করেন নাই এবং রাজপুরুষগণের শোষণ ও অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। তিনি ভ্রাতৃরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া ছিলেন, কিন্তু জীবনে আর কখনও প্রকাশ্যভাবে নৃশংস আচরণের পরিচয় প্রদান করেন নাই। মির আতইআলম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি কখনও কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন নাই।

মোগল শাসনকালে প্রকৃতিপুঞ্জ পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছে, তাহারা কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করে নাই; ইহা প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, মোগল পাদশাহগণ প্রজা হিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রজার হিতকর বিধান প্রণয়ন করিলেই তাহা প্রতিপালিত হয় না; তাহার প্রতিপালন জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সর্ব্বদা সন্ধিবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া

বাদশাহগণ সকল সময়ে রাজপুরুষগণের কার্য্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। এজন্য নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত। বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবের বংশধরগণ প্রজাপালনে অপটু দুর্ব্বলচিত্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা বিলাসস্রোতে ভাসমান থাকিতেন, এবং দুরাকাঙ্ক্ষ মন্ত্রি-সমাজের কার্য্যানুমোদন করিয়াই আপন আপন রাজকীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিতেন। এই নির্জীব রাজন্যবর্গ মন্ত্রিগণের কর ধৃত সূত্রাবলম্বনে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, এবং কোন কারণে সে সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেই তাঁহারা ভূলুণ্ঠিত হইতেন। এই সব কারণে মোগল শাসনের শেষ ভাগে দেশ মধ্যে অরাজকতার রাজত্ব ছিল।

রাজস্ব।

অসাধারণ বৈভবশালী মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ অবগত হইবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। সুদৃশ্য রাজ দরবার, বিপুল সৈন্য, অসংখ্য রাজ কর্ম্মচারী, সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ অভিজাত সম্প্রদায় এবং রাজ পরিবারবর্গের ভোগবিলাসের জন্য পাদশাহগণ প্রভূত ধন ব্যয় করিতেন। তাঁহারা এই প্রভূত ধন কি ভাবে সংগ্রহ করিতেন, তাহা আলোচনার যোগ্য। ভূমির রাজস্বই রাজস্বের প্রধান অংশ। আমরা এখানে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম।

আকবর	১৫৯৪	...	১৬৫৬৮৮০০০
ঐ	১৬০৫	...	১৭৪৪৮৮০০০
জাহাঙ্গীর	১৬২৭	...	১৭৪৯৩৩০০০
শাহজাহান	১৬২৮	...	১৬৬৬৬৬০০০
ঐ	১৬৪৮	...	২২০০০০০০০
ঐ	১৬৫৫	...	২৬৭৩৭৭০৭৭

আওরঙ্গজেব	১৬৬০	...	২২৫৮৬৬০০০
ঐ	১৬৬৬	...	২৩৭৩৩৩০০০
ঐ	১৬৬৭	...	২৭৪২২২০০০
ঐ	১৬৯৭	...	৩৮৭১১১০০০
ঐ	১৭০৭	...	৩০১৭৭৭০০০

মোগল শাশনাধীনে ভূমির রাজস্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আকবর শাহেব রাজত্বের শেষভাগে ভূমির রাজস্ব ১৬৫৬৮৮০০০ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব পাদশাহের চরমোন্নতির সময় উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৩৮৭১১১০০০ টাকায় পরিণত হয়। করদ-রাজ্য সমূহ হইতে পাদশাহগণ যে রাজকর প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও এই তালিকায় গ্রহণ করা হইয়াছে। দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্য সকল করদরাজ্যে পরিণত হওয়াতেই ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৬৬০ ও ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ কালে অন্তর্বিপ্লবে সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত হইয়াছিল, এবং তারপর ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; ইহাই ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস পাইবার কারণ। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ ও দক্ষিণাপথের অরাজকতা নিবন্ধন ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাসনকার্য্য সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, রাজকোষে পাদশাহগণের নিজ ব্যয় জন্য কি পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত; আমরা তাহা নির্ণয় করিতেছি। মির আতই আলম নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব ২৩১১৪২৯০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, তন্মধ্যে পাদশাহগণ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ (খালেসা) ৪৩১৯৯৫০০ মুদ্রা গ্রহণ করিতেন। সৈনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য (জায়গীর) ১৮৭৯৪৩

৩০০ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, রাজকোষে সমগ্র রাজস্বের ষষ্ঠাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত সঞ্চিত হইত।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য উপায়ে কত মুদ্রা মোগল রাজকোষে সঞ্চিত হইত; তাহা অবধারণ করার সুষ্ঠু উপায় নাই। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আকবর শাহ আটত্রিশ প্রকার কর রহিত বা হ্রাস করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব পাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভে অন্তর্ব্বিবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত ও ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি আশি প্রকার কর রহিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ বলেন যে, ভূমির রাজস্ব ব্যতীত অন্য উপায়েও কোটী কোটী মুদ্রা রাজকোষে আনীত হইত। আকবর শাহ যে সকল রাজকর রহিত বা হ্রাস করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহার কতকগুলি পুনঃ স্থাপিত বা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব মোসলমান পণ্যজীবীদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুরা যে পরিমাণ শুল্ক দিত, তাহার অর্দ্ধেক মোসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ভূমির রাজস্ব ব্যতীত নানাপ্রকার হাসিল মাশুল (Tolls), কর (Tax) ও অতিরিক্ত কর (Cess.) হইতে মোগল রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হইত; কিন্তু সাময়িক মোসলমান ইতিহাস লেখকগণ তাহার কোন তালিকা প্রদান করেন নাই। আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপিত করিলে, রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাদশাহ সর্ব্বদা যে সকল মহার্ঘ দ্রব্য উপহার পাইতেন, তাহা হইতেও প্রচুর অর্থ লাভ হইত। মোসলমান লেখকগণ অন্যান্য বিষয়ক রাজস্ব সম্বন্ধে লেখনী

চালনা করেন নাই। কিন্তু আমরা বৈদেশিক পর্য্যাটকগণের নিকট হইতে কিছু তত্ত্ব পাইতে পারি। উইলিয়ম হাকিন্স সাহেব জাহাঙ্গীর পাদশাহের সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন যে জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বকালে ১৬০৯ হইতে ১৬১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক পঞ্চাশ কোটী টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল। ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত অর্থ এই হিসাবে ধৃত হইয়া থাকিলে, তাঁহার উক্তি অত্যধিক অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। বৈদেশিক চিকিৎসক কাক্র বলেন যে, আওরঙ্গজেব অন্যান্য উপায়ে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহা ভূমির রাজস্ব হইতে ন্যূন ছিল না। কেবল মাত্র এক সুরাট হইতেই আওরঙ্গজেব প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা লাভ করিতেন। ডাক্তার জিমিলি কেরারি দক্ষিণাপথে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, মোগলরাজ সমস্ত রাজস্ব বাবদ আশী কোটী টাকা পাইতেন। আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত তালিকায় দেখিয়াছি যে, ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ৩৮৭১১১০০০ টাকা ভূমির রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা এই তিনজন বৈদেশিক পর্য্যাটকের বিবরণে ঐক্য দেখিতেছি। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মতানুসারে ভূমির রাজস্ব যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, মোগল পাদশাহগণ সর্ব্বসাকুল্যে তাহার দ্বিগুণ রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। মোগল রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসাকুল্যে ৩৩১৩৭৭০০০ টাকা রাজস্ব স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তার পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক শতাব্দী পরে উহা ৭৭৪২২২০০০ টাকাতে পরিণত হইয়াছিল।

কাক্র বলেন, ঈদৃশ বিপুল রাজস্ব বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অর্থরাশি চিরকাল রাজকোষে আবদ্ধ থাকিত না। প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ উহার অধিকাংশ বাহির হইয়া পড়িত, ও পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শতমুখে বিস্তৃত হইত। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের

অর্দ্ধাংশ রাজকীয় বদান্যতার উপর নির্ভর করিত। অসংখ্য রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্য রাজদত্ত বেতন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; এবং যে সকল শ্রমজীবী কেবল মাত্র সম্রাটের কার্য্যে পরিশ্রম করিত, তাহারাও রাজকোষ হইতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অর্থ প্রাপ্ত হইত। নগরবাসী অধিকাংশ শিল্পী মোগলের আদেশে কার্য্যে নিরত থাকিত। তাহারাও রাজকোষ হইতে অর্থ শোষণ করিত। মোগল পাদশাহগণ শতমুখে এত প্রচুর ব্যয় করিতেন যে, তাদৃশ বিপুল আয় সত্ত্বেও তাঁহারা অতি:সামান্য সঞ্চয় করিতে পারিতেন। শাহজাহান পাদশাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, এবং তিনি স্বয়ং রাজকোষে অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন। তথাপি তিনি রাজকোষে নগদ ছয় কোটী মুদ্রাও সঞ্চিত করিতে পারেন নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে কেবল-মাত্র তেরলক্ষ টাকা রাজকোষে সঞ্চিত ছিল।

ভারতবাসীর অবস্থা।

বর্ত্তমান কালে কোন রাজার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাঁহার শাসনে প্রকৃতি পুঞ্জের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বিবরণও ঐতি-হাসিকগণ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস লেখকগণ সন্ধি বিগ্রহের কথাতেই আপন আপন গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন; এজন্য প্রাচীন কালে দেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল বহু পরিশ্রমেও তাহার পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। মোগল রাজত্বের ইতিহাস লেখকগণও প্রকৃতিপুঞ্জের কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই, বাদশাহগণের বিবরণ প্রদান করিয়াই স্ব স্ব কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মোগল শাসন কালে প্রজার অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান দুঃসাধ্য নহে। আবুল ফজল আইন-ই আকবরী গ্রন্থে ভারতবাসীর অবস্থার বিবরণ প্রদান

করিয়াছেন। মোগল শাসনকালে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় পর্য্যটক এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেও এদেশের তৎকালীন অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহার অনেক বিবরণ জানা যাইতে পারে।

ভারতবাসীর অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ও সমাজের দশা কিরূপ ছিল, তাহাই প্রথমে আসিয়া পড়ে। মোগল জাতি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আফগান প্রভৃতি জাতির আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অতএব মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পুর্ব্ব হইতেই নূতন রাজার প্রতাপে নূতন সভ্যতার সংঘর্ষণে এদেশে সমাজ-বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। মোগল শাসন প্রণালী আফগান শাসন প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু আফগান শাসন কালে যে সকল কারণে হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সমাজে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, তাহা মোগলের সময়েও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। সুতয়াং আফগানের সংস্পর্শে দেশ মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত আসিয়াছিল, তাহা মোগলের সময়েও অব্যাহত ছিল। তবে আফগানের সময়ে যাহা অর্দ্ধ-মুকুলিত অবস্থায় ছিল; মোগলের সংস্পর্শে তাহাই পূর্ণ বিকশিত হয়। এই যাহা কিছু প্রভেদ। সুতরাং আফগানের শাসনকাল ছাড়িয়া মোগলের সময়ে, দেশের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজের অবস্থা কিদৃশ ছিল, তাহা অঙ্কিত করিলে আংশিক চিত্র মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এ কারণ আফগান ও মোগল, উভয় জাতীয় মোসলমানের সংঘর্ষণে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে হিন্দুর কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহাই মোটের উপর বর্ণিত হইল। মোগল শাসন আফগান শাসন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি

এবং রাজ কার্য্য লাভ সম্বন্ধে উভয় শাসন কাল মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ঘটিয়াছিল। এইজন্য আফগান শাসন কালে এসব বিষয়ে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া মোগলের শাসন গুণে ভারতবাসীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং রাজ কার্য্য লাভ সম্বন্ধে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, কেবল মাত্র তাহারই চিত্র অঙ্কিত করা হইল।

মোসলমানের সংঘর্ষণে কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে তৎপ্রাক্কালে হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বলা আবশ্যক। মোসলমান শাসন কালে ভারতবাসীর পূর্ব্ব গৌরব ও সৌষ্ঠব বিলুপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি শিখা অদৃশ্য হইয়া গেলে অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; মোসলমান শাসনকালে ধর্ম্ম ও জ্ঞান সর্ব্বস্ব ভারতবাসীর তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু দেশে মোসলমানের আধিপত্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুসভ্যতা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরূপ হইবার কারণ-কি? বর্ণভেদ প্রথা নিবন্ধন কালক্রমে শাস্ত্র চর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন এক মাত্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। অলবেরুনী লিখিয়াছেন, "উপাসনা, বেদ পাঠ ও হোম প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল, বৈশ্য অথবা শূদ্রের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেহ এই ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিত, তবে ব্রাহ্মণগণ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, এবং নিয়ম ভঙ্গকারীর জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইত।"

ভারতবর্ষের স্বাধীন যুগের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত। সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ব্রাহ্মণগণ মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক,

কবি, সকলেই একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। যুদ্ধ বিদ্যায় ক্ষত্রিয়গণের একাধিকার ছিল। কি জ্ঞানানুশীলন, কি শস্ত্র চালনা, কিছুর সঙ্গেই জন সাধারণের সম্পর্ক ছিল না। শাস্ত্র চর্চ্চা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অলবেরুণী লিখিয়াছেন যে কোন্ কোন্ বর্ণ মুক্তির অধিকারী, এসম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যজাতির বেদে অধিকার ছিল না, একারণ কাহারও কাহারও মতে কেবল মাত্র তাঁহারাই মুক্তি লাভে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আমরা অলবেরুণীর এই লেখা পাঠে অবগত হই যে, যদিচ পূর্ব্বে বৈশ্যজাতির শাস্ত্রাধিকার ছিল, তথাপি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাহারা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদা শস্ত্র বিদ্যা উপার্জ্জনে নিরত থাকিতেন বলিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের অবসর ছিল না। এইজন্য একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই শাস্ত্র ও জ্ঞানানুশীলন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

যে সকল রত্ন ভোজরাজা অথবা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও বৈশ্য অথবা শূদ্র ছিলেন না। দেশ চলিত ভাষা তখন ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের জন সাধারণ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিল। ক্ষত্রিয়গণ অবসরাভাবে গ্রন্থপাঠে মনোযোগী ছিলেন না। কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণই গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অন্যান্য বর্ণের তুলনায় নগণ্য ছিল। অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকটই সংস্কৃত গ্রন্থগত বিদ্যা অর্গলবদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর ধর্ম্ম ও জ্ঞান সংকীর্ণ খাতে বদ্ধদশায় পতিত হইয়াছিল।

এই সময় লোকে বাহিক আচার অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করে। দেব দ্বিজে ভক্তি, তীর্থ পর্য্যটন,

উপবাস, ব্রত, এই সকলই তখন ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। দেবতার সংখ্যা ও পূজার আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-বাক্য সর্ব্বথা পালনীয় ছিল। ব্রাহ্মণ সাধুই হউন বা পাপনিরতই হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না ; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করার জন্যই তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্মানার্হ ছিলেন। লোকে সাধুতা, সত্য বাদিতা, পরমার্থ পরতা প্রভৃতি গুণনিচয় হইতে বর্জ্জিত হইয়াও কেবল মাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মহিমায় জন সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। বস্তুতঃ, তৎকালীন হিন্দুধর্ম্ম "মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত" করিত না।

সকল প্রকার শাস্ত্রাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রই কঠিন ও সারবান পদার্থ। ইহার আলোচনায় গভীর ধীশক্তি ও মনস্বিতার আবশ্যক। ন্যায় দর্শনের আলোচনায় ব্রাহ্মণগণ চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন ; ভারত-বর্ষের অক্ষয় ভূষণ মহাত্মা শঙ্কর আচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রাচুর্ভূত হন। তাঁহার তিরোভাবের পর আর কোন মৌলিক দার্শনিক ভারত-বর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। কবিবর মাঘ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শিশুপাল বধ কাব্য প্রণয়ন করেন ; নৈষধ প্রণেতা শ্রীহর্ষ, গীত-গোবি-ন্দের গায়ক জয়দেব এবং কথা-সরিত-সাগর রচয়িতা সোমদেব দ্বাদশ শতাব্দীতে বিচরণ করেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী কালে আর কোন উল্লেখ-যোগ্য কবি প্রাচুর্ভূত হইয়া ভাবের তরঙ্গ লীলায় এদেশকে আলোড়িত করেন নাই। যদিচ মিথিলা, নবদ্বীপ ও কাশী প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা হইত, এবং রঘুনাথ, রঘুনন্দন, সায়নাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাশালী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথাপি তৎকালীন পণ্ডিত মণ্ডলী পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষ্কগণের তুলনায় নিষ্প্রভ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের অধঃপতনের সময় হিন্দুর

প্রতিভা কতদূর পরিস্ফুট হইতে পারে, তাঁহারা তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। প্রাচীন জাতি সমূহ মধ্যে হিন্দু জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পর এই দুই বিদ্যারও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। উহা গণনা ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসকগণের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্যের পর আর কোন নামযোগ্য বৈজ্ঞানিক এদেশে প্রাদুর্ভূত হন নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ভাস্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জয়দেবই চির-কুসুম-বিকশিত সংস্কৃত কাব্য-কাননের শেষ কোকিল, এবং সোমদেবের পর আর কোন উপন্যাস রচয়িতা সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে রত্নরাজি সঞ্চিত করেন নাই।

মোসলমানের আগমন কালে কেবল যে, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অধোগতি ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সামাজিক হীনতা নিবন্ধন জনসাধারণের হৃদয় হইতে স্বদেশানুরাগও তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা দেশের ইষ্টানিষ্টে উদাসীন ও বীতস্পৃহ ছিল। এইজন্য মোসলমান অসিহস্তে ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইলে জনসাধারণ জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ এক পদও অগ্রসর হয় নাই। কেবলমাত্র রাজন্য-বর্গই ক্ষাত্র্যধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রতিপালন জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ভারত-বাসীর এইরূপ দুরবস্থার সময় দেশ মধ্যে মোসলমানের আধিপত্য স্থাপিত হয়; তাহাদের প্রখর শাসনে হিন্দুজাতির সঙ্কীর্ণ খাতবদ্ধ ধর্ম্ম ও জ্ঞান শুষ্ক হইয়া পড়ে, এবং সে খাতের কেবলমাত্র কর্দ্দম অবশিষ্ট থাকিয়া ভারতবাসীর কলঙ্কের কারণ হইয়া উঠে।

অলবেরুণী সবক্তগীন ও তদীয় পুত্র মামুদের ভারতাক্রমণোপলক্ষে লিখিয়াছেন, "মামুদ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; যে সকল অদ্ভুত কার্য্যে ভারতবাসী ধূলিকণার ন্যায় দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা মামুদ

কর্ত্তৃকই সংসাধিত হয়। * * * * ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবশিষ্ট ভারতবাসী কাজে কাজেই সকল শ্রেণীর মোসলমানের বিরুদ্ধে বদ্ধমূল ঘৃণা পরিপোষণ করিয়া থাকে। এ কারণেই হিন্দুর বিদ্যা আমাদের বিজিত দেশ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে, এই পর্য্যন্ত আমাদের অনধিগম্য কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়াছে।” প্রাচীনকালে এদেশে গ্রন্থবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল না। গ্রন্থকর্ত্তৃগণ রাজার অর্থ সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হিন্দুর সিংহাসনে মোসলমানের অধিকার সংস্থাপিত হইলে সংস্কৃত বিদ্যা কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়াছিল। হিন্দু রাজগণের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের আশ্রয়প্রাপ্ত পণ্ডিত সমাজেরও অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। পণ্ডিত সমাজের অধঃপতনেই আর্য্যধর্ম্ম বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। বিজয়নগর প্রভৃতি কতিপয় স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে সে সময়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিপালিত হইতে-ছিলেন। কাশী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সার্দ্ধ পঞ্চ শত বৎসরব্যাপী মোসলমান শাসনকালে ব্রাহ্মণকুলে আর তাদৃশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয় নাই। এই সময় মধ্যে কেবলমাত্র কতিপয় টীকাকার সংগ্রহকার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন, ইঁহারাই এ যুগের অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মোসলমান যুগে জয়পুরাধিপতি জয়সিংহের আবির্ভাব হইয়াছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এযুগে একমাত্র তিনিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন করিয়া ভারতভূমির বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষে মোসলমান শাসন বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের অখণ্ড প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ ছিল না।

তাঁহারাই সমাজের নেতা ছিলেন। তাঁহারা কখনও কাহারও অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হন নাই। মোসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মণ জাতির দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতেই তাঁহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাহাদিগকে দেশাধিপতি বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য হন। দেশের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ আর তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন না অথবা দেশাধিপতিগণ রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহাদিগের মন্ত্রণাপ্রার্থী হইতেন না। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাঁহাদের অখণ্ড প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মোসলমানের আগমনে তাঁহাদের এই প্রাধান্য অকস্মাৎ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তাঁহারা রাজসাহায্যে বিদ্যালোচনায় উৎসাহিত হইতেন। যে সকল রাজসিংহাসন হইতে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর অজস্রধারে প্রীতি ও ভক্তি বর্ষিত হইত, তাহা অতঃপর যাঁহাদের পদতলে পতিত হয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে কুসংস্কারাপন্ন অপধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। এইজন্য যে সকল ব্রাহ্মণের সামর্থ্য ছিল, তাঁহারা কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি দূর স্থানে পলায়ন করেন।

কাশী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের অধিকাংশই এই সময় হইতেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। মোসলমানের নিকট কি ব্রাহ্মণ, কি নীচ শূদ্র, সকলেই কাফের বলিয়া সমভাবে ঘৃণার পাত্র ছিল। নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববৎ সম্মান পাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব মানসিক বল, উদ্ভাবন ক্ষমতা, স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনা শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। মোসলমান আগমনে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব ব্যব-

সায় লিপ্ত ছিল। এমন কি, ক্ষত্রিয়গণও মোসলমানের অধীনে সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রাজদরবারে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, এজন্য তাঁহাদের অবলম্বিত বৃত্তির পুরস্কার ও গৌরব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল এই অবহেলায় তাঁহারা আপনাদিগকে অপমানিত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার ফলে ব্রাহ্মণকুল উদাসীন ও বৈরাগ্য-প্রবণ হইয়া উঠেন এবং দেব দেবী সম্বন্ধে অন্তঃসার শূন্য গল্প প্রণয়ন করিয়া কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য ছিল। বৈশ্য ও শূদ্রের আনুকূল্যেই তাঁহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশীল ও জ্ঞানবন্ধু হিন্দু রাজন্যবর্গের আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে হইত। ধর্ম্মের কুসংস্কার বিদ্ধ অংশই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ ছিল। তাহাদের সন্তোষ উৎপাদন করাই ব্রাহ্মণ জাতির প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য দেশ হইতে ক্রমশঃ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু কুসংস্কার ও সহজ বিশ্বাস দেশ মধ্যে পূর্ব্ববৎ প্রবল ছিল; উহার প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং যে সকল কারণ পরম্পরায় হিন্দুর প্রজ্ঞা উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। আমাদের মত সমর্থনার্থ জ্যোতিষশাস্ত্রের দুর্দ্দশার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথা কথিত জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞগণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের অভিনব রহস্য উদ্ঘাটনে আর ব্যাপৃত থাকিতেন না। তৎপরিবর্ত্তে বার বেলা, বার দোষ এবং শুভদিন নির্ণয়ে ও কোন তিথিতে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ তাহার মীমাংসাতেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত। ফলতঃ হিন্দুর যাহা কিছু মহৎ, তাহার তিরোভাব হইয়া তৎস্থলে

যাহা কিছু তমসাচ্ছন্ন তাহাই বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে মোসলমান রাজত্বের শেষভাগে বেদবিষয়িণী প্রজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল ; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য পড়িবার লোকাভাব ঘটিয়াছিল, কাব্যরসাস্বাদনের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। কেবলমাত্র ক্রিয়াকর্ম্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াই ব্রাহ্মণগণ সমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। এই সময়ের পণ্ডিত সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে একজন সূক্ষ্মদর্শী ইংরেজ লিখিয়াছেন, "The number of learned is not only diminished, but the circle of learning, even among those who still devote themselves to it appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, aud no branch of learning cultivated but what is connected with the peculiar doctrines of the people."

মোসলমান শাসনকালে একদিকে যেমন উপধর্ম্ম সমাজ মধ্যে বদ্ধমূল, এবং হিন্দুর প্রজ্ঞা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে তদ্রূপ উদার ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াও তাপক্লিষ্ট ভারতবাসীর শ্রান্তি দূর করিবার জন্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সবিশেষ গুণী হইলেও তাহার জাতি ও কুল তদীয় উন্নতির বাধাদায়ক হইত। কিন্তু মোসলমান মাত্রেই সমান। অতি নীচ মোসলমানও কোরাণ পাঠ ও মসজিদে উপাসনার অধিকারী। রাজত্ব ও দাসত্বের মধ্যে কেবলমাত্র গুণের ব্যবধান। অনেক ক্রীতদাস কেবল মাত্র বুদ্ধি ও শৌর্য্যবলে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। এসলাম ধর্ম্মের এই সাম্য ভাবের প্রভাব হিন্দুসমাজে কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কতিপয় ধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমুজ্জ্বল

রশ্মিসম্পাতে দেশের মুখশ্রী প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। রামানন্দ, কবির, নানক ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মনে মোসলমান ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ও বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। রামানন্দ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইতে শিষ্য গ্রহণ করিতেন। কবির জাতিতে জোলা ছিলেন। কবির, নানক ও চৈতন্য সকলেই মোসলমানদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতেন। ইঁহারা এসলাম ধর্ম্মের প্রভাবে কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উদার ধর্ম্মের প্রচার প্রভাবে জনসাধারণের ব্যবহৃত দেশচলিত ভাষা সমূহের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। কবির ও চৈতন্যের উপদেশমালা দেশচলিত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছিল। তাঁহারা জনসাধারণের নিকট তাহাদের ব্যবহৃত ভাষায় ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারা দেশ মধ্যে যে প্রেম ধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার সিঞ্চনে দেশ-চলিত ভাষা সমূহও শ্যামলশ্রীধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ-চলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির অখণ্ড প্রতাপের দুর্গম দুর্গে প্রবল আঘাত করেন। সে আঘাতে সংস্কৃত ভাষা মৃত্যুদশায় উপস্থিত হয়। এ যাবৎ গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত। অভিনব ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়ে পণ্ডিতগণ দেশচলিত ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহ জনসাধারণের বোধগম্য ছিল না। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এ সকল গ্রন্থ রচিতও হইত না। দেশ চলিত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিত হইলে নিরক্ষর লোকের নিকট পাঠ করিলে সেও তাহা বুঝিতে পারে। এজন্যই গ্রন্থকারগণ দেশ চলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ মোসলমান শাসনের সময়েই হিন্দী, বাঙ্গলা, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রি প্রভৃতি দেশ-চলিত ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

কতিপয় ব্রাহ্মণের যত্নেই সংস্কৃত ভাষা জীবিত ছিল। দেশ-চলিত ভাষার প্রভাবে কালক্রমে ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। কিন্তু মোসলমান বিজয়ের ফলে দুই কারণে সংস্কৃত ভাষার বিলোপ ও দেশ-চলিত ভাষার পরিপুষ্টি দ্রুতগতিতে সাধিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, মোসলমান শাসনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির গৌরব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ইহাঁদের গৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হওয়াতে গৌণ ভাবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ দেশমধ্যে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ মোসলমানের সংস্পর্শে হিন্দুগণ বর্ণ বৈষম্য এবং ব্রাহ্মণ জাতির বংশানুক্রমিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঈদৃশ মতের প্রভাবে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ও বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কবির, বঙ্গদেশে চৈতন্য, মহারাষ্ট্রদেশে একনাথ এবং পঞ্জাবে নানক বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময়েই অমানিশার অন্ধকার তুল্য জনসাধারণের হৃদয়কন্দর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবার উগ্র বাসনা দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মনে উত্থিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের রত্নরাজি এতদিন সংস্কৃতভাষার লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ থাকিয়া জনসাধারণের অপ্রাপ্য ছিল। এই সময় এই দুই মহাগ্রন্থ প্রধান প্রধান দেশ চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই সময়ের অমর কবিগণ সকলেই দেশ-চলিত ভাষায় কাব্যমালা গ্রথিত করিয়া জনসাধারণের কণ্ঠে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কেহই বর্ণ-বৈষম্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই উদারভাব কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সাহিত্যেই আবদ্ধ ছিল। আকবর রাজকার্য্যে পারস্য ভাষা প্রবর্ত্তিত করাতে তৎসময় হইতে হিন্দুগণ বহুল পরিমাণে উহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দেশ-

চলিত ভাষা সমূহের সঙ্গে পারস্থ ভাষার সৌসাদৃশ্য ছিল। দেশ-চলিত ভাষা সমূহের ন্যায় উহাতেও কোন গভীর বিদ্যার আলোচনা হইত না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিচর্য্যাতেই যে দেশ-চলিত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে দেশ চলিত ভাষায় রাজপুতনার চারণগণের হিন্দী গাথা ভিন্ন আর কিছুই রচিত হইয়াছিল না, এবং প্রথম যুগের অধিকাংশ গ্রন্থকারই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কবির ব্যতীত আরও দুইজন অমর কবির আবির্ভাব হইয়াছিল; তাঁহারা উভয়েই বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। ইঁহাদের নাম তুলসীদাস ও সুরদাস। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল কলকণ্ঠ গায়ক বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কৃষ্ণপ্রেমে উৎসৃষ্টপ্রাণ ছিলেন। এই গায়ক কুল মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল না। তুকারাম ও শ্রীধরই সে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারা উভয়েই বৈষ্ণব ধর্ম্মানুগত ছিলেন।

মোগল পাদশাহগণ প্রজাহিতৈষী শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সুশাসন সহজসাধ্য ছিল না। শাসন সৌকার্য্যার্থ সমগ্র দেশ নানা সুবায় বিভক্ত ছিল। সুবার শাসনকর্ত্তৃগণ সুবিধা দেখিলেই স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী হইয়া উঠিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সুবায় স্বাধীনতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণের আধিপত্য বদ্ধমূল ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ, জাটগণ, শিখগণ এবং ইউরোপীয় বণিকগণ সকলেই স্বাধীনতা প্রয়াসী ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহমান ছিল বলিয়া শাসন কার্য্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিত।

আমরা ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারি যে, প্রকৃতিপুঞ্জকে দস্যু ও তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত ছিল না। অনেক সময় অত্যাচারী রাজপুরুষগণ প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেন। পদচ্যুত সৈন্য, ব্যবসায়ী দস্যু ও রাজদ্রোহিগণে দেশ পরিপূর্ণ ছিল। দুর্ব্বলের অপহরণ করাই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। লোক পীড়া অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তৎসম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের অভাব ছিল বলিয়াই আমরা অনুমান করি। সিগ্ণরমানুসির প্রদত্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মোগল শাসনকালে অপক্ষপাতে ন্যায়বিচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। বিচারপ্রণালী সরল ও সহজ ছিল; কোন অভিযোগের মীমাংসায় অতিরিক্ত কাল ক্ষেপণ করা হইত না। পল্লীগ্রামে পঞ্চায়তি প্রথায় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইহাতে সুফল, কুফল, উভয়ই ফলিত। আইনের দোষে অনেক সময়ে সুশাসনের পথে কণ্টক পড়িত। আইনের ব্যবস্থাগুণে হত্যা অপেক্ষা মদ্যপান অধিক দূষণীয় ছিল। মোসলমান আইনে অপরাধের তিন শ্রেণী ছিল। (১) প্রথম শ্রেণীতে শরীর সম্বন্ধীয় অপরাধ, নরহত্যা এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর অপরাধীকে ফরিয়াদী ইচ্ছা করিলে অর্থ গ্রহণ করিয়া মুক্তি দিতে পারিত। (২) মদ্যপান, ব্যভিচার ও অপহরণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। প্রথম দুইটি অপরাধ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে আপোসের নিয়ম ছিল না। (৩) তৃতীয় শ্রেণীতে অবশিষ্ট নানা প্রকার অপরাধ স্থান পাইয়াছিল। গর্দ্দভের পৃষ্ঠে পশ্চাৎ দিকে মুখ দিয়া বসিলে আরোহীর যে অপরাধ হইত, তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। কেহ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে, সে কার্য্য তাহার ইচ্ছাকৃত কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত

করা হইত না, কিন্তু কি প্রকার অস্ত্র দ্বারা হত্যা-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অপরাধের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হইত। মোগল আমলে দিল্লীশ্বরগণ খাল খনন ও রাজ পথ নির্ম্মাণ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। মোগল শাসনকালে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডটি প্রস্তত হইয়াছিল বলিয়া দেশে জনশ্রুতি রহিয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে মোগল কৃত রাজপথ ও সেতুর ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। বের্ণিয়ার সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কৃষি ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাজমহল হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য কৃত্রিম খাল এবং খালের ধারে জনাকীর্ণ নগর ও পল্লী এবং শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল।* রাজস্ব সম্বন্ধে মহানুভব আকবর প্রজার হিতজনক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজত্বকালে ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত। আকবর তৃতীয়াংশ কর স্বরূপ লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। অতএব আকবরের আমলে করের হার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে উৎপীড়নের মূল নানারূপ বাজে কর ও শুল্ক তুলিয়া দিয়া প্রজার হিতসাধন করা হয়। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালেও রাজস্ব সম্বন্ধে আকবরপ্রচলিত প্রথাই স্থির-তর ছিল। আওরঙ্গজেব পাদশাহের রাজত্বকাল হইতে নানারূপ বাজে জমা অবধারিত হইয়া প্রজাপীড়নের সূত্রপাত হইয়াছিল। মোগল শাস-নের নানারূপ ত্রুটী সত্ত্বেও ভারতবাসিগণ শস্যশ্যামল ভারতবর্ষে চাষ অথবা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া এক প্রকার সুখেই কাল কর্ত্তন করিত। বিশেষতঃ, শাহজাহানের শাসনকালে প্রকৃতিপুঞ্জের ভাগ্যে অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

---

* পাদশাহ নামা পাঠে জানা যায় যে, শাহজাহান পাদশাহের আমলে কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য রাভিনদ হইতে খাল কাটা হইয়াছিল, এবং এই খাল কাটার কার্য্য পরি-দর্শন জন্য স্বয়ং পাদশাহ লাহোরে গমন করিয়াছিলেন।

মোগল শাসনকালে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা কীদৃশ ছিল? মোটের উপর তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই আমরা অনুমান করি। আমরা এস্থানে আকবরের রাজত্বকালে শ্রমজীবিগণের দৈনিক বেতনের হিসাব প্রদান করিলাম।

সূত্রধর	৵৯$\frac{৩}{৫}$ পাই—	৯$\frac{৩}{৫}$ পাই।
রাজমিস্ত্রী	/৪$\frac{৪}{৫}$ „ —	/২$\frac{২}{৫}$ পাই।
বাঁশ ফোঁড়	৯$\frac{৩}{৫}$ „ —	
ঘরামি	/২$\frac{২}{৫}$ „ —	
ভিস্তি	/২$\frac{২}{৫}$ „ —	৯$\frac{৩}{৫}$ পাই।

আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে ঐসময়ের প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীর মণকরা মূল্যের গড় উদ্ধৃত করিয়াদিলাম।

গম	। ৯$\frac{৩}{৫}$ পাই	মুগের দাইল	।৵২$\frac{২}{৫}$ পাই
যব	৶২$\frac{২}{৫}$ „	ঘৃত	২।৵
ভূট্টা	৵৪$\frac{৪}{৫}$ „	তৈল	২৲
সুটী চাউল	॥০	গুড়	১।৵৪ পাই
জিরা (সরু) চাউল	১৲	হরিদ্রা	।০
দুগ্ধ	॥৵০	সিলাহাতি কাপড় প্রতি গজ	/০
পেঁয়াজ	৵৪$\frac{৪}{৫}$ পাই	কম্বল প্রতিখানা (নিকৃষ্ট)	।০
মটরের দাইল	। ৯$\frac{৩}{৫}$ পাই		
গমের ময়দা (নিকৃষ্ট)	।৵		

একজন ময়দা ভোজী পূর্ণ বয়স্ক শ্রমজীবির সাধারণতঃ যে পরিমাণ মাসিক আহার সামগ্রীর আবশ্যক, তাহার একটি হিসাব আমরা এস্থানে প্রদান করিলাম।

জিনিসের নাম		আকবরের সময়ের মূল্য
ময়দা	॥ ৫	৶৯ পাই
দাইল	/৫	৭ ১/২ ,,
ঘৃত	/১	/ ১/২ ,,
লবন	/১	২ ৪/৫ ,,
		।/৭ ৪/৫ পাই

মশলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া আকবরের সময়ে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি মাসিক ছয় আনা ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। যে পরিবারের জন সংখ্যা পাঁচজনের (নিজে, স্ত্রী ও তিন সন্তান) অধিক ছিল না, তাহার ভরণপোষণের জন্য মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র খরচ পড়িত। এরূপ পরিবারের একজন মাত্র উপার্জ্জনকারী থাকিলেও কষ্টের কোন কারণ হইত না। কারণ একজন সামান্য শ্রমজীবির (যথা, ভিস্তি) মাসিক আয়ও ১৸৵০ আনার ন্যূন ছিল না। অতএব সে ব্যক্তি আহার সামগ্রীর মূল্য বাদে কাপড় ও অন্যান্য সাংসারিক খরচ জন্য প্রতিমাসে দশ আনা করিয়া সঞ্চয় করিতে পারিত। তৎকালে দ্রব্যাদি যেরূপ সুলভ ছিল, তাহাতে একজন শ্রমজীবির পক্ষে মাসিক দশ আনা সঞ্চয়ই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মোগল শাসন সময়ে ভারতীয় শিল্পীকুলের উন্নতির মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইয়াছিল। মোগলের সংস্পর্শে হিন্দুগণ বিলাসপটু হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই সময়ে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যবন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই দুই কারণে শিল্পীকুলের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাস্কো ডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। ইহা ভারত

ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা। এই ঘটনা হইতে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য শতমুখে প্রবাহিত হইয়া শিল্পীকুলকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে মসলিন ও কালিকো (১) প্রস্তুত হইত; তন্মধ্যে বঙ্গদেশে এবং করমণ্ডল উপকূলের উত্তরাংশেই বস্ত্র শিল্পের সমধিক প্রসার ছিল। ঢাকা সুচিক্কণ মসলিন বস্ত্র প্রস্তুতের প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তরসরকার এবং মসলিপত্তনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ ছিটের কাপড়, কালিকো এবং কিংখাপের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কার্পাস, পশমী ও রেশমী বস্ত্র বয়নে যে সকল শিল্পী নিরত থাকিত, তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। মোগলের অধীনে ইউরোপের বস্ত্র বাণিজ্যের পথ সুপ্রশস্ত হওয়াতে ইহাদের সমৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন মোসলমান ইতিহাসলেখক প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতার এবং তাহাদের রমণিগণের স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কারের মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক শ্রমজীবির উত্তম শয্যা ও সুদৃশ্য উদ্যান ছিল!

সিবাষ্টিন মণিরক নামক একজন পর্য্যাটক ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারি। এই সময় বঙ্গদেশ জাত উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্র বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। তিনি বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে বহু জনাকীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহার জন সংখ্যা দুই লক্ষাধিক ছিল এবং পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় লোক তথায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে উপনীত হইত। তিনি লাহোর হইতে মুলতানে গমন করেন; এই পথের উভয় পার্শ্বস্থ সমগ্র-

(1) Stuff made of Cotton, first manufactured at Calicut.

দেশ অমিত ধন ধান্য পূর্ণ এবং নয়নাভিরাম শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র-শোভিত ছিল। পথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক গণ্ডগ্রাম বিদ্যমান ছিল, এই সকল গণ্ডগ্রামে বহু উৎকৃষ্ট পান্থনিবাস মণিরকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তিনি সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ঠাটনগরে একমাস কাল অবস্থান করেন। এই নগর সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে, উহা তৎকালে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং উহার চতুঃপার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে গোধূম, ধান্য ও কার্পাস জন্মিত। কার্পাস বস্ত্র বয়নে অন্ততঃ দুই সহস্র তাঁত নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ব্যতীত রেশমী বস্ত্র এবং রেশমী ফুল ও উৎকৃষ্ট চর্ম্ম প্রস্তুত হইত।

মন্দিস-লো নামক একজন জর্ম্মাণ ভ্রমণকারী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময় বরোচ নগর জনাকীর্ণ ছিল; ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই তন্তুব্যবসায়ী ছিল এবং তাহারা গুজরাট প্রদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিত। তিনি বরোচ হইতে আমেদাবাদ গমন করিবার সময় পথিমধ্যে ব্রোদারা নামক আর একটি তন্তুবায় ও চিত্রকর পূর্ণ নগরীতে উপনীত হন। তিনি আমেদাবাদের বৈভব ও সৌষ্ঠব দেখিয়া চমৎকৃত হন। এই নগরের অধিকাংশ শিল্পীই কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। জর্ম্মাণ-পর্য্যটক কাম্বেকে প্রসিদ্ধ সুরাট নগর অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তথায় বিপুল বাণিজ্য-স্রোত প্রবাহিত ছিল। মোগলের রাজধানী লোক-বিশ্রুত আগ্রানগরী আয়তনে ইস্পাহান অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। সমস্ত নগরী সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত রাজপথমালায় পরিশোভিত ছিল। পণ্যবীথিকা সমূহের দ্রব্যভাণ্ড দর্শকগণের সমক্ষে পরিদৃশ্যমান রাখিবার জন্য কোন কোন সুপ্রশস্ত রাজ পথ পার্শ্বে খিলান নির্ম্মিত ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত বের্ণিয়ার সাহেব কিয়ৎকালের

জন্য এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাকালে আপনার লেখনি সঙ্কুচিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও এক-স্থানে ভারতবর্ষকে অতলস্পর্শ গহ্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমগ্র ইউরোপের স্বর্ণ রৌপ্যরাশি বাণিজ্য-স্রোতে বহমান হইয়া এই গহ্বরে পতিত হইতেছে। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, ওমরাহগণের, এমন কি, সামান্য সৈনিক পুরুষগণের পরিচ্ছদের শোভা বর্দ্ধন জন্য বহুমূল্য রত্ন ব্যবহৃত হইত, দরিদ্র লোকের স্ত্রী-কন্যাও স্বর্ণ. রৌপ্যের অলঙ্কার আচরণ করিত। বের্ণিয়ারের আগমনকালে এদেশের শিল্প ব্যবসায়িগণ শাল, গালিচা, রেশম ও তুলার কাপড় এবং জরী, স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত।

বিদেশজাত যে সকল দ্রব্য বিক্রয় জন্য ভারতবর্ষে আমদানি হইত, বের্ণিয়ার সাহেব তাহার এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

দেশের নাম,	দ্রব্যের নাম,
ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ	সীসক।
ফরাসী দেশ	কাপড়।
তাতার, আরব্য ও পারস্য দেশ	অশ্ব।
বুখারা ও অন্যান্য স্থান	আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, আরকোট, আপেল প্রভৃতি।
মালদ্বীপ	কড়ি।
মিশর দেশ	গণ্ডারের শৃঙ্গ, হস্তীদন্ত ও ক্রীতদাস।
চীনদেশ	মৃগনাভি, কস্তুরি ও কাচের বাসন।
সিংহলদ্বীপ	হস্তী, নানারূপ মশল্লা ও মুক্তা।

বের্ণিয়ার সাহেব ভারতবর্ষকে ফল-শস্য-পূর্ণ বহুজনাকীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশকে মিশর দেশ অপেক্ষাও উর্ব্বর বলিয়া

লিখিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ধান্য প্রভৃতি আহার্য্য শস্য ব্যতীত রেশম, তুলা, নীল ও চিনি প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং ভারতবাসিগণের বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইত না বলিয়া, দেশের অর্থ দেশেই থাকিত। বের্ণিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন যে, বঙ্গ দেশের উৎপন্ন ধান্য দ্বারা স্বদেশের আহারের সংস্থান হইয়া অন্যান্য দেশের পোষণের কার্য্যও নির্ব্বাহিত হইত এবং সর্ব্বত্রই মৎস্য মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

মোসলমান রাজত্বকালে কি শাসন, কি সৈনিক, উভয় বিভাগেই হিন্দুগণ বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার লাভ করিতেন। তাঁহারা সেনাপতি, শাসন-কর্ত্তা ও মন্ত্রির পদে নিয়োজিত হইতেন। গোলকুণ্ডার চতুর্থ নরপতি ইব্রাহিম, সোমদেব নামক একজন হিন্দুকে প্রধান অমাত্যের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ আদিলের রাজত্বকালে হেমচন্দ্র (হিমু) নামক দিল্লীর একজন দোকানদার ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া রাজকার্য্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন।

ফরকশিয়র, রফি-উদ-দরজারত, রফিদ্দৌলা ও মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে রতনচাঁদ নামক একজন দোকানদার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় উজীরের সহকারী পদ লাভ করিয়াছিলেন, সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল। রাজা অজিত সিংহ এবং তাঁহার যত্নেই আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পুনঃ প্রবর্ত্তিত ঘৃণ্য জিজিয়াকর রহিত হইয়াছিল। সায়ের উল মুতক্ষরিন লেখক লিখিয়াছেন, "এমন কি, ধর্ম্ম ও বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্যেও তিনি এরূপ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন যে, তাহাতে তৎসম্পর্কীয় রাজকর্ম্মচারিগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতা হীন হইয়াছিল; এই হিন্দুর সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন নগরের কাজির পদও লাভ করিতে পারিত না।"

বঙ্গদেশের সুবাদার সুজা খাঁর আমলে রাজা আলম চাঁদ ও জগৎশেঠ রাজকার্য্যে অতুল প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এমনকি, তিনি মৃত্যুকালে পুত্র সরফরাজখাঁকে এই দুইজন হিন্দুর মন্ত্রণামত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃপদ অধিকার করিয়া রাজা জানকীরামকে প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন খাঁ লিখিয়াছেন যে, জানকীরাম প্রতিভাশালী রাজকর্ম্মচারী এবং সুবাদারের অন্তরঙ্গগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ ছিলেন।

মহারাজ মোহনলাল সিরাজদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্ল্লভরাম ও রামনারায়ণ বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আইন-ই আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল আকবরের সময়ের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকায় নিম্নলিখিত হিন্দু কর্ম্মচারিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঁচহাজারী সেনাপতি।

১। রাজা বিহারীমল।

২। রাজা ভগবান দাস।

৩। রাজা মানসিংহ। রাজা মানসিংহ কিয়ৎকালের জন্য বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। আকবর অবশেষে তাঁহাকে সাত হাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করেন। তাঁহাকে এই পদ প্রদান করিবার পূর্ব্বে রাজকুমার এবং রাজার অন্তরঙ্গ কুটুম্বগণ ব্যতীত আর কেহ কখনও পাঁচ হাজারের অতিরিক্ত সেনার নায়কত্ব প্রাপ্ত হন নাই। অতএব আকবর তাঁহাকে সাতহাজারী সেনাপতি করিয়া সমস্ত মোসলমান কর্ম্মচারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

চার হাজারী সেনাপতি।

৪। রাজা তোডরমল। তোডরমল রাজস্ব-নীতি বিশারদ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই আকবর অভিনব রাজস্ব বিধান প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন। তোডরমলের যত্নেই পারসীর পরিবর্ত্তে হিন্দীভাষায় বিচার কার্য্য সম্পাদন করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

৫। রায় রায়সিংহ। জাহাঙ্গীর পাদশাহ ইঁহাকে পাঁচ হাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

আড়াই হাজারী সেনাপতি।

৬। জগন্নাথ।

দুই হাজারী সেনাপতি।

৭। রাজা বীরবল। ইনি আকবর পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র ও চির সহচর ছিলেন। তিনি ইঁহাকে রায় কবি উপাধি প্রদান করেন।

৮। রাজা রামচন্দ্র বগলা। ৯। রায় কল্যাণমল। ১০। রায় সুরজন।

দেড় হাজারী সেনাপতি।

১১। রায় দুর্গা। ১২। মধুসিংহ।

সাড়ে বারশতী সেনাপতি।

১৩। রায় সল দুর তরি (?)।

এক হাজারী সেনাপতি।

১৪। রূপসি (সিংহ ?) বৈরাগী। ১৫। অযোধ্যাসিংহ। ১৬। জগমল। ১৭। জগৎ সিংহ। ১৮। রাজা রাজসিংহ। ১৯। রায় ভোজ।

সাত শতী সেনাপতি।

২০। রায় তুপার দাস। ২১। মেদিনী রায়। ২২। বাবু।

পাঁচ শতী সেনাপতি।

২৩। পরমানন্দ। ২৪। জগমল। ২৫। রাওলভীম। ২৬। রামদাস। ২৭। দুর্জ্জন সিংহ। ২৮। শিওল সিংহ। ২৯। রাম-চাঁদ। ৩০। রাজা মুকুটমল। ৩১। রাজা রাম চাঁদ। ৩২। রাম চাঁদ। ৩৩। দুলপত।

চার শতী সেনাপতি।

৩৪। সুখৎ সিংহ। ৩৫। রায় মনোহর। ৩৬। রামচাঁদ। ৩৭। বঙ্ক।

সাড়ে তিন শতী সেনাপতি।

৩৮। তুলসীদাস। ৩৯। কৃষ্ণদাস। ৪০। মানসিংহ। ৪১। বিল-বিধর। ৪২। কিষদাস। ৪৩। নীলকণ্ঠ।

আড়াই শতী সেনাপতি।

৪৪। রায় রামদাস দেওয়ান।

দুই শতী সেনাপতি।

মোট ৮ জন।

আকবরের সময়ে মোট ৪১৫ জন সেনাপতি ছিলেন। অতএব হিন্দু সেনাপতির সংখ্যা শতকরা তেরজন ছিল। ইঁহারা সকলেই দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তোডরমল রাজস্ব মন্ত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হই-তেন। একমাত্র রাজকুমারগণের জন্যই যে সকল পদ চিহ্নিত ছিল, তাহাও রাজা মানসিংহকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

মোগল পাদশাহগণ হিন্দু রাজকন্যাদিগকে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করিতেন। কোন কোন মোগল পাদশাহ হিন্দু রাজমহিষীর গর্ব্ভজাত ছিলেন। আকবর হিন্দু মহিষীগণের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করিতেন বলিয়া আইন-ই আকবরীগ্রন্থে উল্লেখ আছে। আকবরের দুইজন মহিষী হিন্দু

ছিলেন। তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর হিন্দুমহিষীর গর্ব্ভজাত ছিলেন। জাহাঙ্গীর পাদশাহের মহিষীর সংখ্যা দশজন ছিল; তন্মধ্যে অন্যূন ছয় জন হিন্দুকুলজাত ছিলেন। তদীয় পুত্র শাহজাহান হিন্দুমহিষীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ধমণীতে মোসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর রক্তই অধিক প্রবাহমান ছিল।

ভারতবর্ষীয় মোসলমানগণ ক্রমশঃ হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এস্‌লামধর্ম্মের প্রচারে ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শাহজাহানের রাজ্যচ্যুতি পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবরবি মধ্যাহ্ন আকাশে সমুদিত ছিল। আকবর এবং তদীয় প্রধান পারিষদদ্বয় (ফৈজী ও আবুল ফজল) বহুল পরিমাণে হিন্দু রাজপুরুষগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু মহিষীদের এতদূর প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, তিনি পেঁয়াজ, রসুন ও শ্মশ্রু পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর ন্যায় থাকিতেন। বদায়ুনি লিখিয়াছেন যে, আকবর হিন্দু জনসাধারণের সন্তোষ বিধান জন্য রাজদরবারে পরিবর্ত্তিত আকারে হিন্দুর আচার ব্যবহার প্রচলিত করেন। তোডরমল বীরবল, মানসিংহ এবং হিন্দু ভাবাপন্ন ফৈজী এবং আবুল ফজলই আকবরের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টাতেই মোগল সাম্রাজ্য উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুজাতি সম্বন্ধে আকবরের উদার নীতি, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান পাদশাহের রাজত্বকালেও অব্যাহত ছিল। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে আকবরের পন্থাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিন্দু ও এস্‌লাম ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া একখণ্ড পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় পঞ্চাশখানি উপনিষদ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আলমগীর নামার লেখক একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, দারা রাজ

পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে এস্‌লাম ধর্ম্মের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত। আওরঙ্গজেব গোঁড়া মোসলমান ছিলেন। তাঁহার হিন্দু বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতএব তাঁহারা সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া যে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হিন্দুপ্রীতি ও হিন্দু বিদ্বেষের বিবাদরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই বিবাদে হিন্দু বিদ্বেষেরই জয়লাভ হইয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের অভাবের পরেই হিন্দু-প্রীতি-মূলক শাসন প্রণালীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যদিচ আওরঙ্গজেব হিন্দুর প্রতি একান্ত বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজা জয়সিংহ ও মহারাজ যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিগণ দায়িত্বপূর্ণ বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। মোগল শাসনকালে হিন্দুর রাজকার্য্যে উচ্চাধিকার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফলতঃ সিগণর মানুসী স্বচক্ষে মোগলের সূক্ষ্ম ও বহুদূর বিচারী শাসন প্রণালী দেখিয়া যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "They (the institutions of the Moghul Empire) have not been represented as free from defect, but exhibiting, rather a state in which barbarism is so qualified by the equity which pervades the administration as to render the Government of the Moghul Empire little inferior to that of any other nation.

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

আবুল ফজল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেখ মবারক নামক একজন মৌলবী আগ্রানগরীতে বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরবের অধিবাসী ছিলেন। মবারকের পিতা অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত নাগ্‌রে আগমন করেন। মবারক রাজপুতানা পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তিনি এসলাম শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন; এসলাম শাস্ত্রের কোন অংশই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি যেমন চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিত, তাঁহার প্রতিভাও সেইরূপ সর্ব্বদর্শিনী ছিল; একারণ তাঁহার ধর্ম্মমত সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয় নাই।

মবারকের একাধিক পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ফৈজী, ফৈজী পিতার সমস্তগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনিও বিবিধ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠাগারে প্রায় সার্দ্ধ চারি সহস্র হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ছিল। ফৈজী কবিত্ব-শক্তিশালী ছিলেন। আমীর খুসরু ভারতীয় মোসলমান কবিকুলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নীচেই ফৈজীর আসন-নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আকবর শাহ তাঁহার নানাভাব অলঙ্কৃত কাব্যরাজিপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন। পিতার ন্যায় তাঁহারও ধর্ম্মমত অতিশয় উদার ছিল।

শেখ ফৈজী ঈদৃশ নানাগুণের অধিকারী হইয়াও মোসলমান সমাজে অনাদৃত ছিলেন। তদীয় উদার ধর্ম্মমতই তাঁহার প্রতিপত্তিলাভের অন্তরায় ছিল। একবার তিনি একখণ্ড ভূমির জন্য আবেদনপত্র হস্তে মোগলদরবারে উপনীত হয়েন। কাদির অর্থাৎ আবেদন-পাঠক এক-জন গোঁড়া মোসলমান ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী ফৈজীর এই আবেদনপত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে নানাভাবে নিগৃহীত করিয়া দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই সময় ফৈজী চিতোরে বাস করিতেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আকবর শাহ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। ফৈজীর শত্রুকুল এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া আনন্দে অধীর হন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এসলাম ধর্ম্মবিরোধী মত পরিপোষণ জন্য শাস্তি দিবার অভিপ্রায়েই পাদশাহ তাঁহাকে অহ্বান করিয়াছেন। তিনি যাহাতে অব্যাহতিলাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা তজ্জন্য আগ্রার শাসন-কর্ত্তাকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। ফৈজী বন্দী-ভাবে পাদশাহের নিকট নীত হয়েন। তদীয় শত্রুকুল যাহা ভাবিয়া ছিলেন, কার্য্যকালে তাহার বিপরীত ঘটে। আকবর তাঁহার সুমধুর কাব্যপাঠে সন্তোষলাভ করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে প্রীতচিত্তেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফৈজী রাজদরবারে পরম সমাদরে গৃহীত হন। ইহার পর অচিরে পাদশাহের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। ফৈজী রাজানুগ্রহলাভ করিয়া মোগল দরবারে সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন।

ফৈজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম আবুল ফজল। আবুল ফজল ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবুল ফজলও পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান

সুগভীর ও বিচারশক্তি সুতীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার নানা বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি সর্ব্ব সাধারণের নিকট আল্লামী উপাধিলাভ করেন। (১)

ফৈজী আকবর শাহের দরবারে সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এজন্য তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল ফজল সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই পাদশাহের নিকট পরিচিত হন। গুণগ্রাহী আকবর অচিরে তাঁহার গুণাবলীর সমাদর করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার উপর অবিরত ধারে রাজানুগ্রহ বর্ষিত হইতে থাকে। আবুল ফজল রাজানুগ্রহে ক্রমে ক্রমে সাতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। অবশেষে প্রধান অমাত্যের পদ ও চারি সহস্র সৈন্যের মনসবলাভ করেন। পাদশাহের ঈদৃশ অনুগ্রহের মূলে আবুল ফজলের অসাধারণ কার্য্যতৎপরতা বিদ্যমান ছিল। কি বিদ্বজ্জন সম্মিলনীতে, কি মন্ত্রণাকক্ষে, কি রণক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই তাঁহার অতুল প্রতিভা সমভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিত। আবুল ফজল পাদশাহের অসীম বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি তাদৃশ বিশ্বাসের যোগ্য পাত্রই ছিলেন। আমরা এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আকবরের আদেশে আবুল ফজল দক্ষিণাপথের আশির দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। দুর্গাধিপতি বাহাদুর শাহ আবুল

---

(১) আবুল ফজলের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং একাগ্রতা কিরূপ অলোক-সামান্য ছিল, তাহার পরিচায়ক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা আবুল ফজল কোন দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থের একখণ্ড প্রাপ্ত হন; কিন্তু পুঁথিখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণার্দ্ধ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। এজন্য তিনি একখণ্ড পূর্ণাঙ্গ পুঁথির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি বহু অনুসন্ধানেও উহা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিজেই অগ্নিদগ্ধ অংশ পূরণ করিতে সংকল্প করেন। আবুল ফজল বহু পরিশ্রমে নষ্টাংশ পূরণ করিতে সমর্থ হন। ইহার কিয়দ্দিন পরে দৈবাৎ একখণ্ড পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ কৌতূহলবশে উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন, এবং আবুল ফজলকৃত অংশ মূল হইতে নিকৃষ্ট নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ফজলের অনুগ্রহলাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট মহার্ঘ উপহারপ্রেরণ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল নিম্নলিখিত মন্তব্য সহ বাহাদুর শাহের উপহারফেরত দেন। আমি চারিটি সর্ত্ত প্রতিপালিত না হইলে উপ-হার গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ১ম, বন্ধুতা। ২য়, আমি উপহার-সামগ্রীগুলি অত্যধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিব না। ৩য়, আমি উপহার সামগ্রীলাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম না, ৪র্থ, উপহার-সামগ্রীগ্রহণের আবশ্যকতা। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত তিনটি সর্ত্ত প্রতিপালিত হই-য়াছে, তাহা হইলেও আমি আপনার প্রেরিত উপহারগ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, পাদশাহের অনুগ্রহে আমার উপহারগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

ফৈজী ও আবুল ফজল উভয়েই পিতার ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয়ের ধর্ম্মমত পিতার ধর্ম্মমত অপেক্ষাও অধিক প্রশস্ত ছিল। তাঁহারা গোঁড়া মোসলমান সমাজে ধর্ম্মত্যাগী, অপধর্ম্মাবলম্বী, সত্যনাশক, Free thinker এবং ভণ্ড প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে অভিহিত হইতেন। ফৈজী ও আবুল ফজলের সঙ্গলাভের পূর্ব্বেই পাদশাহ ধর্ম্মবিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও সমদর্শিতাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ভ্রাতৃযুগল অগ্নিসংযোগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের ইন্ধনসংগ্রহেই উহা সজীব ও প্রজ্বলিত ছিল। আকবরের প্রকৃতি, ভাব ও মতের সঙ্গে তাঁহাদের প্রকৃতি, ভাব ও মতের ঐক্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের ভাব ও মত পাদশাহের ভাব ও মত অপেক্ষা অধিক সুগঠিত ছিল। পাদশাহ ভ্রাতৃযুগলের সঙ্গে সর্ব্বদা ধর্ম্মবিষয়ে আলো-চনা করিতেন। ইহার ফলে পাদশাহ ও ভ্রাতৃযুগল নানা গতিতে আপন আপন ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া অবশেষে তৌহিদ

বা দীন-ই-ইলাহি (Divine Monotheism) নামক অভিনব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। এই নব ধর্ম্মের শীর্ষস্থানে স্বয়ং আকবর অবস্থিত ছিলেন ; তাঁহার নিম্নেই আবুল ফজল ও ফৈজীর স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রাজকুমার সেলিম আবুল ফজলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি নানারূপ দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের অনিষ্টচেষ্টা করিতেন। মন্ত্রিবর একান্ত প্রভুভক্ত ছিলেন, তিনি প্রতিবারেই রাজকুমারের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিতেন। এ জন্যই তিনি রাজকুমারের ঘৃণারপাত্র হইয়াছিলেন। রাজকুমার স্বচরিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, আবুল ফজল তাঁহার বন্ধু ছিলেন না। তিনি ভয় ও ঘৃণারপাত্রকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিবার সুযোগ অন্বেষণে নিরত ছিলেন। রাজকুমার একাধিকবার বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠেন ; তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন অধিকার করিতে অভিলাষী ছিলেন। আকবরের রাজত্বের সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষে রাজকুমার সেলিমের দুরাকাঙ্ক্ষা প্রবলাকার ধারণ করে, এবং তাহাতে পাদশাহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সময় আবুল ফজল দক্ষিণাপথে দেশ-বিজয়ে নিযুক্ত ছিলেন। পাদশাহ রাজকুমারের দমন জন্য তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত মন্ত্রীর মন্ত্রণা ও সহায়তা আবশ্যক মনে করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। আবুল ফজল রাজাজ্ঞানুসারে দক্ষিণাপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন তাঁহাকে অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারেই যাত্রা করিতে হইয়াছিল। সেলিম এই সুযোগে তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার জন্য বীরসিংহ নামক একজন ক্ষুদ্র সামন্তকে নিযুক্ত করেন। আবুল ফজল এই ষড়যন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়া-

ছিলেন, কিন্তু প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে শত্রুকুল নরওয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানে আবুল ফজলকে আক্রমণ করে। তিনি প্রবল পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু তাহাদের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত শীঘ্রই নিরস্ত্র হইয়া পড়েন। হীনমতি রাজা তাঁহার শিরশ্ছেদন করে। ছিন্নশির সেলিমের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। সেলিম রাজ্যলাভ করিয়াই বীরসিংহকে এই অপকার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করেন। তিনি স্বচরিত জীবনবৃত্তে আবুল ফজলের হত্যার কথা স্বীকার করিয়া আপন দোষস্খালন জন্য নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজলের অপঘাতে পাদশাহ একান্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন। তিনি বীরসিংহকে শাস্তিপ্রদান জন্য আজ্ঞা প্রচার করেন। রাজসৈন্য তাহাকে ধৃত করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়াছিল। কিন্তু আবুল ফজলের অপমৃত্যুর পর পাদশাহ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না বলিয়া বীরসিংহ পরিত্রাণ লাভ করে।

মা-আসিরউল-উমরা নামক গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, "অনেকে বলেন যে, আবুল ফজল বিধর্ম্মী ছিলেন। কেহ বা তাঁহাকে হিন্দু, কেহ বা তাঁহাকে উগ্নি-উপাসক, কেহ বা তাঁহাকে Free thinker বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এবং কেহ কেহ ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থ মতও প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন যে, আবুল ফজল অদ্বৈতবাদী ছিলেন। অন্যান্য স্থফির ন্যায় তিনিও পয়গম্বরের অনুশাসন অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। আবুল ফজল যে শান্তিপ্রয়াসী ও উন্নতচরিত্র ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি

কথনও কোন অসঙ্গত কথা বলেন নাই। তদীয় গৃহে দাস দাসীর ভৎর্সনা, বেতন কর্ত্তন, জরিমানা ও গরহাজিরী ছিল না। কোন কর্ম্মচারীকে অযোগ্য দেখা গেলেও তিনি তাহাকে অপসৃত করিতেন না। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, একবার চাকর নিযুক্ত করিয়া আবার তাহাকে অপসৃত করিলে সকলে প্রভুকে লোকচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করে। সূর্য্যের মেষরাশিতে প্রবেশের দিন আবুল ফজল গৃহস্থালীর সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন, জিনিস-পত্রের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া ফর্দ্দ করিতেন এবং সে ফর্দ্দ নিজের নিকট রাখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত হিসাব দগ্ধ করিয়া ফেলিতেন। এই সময় তিনি সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ দাস দাসীদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন, কিন্তু পাজামাগুলি কাহাকেও না দিয়া নিজের সম্মুখেই পোড়াইয়া ফেলিতেন।"

"আবুল ফজলের অসাধারণ আহারশক্তি ছিল। কথিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ বাইশ সের পরিমিত খাদ্য উদরসাৎ করিতেন। ব্যঞ্জনের ঝোল ও পানীয় জল ছাড়াই তাঁহার খাদ্যের পরিমাণ বাইশ সের ছিল। আবুল ফজল আহার করিতে বসিলে তদীয় পুত্র আবদুর রহমন সফর-চির কাজ করিতেন, রন্ধনশালার অধ্যক্ষকেও উপস্থিত থাকিতে হইত। তিনি কোন আহার্য্য সামগ্রী দুইবার মুখে দেন কি না তাহা উভয়ে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেন। যদি তিনি কোন খাদ্য দুইবার মুখে দিতেন, তাহা হইলে পরদিনও সেটা প্রস্তুত করা হইত। কোন খাদ্য স্বাদহীন হইলে তিনি তাহা পুত্রকে আস্বাদ করিবার জন্য প্রদান করিতেন, পুত্র আবার অধ্যক্ষকে দিতেন, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতেন না। দক্ষিণাপথে অবস্থানকালে তাঁহার বিলাসিতার মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একটী সুবৃহৎ তাম্বু মধ্যে এক সহস্র

আমীর ওমরাহকে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য দেওয়া হইত। এই সুবৃহৎ তাম্বুর নিকটেই আর এক তাম্বুতে কি ধনী, কি নির্ধন সর্ব্বপ্রকার আগন্তুকের জন্যই আহারের বন্দোবস্ত থাকিত। সমস্ত দিন খিচুড়ী পাক করা হইত, এবং যে কেহ প্রার্থনা করিত, তাহাকেই উহা নির্ব্বিচারে প্রদান করা হইত।"

"লিপিকুশলতায় আবুল ফজল অদ্বিতীয়। তদীয় ভাষা সুন্দর, প্রাঞ্জল ও পারিভাষিক-শব্দ-বিবর্জ্জিত। তাঁহার নির্ব্বাচিত শব্দগুলি এরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট, তাঁহার রচনাভঙ্গী এরূপ সুন্দর, তাঁহার শব্দযোজনা ও তাঁহার পদবিন্যাস এরূপ পারিপাট্যপূর্ণ যে, তদীয় রচনার অনুকরণ কাহারও পক্ষে সাধ্যায়াত্ত নহে।"

দেশীয় সমালোচক মাত্রেই তাঁহার রচনাসম্বন্ধে প্রাগুক্তরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বোখারার অধিপতি আবদুল্যা বলিতেন যে, তিনি আকবরের অসি অপেক্ষা আবুল ফজলের লেখনীকে অধিক ভয় করেন। তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুন্সী বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পত্রাবলী ভারতবর্ষের সমস্ত মাদ্রাসায় পঠিত হইয়া থাকে। প্রথিতনামা ব্লকম্যান্ সাহেবও আবুল ফজলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কিন্তু এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজ ইতিহাস লেখক তাঁহার বহুনিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বলেন, "আবুল ফজল পাদশাহের চরিত্র, অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতার লঘুত্ব জ্ঞাপক প্রত্যেক ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন অথবা সঙ্কুচিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার লেখার আদ্যন্ত পাদশাহের গৌরব ও কীর্ত্তি ঘোষণায় পূর্ণ। পাঠকগণ সমস্ত গ্রন্থব্যাপী গৌরব ও কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং লেখক ও সঙ্গে সঙ্গে তদীয়

নায়কের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। অর্থশূন্য স্তুতিবাচক বাক্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে আকবরের প্রকৃত মহিমা ও গৌরব লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া যায়। তাঁহার কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্য, বিপদাপদের বিবরণ ও শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে অন্যান্য গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হয়। পাদশাহের চরিত্রজ্ঞ একজন লেখক অতি-রঞ্জিত স্তুতিবাক্যে আপন গ্রন্থপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এবং পাদশাহ তাহা স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছেন। ইহা বিবেচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার চরিত্র আত্মাভিমানদুষ্ট ছিল। এই আত্মাভিমানই তাঁহার মহৎ চরিত্রের একমাত্র কলঙ্ক।" ইলিয়ট ও মর্লি প্রভৃতি লেখক-বর্গও আবুল ফজলের সম্বন্ধে প্রতিকূল মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাগুক্ত লেখকগণের প্রতিবাদচ্ছলে ব্লকম্যান সাহেব যাহা বলিয়া-ছেন, আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—"ইউরোপীয় লেখক-গণ আবুল ফজলকে স্তুতিবাদক ও স্বীয় প্রভুর হীনতাজ্ঞাপক ঘটনা-সমূহের প্রকাশ সম্বন্ধে সঙ্কুচিতহস্ত বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আকবরনামা পাঠ করিলে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতীয়-মান হইবে। যদি আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলী এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য ইতি-হাসের সঙ্গে তুলনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, অন্যের তুলনায় তাঁহার প্রশংসা বহুল পরিমাণে প্রগল্‌ভতাশূন্য, এবং সুশোভন ও মার্জ্জিত। কোন দেশীয় সমালোচকই তাঁহাকে তোষা-মোদকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। রাজমত ভ্রান্তিমূলক ও অসম্ভব হইলেও তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতিজ্ঞাপন করিতে প্রাচ্য নীতিশাস্ত্র উপ-দেশ দিয়াছেন, এবং সমগ্র প্রাচ্য কাব্যরাজি এরূপ রাশি রাশি উৎকট-রাজ-তোষামোদপূর্ণ যে, তত্তুলনায় আধুনিক রাজস্তবমালা শুষ্কপত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা আবুল ফজলকে ক্ষমা

করিতে পারি; কারণ, তিনি একজন প্রকৃত বীরপুরুষের সম্পর্কেই প্রশংসার স্রোত খুলিয়া দিয়াছিলেন।” শ্রীযুক্ত ডৌসন সাহেবেরও এই মত।

আবুল ফজল বহু গ্রন্থের প্রণেতা। পাদশাহের সঙ্গে প্রথম পরিচয়কালে তিনি কোরাণের কোন এক অংশের ব্যাখ্যা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। এই ব্যাখ্যা-পুস্তকের নাম আয়তু-উল-কুরসি। বদায়ূনির মতে এই গ্রন্থ তদীয় পিতার লেখনী-প্রসূত। ইনশাহ-ই-আবুল ফজল তাঁহার আর একখানি পুস্তকের নাম। এ গ্রন্থে সুলতান ও আমীর ওমরাহের নিকট কি ধরণে পত্র লিখিতে হয়, তাহার আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। আবুল ফজল কলিলা ও দামনা নামক আরবী গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগ্রন্থের নাম আয়ার-ই-দানিশ। তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেসকল গ্রন্থ পাঠকসমাজে তাদৃশ পরিচিত নহে। আবুল ফজলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম আকবরনামা। আকবরনামা দুইভাগে সমাপ্ত। প্রথম ভাগে আকবরের পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে বর্ষানুক্রমে তদীয় রাজত্বের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় রাজত্বের সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষে আবুল ফজল লোকান্তরিত হন। এজন্য আকবরনামায় এই সময়ের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; অবশিষ্ট কালের বিবরণ ইনায়েত উল্লা নামক একজন গ্রন্থকর্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এই গ্রন্থের নাম তাকমিলা-ই-আকবর নামা। আবুল ফজলের আর একখানি গ্রন্থের নাম আইন-ই-আকবরী। কেহ কেহ ইহাকে আকবরনামার উপসংহারভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আইনকে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। প্রথমে গ্লডুইন সাহেব আইন আকবরীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তার পর ব্লকম্যান সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর

উদ্যোগে এক অভিনব অনুবাদপ্রচার করিয়াছেন। গ্লডুইন সাহেবের অনুবাদ তাদৃশ মনোরম নহে; কিন্তু ব্লকম্যান সাহেবের অনুবাদ সর্ব্বাংশেই প্রীতিপ্রদ। তাঁহার অনুবাদ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও গভীর পাণ্ডিত্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বহুসংখ্যক টীকাসংযোগে ব্লকম্যান সাহেবের অনুবাদ সমধিক মূল্যবান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর উদ্যোগে আকবর-নামার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। লেপ্টেন্যাণ্ট চেম্বার্স আকবর-নামার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু উহা এ পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই।

আকবরনামা সম্বন্ধে এনায়েত উল্যা যে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি। "শেখের দ্বিতীয় ভাগের রচনাপ্রণালী তাদৃশ সৌন্দর্য্য-শালী নহে, এবং উহার বহুস্থানে সাধারণ পাঠকসমাজের দুর্ব্বোধ্য অপ্রচলিত শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই সকল দোষ অনুমোদিত নহে বলিয়া আমি প্রথম ভাগের আদর্শে দ্বিতীয় ভাগের পদবিন্যাসপদ্ধতি সংশোধন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি; তাঁহার ভাবসমূহ একদিকে যেমন নানারস সংশ্লিষ্ট ও সুন্দর, অন্যদিকেও যেন তেমনি সাধারণ ভাষায় সর্ব্বজন পরিচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকল শ্রেণীরই বোধগম্য ও প্রশংসনীয় হইতে পারে।"

নিজাম উদ্দীন।

খাজে নিজাম উদ্দীন আকবর শাহের শাসনকালের আর একজন বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক। নিজামের পিতার নাম খাজে মুকিমহরই। মুকিম বাবর পাদশাহের একজন অনুচর ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ-ত্বের শেষভাগে তোষাখানার দেওয়ানের পদলাভ করেন। বাবরের

পরলোকগমনের পর হুমায়ূন গুজরাট অধিকার করেন, এবং মিরজা আস্করী আমেদাবাদের শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই সময় মুকিম আস্করীর উজিরের পদ গ্রহণ করেন। হুমায়ূন যে সময় সেরশাহের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রাণে প্রাণে চৌসা হইতে আগ্রাভিমুখে পলায়ন করেন, তখন মুকিম তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিলেন। আকবর শাহের রাজত্বকালেও মুকিম জীবিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার বৃদ্ধ দশা; কিন্তু তখনও গুরুতর রাজকার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত।

মুকিমের পুত্র নিজামউদ্দীন একান্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এতদূর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, তৎকালের অন্য কাহারও সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হইতে পারে না। তিনি শাসনকার্য্যাভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তাতেও সমস্ত সহযোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একজন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, নিজামউদ্দীন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রারম্ভেই আকবর শাহের তোষাখানার দেওয়ানের পদলাভ করেন। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখদৃষ্ট হয় না।

আকবর শাহের রাজত্বের উনত্রিংশ বর্ষে ইতিমদ খাঁ গুজরাটের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। এই সময় নিজামউদ্দীন বক্সীর পদলাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গুজরাটে গমন করে। তিনি গুজরাটে ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। এই কাল মধ্যে প্রয়োজনাধীনে তাঁহাকে অনেকবার রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। অশেষ ধীসম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ নিজামউদ্দীনের রণকুশলতার অভাব ছিল। তিনি তরবারিধারণ করিয়া একবারও কীর্ত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৯—৯০ খৃষ্টাব্দে আকবরশাহ তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। নিজামউদ্দীন রাজাজ্ঞানুসারে কতিপয় উষ্ট্রারোহী সমভিব্যাহারে পাদশাহের পঞ্চত্রিংশ রাজ্যাভিষেকোৎসব দিনে লাহোর নগরে

উপনীত হন। তদীয় সমভিব্যাহারী উষ্ট্রারোহী ও অন্যান্য সহচরগণ নয়ন বিনোদন সজ্জায় সজ্জিত ছিল। তাহাদের বিস্ময়োৎপাদক বেশভূষা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাদশাহ নিজে তাহাদিগকে পরিদর্শন করেন। তিনি নিজামউদ্দীনের রুচি ও কৌশলে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নানা সম্মানে সম্মানিত করেন। আকবরের রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসরে জললারৌসানিকে বিনষ্ট করিবার জন্য আসফ খাঁ। মিরজা জাফরবক্সীবেগী আদিষ্ট হন। এই সময় নিজামউদ্দীন বক্সীর পদলাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পাদশাহের সঙ্গে মৃগয়ায় গমন করেন। মৃগয়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি জ্বররোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তদীয় পুত্রগণ রাজানুমতিক্রমে তাঁহাকে লইয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু রাভির তীরে উপস্থিত হইলেই নিজামউদ্দীনের প্রাণত্যাগ হয়।

বদায়ুনি লিখিয়াছেন, "নিজামউদ্দীন সুযশ রাখিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম ও বন্ধুতা, উভয় বন্ধনেই বিশেষ ভাবে আবদ্ধ ছিলাম। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই, এবং আমি নিরাশায় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়াছিলাম। অল্পকাল পরেই ঈশ্বরের আজ্ঞার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার অভাবে আমি এতদূর পীড়িত হইয়াছিলাম যে, কাহারও সঙ্গে নূতন করিয়া বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিরাছি। ১০০৩ হিজিরী অব্দের সফর চাঁদের ২৩ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন, এবং লাহোর নগরে তাঁহার নিজের উদ্যানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার মৃত্যুতে কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। তাঁহার সমাধির দিন আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার গুণরাজি স্মরণ করিয়াছিল।"

নিজামউদ্দীন উন্নতহৃদয়, বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল বলিয়া বিখ্যাত

ছিলেন; কিন্তু ইতিহাস-লেখকরূপেই কীর্ত্তিমন্দিরে স্থানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ইতিহাসের নাম তাবকত্-ই-আকবরশাহি। বায়ূনিও এ গ্রন্থকে এই নামেই অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উহা তাবকত্-ই আকবরী নামেই সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। কেহ কেহ গ্রন্থকর্ত্তার নামানুসারে তাকবত্-ই আকবরীকে তারিখ-ই নিজামীও বলিয়া থাকেন। নিজামউদ্দীনের পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান ইতিহাস-লেখকগণ এসিয়াখণ্ডের মোসলমান শাসনাধীন সমস্ত দেশের বিবরণ একত্র একগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেন। নিজামউদ্দীনই সর্ব্বপ্রথমে এই রীতি পরিহার করিয়া কেবল মাত্র ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক মাত্রেই তদীয় গ্রন্থকে আদর্শ পুস্তক রূপে গ্রহণ করিরা গিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাবকত্-ই আকবরীকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন এবং উহা হইতে স্ব স্ব ইতিহাস প্রণয়নকালে বহুল পরিমাণে সাহায্য লইয়াছেন। বদায়ূনি স্বীয় গ্রন্থকে তাবকত-ই আকবরীর সংক্ষিপ্তসার বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফেরিস্তা বলিয়াছেন যে, তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকাবলী মধ্যে একমাত্র তাবকত-ই আকবরীই সম্পূর্ণ গ্রন্থ ছিল। মা-আসির-উল-উমরা নামক গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, তাবকত-ই আকবরীর উপকরণ সংগ্রহ এবং তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে লেখককে বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হইয়াছিল। মিরমসুম ভকরী এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সঙ্কলনে সহায়তা করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য। হিন্দুস্থানের রাজন্যবৃন্দের বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ পুস্তকাবলী মধ্যে তাবকত-ই আকবরীই আদি গ্রন্থ। মোহাম্মদ কাজিম ফেরিস্তা এবং অন্যান্য ইতিহাস-লেখক তাবকত-ই আকবরী হইতে বহুস্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাবকত-ই আকবরীর আদর্শেই তাঁহাদেরই ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

তাঁহারা কেবল স্ব স্ব উপকরণ সংযোগপূর্ব্বক ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আবুল ফজলের ইতিহাসের সঙ্গে কোন কোন স্থানে তাবকত-ই আকবরীর অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নিজামউদ্দীন তাবকত-ই আকবরীর ন্যায় একখানি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যেসকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ— "আমি বাল্যকাল হইতেই পিতার উপদেশ ক্রমত ইতিহাসপাঠে নিরত ছিলাম। ইতিহাসপাঠে শিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, এবং পর্য্যবেক্ষণক্ষম ব্যক্তি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুশিক্ষালাভ করেন। হিন্দুস্থান একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য। সুবিস্তৃত হিন্দুস্থানের শাসকগণ উপাধিগ্রহণ করিয়া দিল্লী, গুজরাট, মালব, বাঙ্গলা ও সিন্ধু প্রভৃতি অনেক প্রদেশে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহাদের কার্য্যাবলীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন লেখকই এই ভূভাগের সমস্ত বিবরণ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই ; এমন কি হিন্দুস্থানের কেন্দ্রস্থল,—সাম্রাজ্যের অধিপতির বাসস্থান রাজধানী দিল্লী নগরীর সমস্ত বিবরণ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি পুস্তকও রচিত হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত ইতিহাসের নাম তাবকত্-ইনাশিরী। মিনহাজ-উস-সিরাজ এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সুলতান মৈজউদ্দীন ঘোরীর সময় হইতে নাশিরউদ্দীন বিন সমসউদ্দীনের সময় পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসরের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর সময় হইতে সুলতান ফিরোজ শাহের সময় পর্য্যন্ত জিয়া-ই বর্ণির ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে। ফিরোজ শাহের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অনেক সময় ভারতবর্ষে ঘোর বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রকৃতি পুঞ্জও শক্তিশালী

সার্ব্বভৌমিক শাসনে বঞ্চিত ছিল। একারণ আমি তাঁহার পর সময়ের কেবলমাত্র অসম্বদ্ধ ও অসম্পূর্ণ ইতিহাস দেখিতে পাইতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষের বৃত্তান্তপূর্ণ একখানি ইতিহাসও আমি দেখি নাই। এক্ষণে হিন্দুস্থানের বহির্ভূত ও অন্তর্ভূত সমস্ত প্রদেশ ঈশ্বরের প্রতিনিধির সর্ব্বজয়ী অসি দ্বারা বিজিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর সমস্ত ভগ্নাংশ এক মহা ঐক্যবন্ধনে একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, এবং হিন্দুস্থানের বহির্ভূত অনেক দেশ (এই সকল দেশ পাদশাহের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ মধ্যে কেহই জয় করিতে সমর্থ হন নাই।) সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে; এবং আশা করা যাইতে পারে যে, এই প্রতিষ্ঠান্বিত মহাপুরুষের অধীনে সপ্তদেশই সম্মিলিত হইবে। এজন্য আমি সরল ভাষায় একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এই ইতিহাসে সবক্তগীনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আকবরের রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে যত কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইবে।

তাবকত্-ই আকবরী প্রণয়নকালে নিজামউদ্দীন উনত্রিশখানি ইতিহাসের সাহায্যগ্রহণ করেন। সমগ্র গ্রন্থ দশভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগের নাম উপক্রমণিকা। আমরা এখানে একটী সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদান করিলাম। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

উপক্রমণিকা—গজনীর রাজবংশের বৃত্তান্ত।

১ম অধ্যায়—দিল্লীর পাঠান ও মোগল নরপতিগণের ইতিহাস। (এই অধ্যায়ে মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ হইতে আকবরের রাজত্বের অষ্টাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।)

২য় অধ্যায়—দক্ষিণাপথের ইতিহাস। (এই অংশে বাহমনী রাজ্যের সংস্থাপন হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত যত কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তারপর বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) বিজাপুর (২) আমেদনগর (৩) গোলকুণ্ডা রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।)

৩য় অধ্যায়—গুজরাটের নরপতিগণের বৃত্তান্ত।

৪র্থ অধ্যায়—মালবদেশের নরপতিগণের বৃত্তান্ত।

৫ম অধ্যায়—বঙ্গদেশের নরপতিগণের বৃত্তান্ত।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—জৌনপুরের রাজ বিবরণ।

৭ম অধ্যায়—কাশ্মীরের মোসলমান নরপতিগণের বৃত্তান্ত।

৮ম অধ্যায়—সিন্ধুদেশের ইতিহাস।

৯ম অধ্যায়—মুলতানের শাসনকর্ত্তৃগণের বৃত্তান্ত।

বদায়ূনি।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক বদায়ূনি ৯৪৭ হিজিরী অব্দে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম আব্দুল কাদের। বদায়ূনি উপাধিমাত্র বদায়ূন নগর তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া তিনি এই উপাধিগ্রহণ করেন। বদায়ূনির পিতার নাম শেখ মুলুক শাহ। মুলুকশাহ সম্বলের পীর বেচুর শিষ্য ছিলেন। তিনি ৯৬৯ হিজিরী অব্দে পরলোকগমন করেন। বদায়ূনি তৎকালের খ্যাতনামা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের নিকট নানা বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। তদীয় গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে এই সকল শিক্ষাগুরুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বদায়ূনি জ্যোতিষ, সংগীত এবং ইতিহাসে পারদর্শিতালাভ করেন। তাঁহার স্বর সুমিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি দরবারের বুধবাসরীয় ইমামের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত হন।

সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি আকবর শাহের সহিত পরিচিত হন। বদায়ূনি চল্লিশ বৎসরকাল শেখ মবারক, ফৈজী ও আবুল ফজলের সঙ্গে একত্র বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। তিনি এস্‌লাম ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন, একারণ উদার ধর্ম্মাবলম্বী শেখ মবারক প্রভৃতিকে heretics বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বদায়ূনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে পরলোকগমন করেন। তাবকতশাহজাহানী নামক ইতিহাসের মতে তাঁহার মৃত্যুকাল ১০২৪ হিজিরী অব্দ।

বদায়ূনির নানাবিদ্যায় গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আকবরের আদেশে রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত ও জমি-উর-রসিদি প্রভৃতি আরবি গ্রন্থের পারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল কাজের জন্য যথেষ্ট অর্থলাভ করিতেন; কোন এক কাজের পুরস্কার স্বরূপ সার্দ্ধ এক শত স্বর্ণ ও দশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা এবং নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হন। ফলতঃ আকবর তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি আকবরের বিরুদ্ধে প্রতিকূলভাব পরিপোষণ করিতেন।

বদায়ূনি হদিস্ সম্বন্ধে বহর-উল-অসমার নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নজাত-উর-রসিদ নামক নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থও তাঁহারই লেখনীপ্রসূত। বদায়ূনি মহাভারতের দুই পর্ব্বেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসেরও সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করেন।

বদায়ূনি বিবিধ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু মোগলরাজবৃত্তই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থরচনা করিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম মুন্তাখব-উত-তোয়ারিখ। এই নামে অনেক ইতিহাস বিদ্যমান আছে। এই জন্য বদায়ূনির ইতিহাস পাঠকসমাজে সাধারণতঃ তারিখই-বদায়ূনি বলিয়াই প্রখ্যাত।

বদায়ূনির গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গজনীবংশীয় রাজগণের, দ্বিতীয় ভাগে দিল্লীর পাঠান বংশীয় সুলতানগণের, তৃতীয় ভাগে বাবর ও হুমায়ূনের ও চতুর্থ ভাগে আকবরের বিবরণ প্রদত্ত হই-য়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে আকবরের সম-সাময়িক ধার্ম্মিক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও কবি প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বিখ্যাত ব্যক্তিগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আকবরের রাজত্বের বিবরণের জন্যই বদায়ূনির গ্রন্থ মূল্যবান। আকবরনামা প্রভৃতি গ্রন্থের আদ্যন্ত আকবরের পূর্ণাঙ্গ স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। বদায়ূনির গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক নিন্দা ও গ্লানির ভাব অনুস্থত হইয়াছে ; কিন্তু বদায়ূনির নিন্দা ও গ্লানির মধ্যেও আকবরের মহিমার যে আদর্শ বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা আবুল ফজলের স্তুতিপূর্ণ অলঙ্কারচ্ছটায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বদায়ূনি আকবর ও তদীয় অমাত্যগণের বিদ্বেষী ছিলেন। বদায়ূনি এস্‌লামধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন। আকবর অমাত্যগণের পরামর্শে ও সাহায়তায় এস্‌লামধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই বদায়ূনির বিদ্বেষের মূল কারণ। একথা তিনি নিজেও সরলভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস স্বার্থসিদ্ধি স্পৃহার নিকট সঙ্কু-চিত হইত, তদীয় গ্রন্থে এরূপ স্বীকারোক্তিরও অভাব নাই। পাদশাহ তাঁহার গুণের সমুচিত আদর করেন না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এজন্য তিনি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিতেন। তদীয় সহযোগী অমাত্যগণ রাজানুগ্রহলাভে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী ছিলেন বলি-য়াও তিনি ঈর্ষ্যাকুল ছিলেন। এই দুই কারণেও তাঁহার বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

বদায়ূনির গ্রন্থে ১০০৪ হিজরী অব্দ অর্থাৎ আকবরের রাজত্বের চল্লিশ বৎসরে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এ

গ্রন্থের প্রচার হইয়াছিল না। জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বকালে পাঠকসমাজে উহার প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের দশম বর্ষেও কেহ তারিখই-বদায়ূনির বিষয় কিছু অবগত ছিল না। এই সময় মা-আসির-ই রহিমি নামক গ্রন্থ লিখিত হয়। উহার রচয়িতা তাবকত্ ও আকবরনামা ব্যতীত আকবরের শাসনবিবরণ সম্বন্ধীয় অন্য কোন গ্রন্থে বিদ্যমান নাই বলিয়া ক্ষোভপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তারিখই-বদায়ূনির অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত থাকিলে তিনি অবশ্যই উহার উল্লেখ করিতেন।

প্রধানতঃ তাবকত্-ই আকবরী ও তারিখই মবারকশাহী অবলম্বনেই বদায়ূনির গ্রন্থরচিত হয়। কিন্তু উহাতে মৌলিক তত্ত্বেরও অভাব নাই। বদায়ূনি গ্রন্থরচনাকালে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্যগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এ বিষয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি পাঠ করিয়া গ্রন্থের মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মে, তাহা প্রকৃত নহে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ মৌলিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ।

গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং এই গ্রন্থরচনার যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার অনুবাদ প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি ঃ—

"আকবরশাহের আদেশক্রমে ৯৯৯ হিজিরী অব্দে কাশ্মীরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। তৎকালের একজন প্রধান পণ্ডিত প্রাগুক্ত শাহের আদেশেই কাশ্মীরের ইতিহাস হিন্দী হইতে পারসী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। আমি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ইতিহাসানুরাগী ছিলাম। আমি প্রত্যহ কিছু না কিছু সময় ইতিহাস অধ্যয়নে অথবা রচনায় অতিবাহিত করিতাম। কদাচিৎ ইহার

ব্যতিক্রম হইত। এ কারণ ভারতবর্ষে মোসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল মোসলমান সুলতান দিল্লীতে আধিপত্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিবার অভিলাষ অনেক সময় আমার হৃদয় অধিকার করিত। * * * কিন্তু ঘটনাধীনে এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অবসরপ্রাপ্ত হই নাই; এবং সর্ব্বদাই কোন না কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইত। বিশেষতঃ ভরণপোষণোপযোগী অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন আমি স্বদেশ ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এজন্য আমার অভিলাষানুরূপ গ্রন্থপ্রণয়ন কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত স্থগিত ছিল। তাহার পর আমি আমার গুণশালী প্রিয় মিত্র নিজাম উদ্দীন আমেদ বক্সীর পরলোক-গমনের পর এ কাজে প্রবৃত্ত হই। তাঁহার রচিত ইতিহাস উৎকৃষ্ট; তথাপি আমার মনে হয় যে, উহার স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে। সুতরাং মবারকশাহী এবং নিজাম-উততোয়ারিখনিজামি নামক গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে ভারতবর্ষের কতিপয় বিখ্যাত রাজার বিবরণ স্বীয় মন্তব্যসহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি। রচনাপ্রণালী বাগাড়ম্বরশূন্য করিবার জন্য যত্ন করা হইয়াছে, অলঙ্কারপূর্ণ কবিত্বময় ভাষা সর্ব্বত্রই পরিহার করা গিয়াছে, আমি এই পুস্তকের মুন্তাখবউত্‌তোয়ারিখ নাম রাখিয়াছি। বিখ্যাতরাজন্যবৃন্দের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট নিজের কীর্ত্তিসংস্থাপনই আমার গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। ভরসা করি, এ গ্রন্থ আমার দুর্ভাগ্যের মাত্রাবৃদ্ধি না করিয়া চিরস্থায়ী সুখের কারণ হইবে।

যাহা সত্য, তাহাই লিপিবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং ভরসা করি, কোন নগণ্য ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিলেও ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিবেন।”

ফেরিস্তা।

ইতিহাসপ্রিয় বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই ঐতিহাসিককুলতিলক ফেরিস্তার নাম অবগত আছেন। ফেরিস্তা ভারতীয় মোসলমান ইতিহাসবেত্তৃগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্ত্তী অস্ত্রাবাদ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকাল লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জেনারল ব্রিগস্ সাহেব ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক জুলস্মোল সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ফেরিস্তা ব্রিগস্ নির্দ্দিষ্ট সময়ের বিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা আমাদের ঐতিহাসিকের উপাধিমাত্র, তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজিম হিন্দু শাহ। তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দু শাহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন ; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করেন নাই। এজন্য তিনি শিশু-পুত্র ফেরিস্তাকে সঙ্গে লইয়া অর্থঅন্বেষণে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং দক্ষিণাপথে মূর্ত্তাজা নিজাম শাহের আশ্রয়গ্রহণ করেন। তিনি রাজকুমার মিরণ শাহের পারস্য শিক্ষকের পদলাভ করেন, কিন্তু এই পদে নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ফেরিস্তা শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন।

তদীয় পিতা অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে নিজামের দরবারে অল্প সময়ের মধ্যেই একান্ত প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। শিশু-ফেরিস্তা পিতার গুণগ্রামমুগ্ধ নিজামের আনুকূল্যে প্রতিপালিত হন। এই সময়ের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা যায় না ; যিনি ভাবীকালে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ঐতিহাসিককুলের বরেণ্য হইয়া-

ছিলেন, তাঁহার শৈশবকাল কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিতে পারে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোন উপায় নাই।

যাহা হউক, ফেরিস্তা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া মুর্ত্তাজা নিজাম শাহের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, এবং অচিরে বিশিষ্টরাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৫৮৬, কি ৮৭ খৃষ্টাব্দে মুর্ত্তাজার পুত্র মিরণ শাহ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া পিতাকে রাজ-সিংহাসন হইতে অপসৃত করিয়া স্বয়ং রাজপদ অধিকার করেন। এই ঘটনার দিন ফেরিস্তা মুর্ত্তাজা শাহের শরীররক্ষক সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। (১) শত্রুগণ মুর্ত্তাজার অনুচরদিগকে হত্যা করিয়া আপনাদের তরবারি কলঙ্কিত করিয়াছিল। যদি মিরণ শাহ ফেরিস্তাকে স্বীয় গৃহশিক্ষকের পুত্র বলিয়া স্বয়ং চিনিতে না পারিতেন ও তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য আগ্রহপ্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনিও অন্যান্য রাজানুচরের ন্যায় নিহত হইতেন।

পিতৃদ্রোহী মিরণ শাহ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণের এক বৎসর মধ্যেই শত্রুকুল প্রবল হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়াছিল। এই রাজবিপ্লব-কালে ফেরিস্তা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই।

এই সময়ে নিজামের দরবারে সুন্নিমতের প্রাধান্য ছিল; ফেরিস্তা নিজে সিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, এজন্য তাঁহার ধর্ম্মমত তদীয় উন্নতি-লাভের অন্তরায় স্বরূপ ছিল। তিনি সুন্নিমতের কেন্দ্রস্থল আমেদনগর

---

(১) ব্রিগস্ নির্দ্দিষ্ট সময় (১৫৭০ খৃঃ) ফেরিস্তার জন্মকাল হইলে তৎকালে তাঁহার বয়স মাত্র ষোড়শ, কি সপ্তদশবর্ষ ছিল; কিন্তু তাঁহার পদের গুরুত্ব দেখিলে অনুমিত হয় যে, ফেরিস্তা জুলসমোল সাহেবের প্রদর্শিত ১৫৫০ খৃষ্টাব্দেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুরে গমন করিতে সঙ্কল্প করেন, এবং তদনুসার ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তথায় উপনীত হন। এই স্থানে তিনি রাজপ্রতিনিধি দেলওয়ার খাঁ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন; এবং তাঁহার যত্নে বিজাপুরের অধিপতির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তৎকালে এব্রাহিম আদিল শাহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি ফেরিস্তার প্রতি যথোপযুক্তঅনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। ইহার পর বর্ষচতুষ্টয় অতিবাহিত হইলে দেলওয়ার খাঁ রাজার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া পলায়ন করেন। দেলওয়ার খাঁর পর সিরাজনগর-নিবাসী এনায়াত খাঁর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। তাঁহার যত্নে ফেরিস্তা পুনরায় এব্রাহিম শাহের সাক্ষাৎকারলাভ করেন, এবং এবার স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া রাজানুগ্রহভাজন হন।

এই সময়ে একদা এব্রাহিম শাহ রৌজাতুকসফা নামক গ্রন্থের এক খণ্ড ফেরিস্তাকে উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিতে আদেশ করেন। তিনি এই উপলক্ষে ফেরিস্তাকে বলেন, "একমাত্র নিজামউদ্দীন বক্সী ব্যতীত আর কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। নিজামউদ্দীনের গ্রন্থও, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণাপথের অংশ, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিও; এই জাতীয় গ্রন্থসমূহ মিথ্যা ও তোষামোদবাক্যে কলুষিত; তুমি আপনার লেখনীকে এ দোষ হইতে মুক্ত রাখিও।"

ইহার পর ফেরিস্তা অবসর মত ইতিহাস সঙ্কলনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সসম্মানে ও সগৌরবে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি একবার দৌত্যকার্য্যে বৃত হইয়া জাহাঙ্গীর পাদশাহের দরবারে গমন করেন। বিজাপুরাধিপতির পক্ষ হইতে আকবরের

মৃত্যুতে শোক ও জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেকে আনন্দপ্রকাশ করাই তাঁহার মোগল দরবারে গমনের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া জেনারল ব্রিগস্ সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিবার জন্য রাজধানী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, ফেরিস্তা পথিমধ্যে লাহোর নগরে পাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। লাহোর হইতে প্রতিগমনকালে তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি একস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল দুর্গ দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রোটাস দুর্গই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ়। ফেরিস্তা ভ্রমণোপলক্ষে এক সময় বদক্ষাণ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের ফলে তিনি ভূয়োদর্শন লাভ এবং স্বীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফেরিস্তার মৃত্যুর সময় কোন স্থানে লিপিবদ্ধ নাই। জেনারল ব্রিগস্ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, অর্থাৎ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। পক্ষান্তরে জুলস্‌মোল সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দেও স্বীয় গ্রন্থ সংশোধনে ব্যাপৃত ছিলেন। মোল সাহেবের মতে ফেরিস্তা ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মপরিগ্রহ করেন; তাহা হইলে ফেরিস্তা অন্ততঃ ৭৩ বৎসর জীবিত ছিলেন।

ফেরিস্তা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ইতিহাসের খসড়া এব্রাহিম আদিল শাহকে অর্পণ করেন; ইহার পর তিনি আবশ্যক মত সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই খসড়াটিকে সম্পূর্ণ গ্রন্থে পরিণত করিবার জন্য জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। ফেরিস্তা গ্রন্থের শেষভাগে যে সকল ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পর্ত্তুগিজগণ

কর্ত্তৃক সুরাট নগরে কুঠী সংস্থাপনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরে পর্ত্তুগিসদের কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল। জেনারল ব্রিগস্ সাহেব এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ফেরিস্তা ১৬১১ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে ইতিহাস সমাপ্ত করেন, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের, এমন কি তাহার দশ বৎসর পরের ঘটনার বিবরণও তদীয় গ্রন্থে লিপি-বদ্ধ রহিয়াছে। এজন্য ব্রিগস্ সাহেবের নির্দ্দেশ আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ফেরিস্তা স্বপ্রণীত ইতিহাসের নাম গোল-মন-ই এব্রাহিমি ও নৌরস-নামা রাখিয়াছিলেন। তিনি বিজাপুরের অধিপতি এব্রাহিম শাহের নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার নামের অনুকরণেই উহার প্রথমোক্ত নামকরণ হইয়াছিল। অনেকে তাঁহার ইতিহাসকে তারিখ-ই এব্রাহিমি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এব্রাহিম ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে নৌরস নামক এক নূতন রাজধানীর পত্তন করেন; ফেরিস্তা আপনার মুরব্বির সন্তোষবিধান জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নামের সঙ্গে স্বপ্রণীত গ্রন্থের নাম সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় নামের কারণ।

উপক্রমণিকা, দ্বাদশ অধ্যায় ও উপসংহার, এই চতুর্দ্দশ ভাগে ফেরিস্তার ইতিহাস বিভক্ত। আমরা এস্থানে প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদান করিলাম;—

উপক্রমণিকা,— হিন্দু রাজন্যবর্গের ও প্রাচীন মোসলমান জাতির ভারতে আগমনের বৃত্তান্ত।

১ম অধ্যায়,— গজনি ও লাহোরের নরপতিগণের বৃত্তান্ত।

২য় অধ্যায়,— দিল্লীর সুলতানগণের বৃত্তান্ত।

ফেরিস্তা প্রদত্ত হিন্দুরাজন্যবর্গের বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ ও নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংস্কৃত সাহিত্যে নিবদ্ধ, সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতা নিবন্ধন ফেরিস্তা বাধ্য হইয়াই কেবল-মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান ইতিহাসবেত্তৃগণের গ্রন্থ অনুসরণ পূর্ব্বক এ অংশ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সকল ইতিহাসবেত্তা হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারা সরলভাবে হিন্দুজাতির গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত ছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্রাদিতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অধিকার ছিল না। কেহ কেহ বা হিন্দুর ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেন; কিন্তু তদনুগত মানবজাতির আদিবৃত্তান্ত এসলাম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ক সমদর্শিতার অভাবে

গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে মোসলমান লিখিত হিন্দুযুগের বিবরণ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল। তাদৃশ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ফেরিস্তা যে নানারূপ ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা বিন্দুমাত্রও বিচিত্র নহে।

মোসলমানযুগের আরম্ভ হইতেই ফেরিস্তার ইতিহাসের উৎকর্ষের সূচনা। ফেরিস্তা স্বীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ জন্য সমস্ত বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণস্থল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসে শাখা-মোসলমান রাজবংশসমূহের বিবরণও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা যে অবস্থায় ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাদৃশ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল। ফেরিস্তা ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি ৩৫ খানি বিভিন্ন ইতিহাস হইতে স্বরচিত পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু পুস্তকের গর্ভে আরও বহুসংখ্যক ইতিহাসের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফেরিস্তা এই সকল গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য ঘটনা সকল এমন সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করা অনাবশ্যক। এজন্য ফেরিস্তা যে সকল গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। এক-স্থানে সমুদায় মোসলমান ইতিহাসের সারসংগ্রহ প্রদান করাতে যেমন একদিকে সুবিধা হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে দোষের স্পর্শও ঘটিয়াছে। তথ্যের পর তথ্য উপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্ট হই-য়াছে; এজন্য ঘটনাসমূহ উপযুক্ত সমালোচনা সহকারে পরিব্যক্ত না হওয়াতে কোন কোন অংশ প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও প্রাঞ্জল হইতে পারে নাই।

ফেরিস্তার ইতিহাস অন্যান্য মোসলমান ইতিহাস-লেখকগণের ইতি-

হাসের ন্যায় পক্ষপাত অথবা কুসংস্কারদুষ্ট নহে; এমন কি, তিনি যে নরপতির অনুমত্যনুসারে ও অর্থসাহায্যে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাঁহা-রও অযথা তোষামোদবাক্যে লেখনীর অপব্যবহার করেন নাই। কিন্তু সৈয়দকুল সম্বন্ধে কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার সময় ধর্ম্মবিদ্বেষের হাত হইতে একবারে পরিত্রাণলাভ করিতে পারেন নাই, এবং মোসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক নির্দ্দোষ হিন্দুগণের রক্তপাতের বর্ণনাতেও কিয়ৎ পরিমাণে গোঁড়ামি প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই দুই বিষয়েই তাঁহার অপরাধ তদীয় স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের সঙ্গে তুলনায় সামান্য। শ্রীযুক্ত ডো সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন,—"বোধ হয় তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ পক্ষপাতশূন্য ছিলেন, রাজ-নৈতিক তোষামোদ অথবা ভয় সম্পর্কেও তত্তুল্য নির্দ্দোষ ছিলেন। তিনি প্রত্যেক সৎকার্য্যের তদুপযুক্ত প্রশংসা না করিয়া কখনও ক্ষান্ত থাকিতেন না, অথবা কেহ কোন অপকর্ম্ম করিলে, অনুষ্ঠাতা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদস্থই হউন না কেন, তাহার যথোপযুক্ত নিন্দা না করিয়া বিরত হইতেন না।"

শ্রীযুক্ত ডো সাহেব ১৭৬৮—৭২ খৃষ্টাব্দে ফেরিস্তার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগত হয় নাই। পারসী পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ সম্বন্ধে যে সকল মহাত্মা অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডো সাহেব একজন; সে জন্য তদীয় গ্রন্থে ভুলভ্রান্তি থাকা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক। কাপ্তেন স্কট সাহেব দক্ষিণাপথের বিবরণাংশের অনুবাদ প্রচার করিয়া ঐতিহাসিক সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জেনারল ব্রিগস্ সাহেব চারিখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজী অভিজ্ঞ

পাঠকগণ বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে ভারতীয় মোসলমান শাসনের যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন, তৎসমুদায়ই ব্রিগস্ সাহেবের গ্রন্থে এক স্থানে সন্নিবদ্ধ আছে। ব্রিগস্ সাহেব আবশ্যকীয় তথ্যপূর্ণ কয়েকটি পরিশিষ্ট মূল গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

থাফি খাঁ।

মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণবিকাশকালে বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক তাহার গৌরবমণ্ডিত শাসন বিবরণ কীর্ত্তন করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিকগণ মধ্যে শীর্ষোক্ত থাফি খাঁ একজন প্রধান ব্যক্তি। তৎপ্রণীত ইতিহাস ভাষার সারল্যে ও ঘটনার পক্ষপাতশূন্য বিশদ বর্ণনায় পাঠকবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঈদৃশ ইতিহাস-প্রণেতার জীবনের আখ্যান জানিবার জন্য স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মে। কিন্তু সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার কোন উপায় নাই। শ্রীযুক্ত ডোসন বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিতে পারেন নাই।

প্রাগুক্ত ঐতিহাসিকের নাম মোহাম্মদ কাশিম। থাফি খাঁ উপাধি মাত্র। থাফি খাঁ দিল্লীর এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তদীয় পিতা খাজে মীর রাজকুমার মুরাদবক্সের অধীনে কোন বিশিষ্টকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুরাদবক্সের ভাগ্যচক্র নিম্নগামী হইলে খাজে সাহেব আওরঙ্গজেবের অধীনে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। থাফি খাঁও তাঁহার অধীনেই শিক্ষানবিশী করেন, পাদশাহ তাঁহার গুণরাজি সন্দর্শন করিয়া একান্ত প্রীত হন, এবং তাঁহাকে সৈন্য ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। থাফি খাঁর পিতা ইতিহাস-রসিক ছিলেন; ইতিহাস রচনায় তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। পিতার গুণ পুত্রেও বর্ত্তিয়াছিল। থাফি খাঁ সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া আওরঙ্গজেব পাদ-শাহের রাজত্বের ইতিহাস রচনায় মনঃসংযোগ করেন; কিন্তু এ কার্য্যে

প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব কুটিলহৃদয় শাসন-পতি ছিলেন। তাঁহার কার্য্যাবলী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়া কেহ লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থিত করে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তিনি তাঁহার রাজত্বের কোনরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করেন। কিন্তু থাফি খাঁর উৎসাহশীল প্রকৃতি তাদৃশ প্রবল বাধাতেও দমিত হয় নাই। তিনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কিরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তদীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে থাফি খাঁ নিজে যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি। "রাজত্বের দশম বর্ষ অতিবাহিত হইলে পাদশাহ লেখকদিগকে তাঁহার শাসনকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও কতিপয় যোগ্য লেখক নিরস্ত হন নাই। এই সকল লেখকের মধ্যে মুস্তাইদ খাঁ ও বৃন্দাবনের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুস্তাইদ খাঁ অতি সংগোপনে দক্ষিণাপথের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ দেশ ও দুর্গজয়ের কথাতেই পরিপূর্ণ, তাহাতে যুদ্ধকালে পাদশাহকে যে সকল দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বৃন্দাবনের গ্রন্থে পাদশাহের রাজত্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাদশাহের রাজত্ব ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎবর্ষ স্থায়ী ছিল। প্রথম দশ বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু অবশিষ্ট চল্লিশ বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি কোন স্থানে দেখি নাই। পাদশাহের রাজত্বের দ্বিতীয় দশ বৎসরের বিবরণ সন তারিখ নিরূপণ অন্তে ধারাবাহিকরূপে মদীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই। তাহার পরবর্ত্তীকালের বিবরণ আমি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে সরকারী কাগজপত্র ঘাঁটিয়া ও

পাদশাহের বিশ্বাসভাজন পুরাতন ভৃত্য এবং অন্যান্য শ্রেণীর সত্যবাদী ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উদ্ধার করিয়াছি। এই সকল বিবরণ ও নিজে পূর্ণবয়স্ক হইলে অভিজ্ঞতাবলে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আপন স্মৃতিভাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণ তৎসমুদায় লোকসমাজে প্রকাশ করিলাম।”

আওরঙ্গজেব তাঁহার শাসনকালের ইতিহাস রচনা করিতে নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈদৃশ কার্য্য ইতিহাস রচনার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল; এবং তজ্জন্য তাহা চিরকালই অপকার্য্য বলিয়া নিন্দনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অপকার্য্যের অভ্যন্তরেও মঙ্গলের বীজ লুক্কায়িত ছিল। খাফি খাঁর ইতিহাস গোপনে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়াই উহা তাদৃশ পক্ষপাতশূন্য বর্ণনায় পরিপূর্ণ। খাফি খাঁর গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন স্থানে আওরঙ্গজেবের শাসনকালের বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ, তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতশূন্য বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াই কীর্ত্তিমন্দিরে স্থান-লাভ করিয়াছিলেন।

খাফি খাঁর গ্রন্থের নাম মুন্তা খাব-উল-লুবাব। তিনি উপক্রমণিকায় মোগল জাতির আদি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; পয়গম্বর নোয়ার জন্মকালে ইহার সূচনা ও বাবরের ভারতাক্রমণের প্রাক্কালে ইহার পরিসমাপ্তি। এই অংশে ঘটনাবলীর কেবলমাত্র রেখাপাত করা হইয়াছে। খাফি খাঁ মূলগ্রন্থের প্রথম ভাগে বাবর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদান করিয়া হুমায়ূন ও আকবরের রাজত্বের ইতিহাস সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আকবরের পরলোকগমনের পর হইতেই বিস্তৃত বিবরণের আরম্ভ।

মাহাম্মদ শাহের রাজত্বের একাদশ বর্ষে মুন্তাখাব-উল-লুবার সমাপ্ত হয়। গ্রন্থসমাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনাসমূহও বর্ণিত হইয়াছে। খাফি খাঁ বহুযত্নে ও পরিশ্রমে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া মোহাম্মদ শাহকে উপহার প্রদান করেন। তিনি এই গ্রন্থপাঠে একান্ত প্রীতিলাভ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে খাফি খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

খাফি শব্দের অর্থ গুপ্ত। খাফি খাঁ গোপনে ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এই উপাধিপ্রদান করা হয়; তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণেরও এই মত। কিন্তু সুবিখ্যাত ডোসন সাহেব অন্য-রূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে খাফি শব্দ খাফি খাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাসভূমির নির্দ্দেশ করিতেছে। খোরসানের একটী বিভা-গের নাম খাফি; এইস্থান প্রসিদ্ধ নিশাপুরের নিকটবর্ত্তী। খাফি শব্দ আর অনেক ব্যক্তির নামের সঙ্গে জড়িত দেখা গিয়াছে। শেখ জিয়া উদ্দীন খাফি, ইমাম খাফি প্রভৃতি নাম প্রসিদ্ধ। ডোসন সাহেব বলেন, খাফি খাঁ খাফি ভাবে (সংগোপনে) গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন; এজন্য খাফি নাম সার্থক বলিয়া রহস্য করা মোহাম্মদ শাহের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

মুন্তাখাবউল-লুবাব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাই-টীর যত্নে ও উদ্যোগে মূল পারসী গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ডোসন সাহেব ভারত ইতিহাস সংগ্রহ নামক পুস্তকে কিয়দংশের অনুবাদপ্রদান করিয়াছেন। মেজর গর্ডন নামক একজন সৈনিক পুরুষ মুন্তাখাব-উল-লুবাব গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মহাত্মা এল-ফিনষ্টোন এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া আওরঙ্গজেবের বিবরণ সঙ্কলন

করিয়া স্বীয় ইতিহাসে প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ গর্ডন সাহেব এই অনুবাদ মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন নাই; এক্ষণ উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গোলাম হোসেন।

প্রবলপ্রতাপ পাদশাহ আওরঙ্গজেবের পরলোকগমনের পর হইতে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। বহুসংখ্যক ইতিহাস-লেখক মোগলের এই অধঃপতনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ইতিহাস-লেখকের মধ্যে মীর গোলাম হোসেন খাঁ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গোলাম হোসেন অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গোলাম হোসেনের পিতা হিদায়ত আলী খাঁ বাঙ্গলার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর পরমাত্মীয় ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে তিনি বিহারের সহকারী শাসন কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তদীয় পুত্র গালাম হোসেন শাহজাহানাবাদে অবস্থিতি করিতেন। কোন কারণে আলিবর্দ্দী খাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে হিদায়তআলীখাঁ বিহারের কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লীতে গমন করেন। এই সময় গোলাম হোসেন খাঁ শাহজাহানাবাদ হইতে বিহারে আগমন করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে তিনি বিহারে অবস্থান না করিয়া পূর্ণিয়ায় আলিবর্দ্দী খাঁর জামতা সৈয়দ আমেদের নিকট গমন করেন। দিল্লীর পাদশাহ হিদায়ত আলী খাঁকে পাণিপথ ও সোনপথের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে বঙ্গ-দেশে রাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং সে বিপ্লবে আলীবর্দ্দীর বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। একারণ গোলাম হোসেন দিল্লীতে গমন করেন।

এই সময় দিল্লীর রাজশক্তি নিরতিশয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল।

পাদশাহ আমেদ শাহের কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। অমাত্য গাজি উদ্দীন সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। গাজি উদ্দীন শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পাদশাহ এবং রাজকুমারগণের সঙ্গেও নানাপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। একারণ জ্যেষ্ঠ রাজকুমার আলীগহের (পরে শাহ আলম) কৌশলে তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় হিয়াদত আলী খাঁ মিরবক্সীর এবং গোলাম হোসেন মির মুনশীর পদগ্রহণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী হন। কিন্তু শাহ আলমের আর্থিক অবস্থা অচিরে অত্যন্ত অসচ্ছল হইয়া উঠাতে তাঁহারা কার্য্য পরিত্যাগ করেন। অতঃপর হিয়দত-আলী খাঁ বিহারের অন্তর্গত স্বীয় জায়গীরে বাস করিতে থাকেন, এবং গোলাম হোসেন মুঙ্গেরে গমন করেন। গোলাম হোসেন মুঙ্গেরে উপনীত হইলে নবাব মীর কাসিম তাঁহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা প্রেরণ করেন। এই সূত্রে তিনি ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে পরিচিত হন। অচিরে তাঁহার সঙ্গে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। একারণ, মীর কাসিম তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ইহার পর তিনি ইংরেজের অধীনে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি জেনারল গোভারডের সঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। গোলাম হোসেন জেনারলের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি জেনারলের নিকট যথোচিত অনুগ্রহলাভ করিতেন।

কলিকাতা সহরে অবস্থিতিকালে গোলাম হোসেন স্বীয় চিরখ্যাত ইতিহাস প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে কেহ হিন্দুস্থানের রাজন্যগণের ইতিহাস প্রণয়ন না করায় আমি নিজে যাহা

অবগত আছি, অথবা বিশ্বাসযোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। যদি পরবর্ত্তীকালে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রাচীন ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে অভিলাষী হন, তবে যেন তিনি পূর্ব্ব সময়ের সহিত আধুনিক সময়ের যোগসূত্র ছিন্ন দেখিতে না পান, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। অতএব ঐশ্বরিক কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই কোন প্রকার আড়ম্বর না করিয়া সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিব। যদি আমার কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি হয়, তবে আমার কৈফিয়ৎ স্পষ্ট; যাঁহারা আমাকে ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই দায়ী।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে গোলাম হোসেনের ইতিহাস সমাপ্ত হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থের নাম সায়ের মুতাক্ষরিণ রাখেন। সায়ের মুতাক্ষরিণ শব্দের অর্থ আধুনিক সময়ের দৃশ্য। সায়ের মুতাক্ষরিণে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা ক্যাম্বে এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠার সূচীর অনুবাদ প্রদান করিতেছি। সায়ের মুতাক্ষরিণ অর্থাৎ আধুনিক কালের ইতিহাস। এ গ্রন্থে ১১১৮ হিজিরী সন হইতে ১১৯৪ হিজিরী সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুস্থানের শেষ সাতজন সম্রাটের বিবরণ সাধারণ ভাবে ও বঙ্গদেশে ইংরেজদের যুদ্ধের বিবরণ বিশেষভাবে এবং তদনুষঙ্গক্রমে বাঙ্গলা ও অযোধ্যার শেষ রাজবংশসম্ভূত সিরাজদ্দৌলা এবং সুজাদ্দৌলার পারিবারিক বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল বিবরণের সঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তা ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ও তাহার রাজনীতির সমালোচনা মূলক বিবরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

এই বৃহদায়তন ইতিহাসের বাঙ্গলার অংশই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং এই অংশ প্রণয়ন করিয়াই গোলাম হোসেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডোসন সাহেব লিখিয়াছেন, গ্রন্থকর্ত্তা যেরূপ নিরপেক্ষতা এবং তেজস্বিতা সহকারে প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় অত্যাবশ্যকীয় ঘটনাসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় ঐতিহাসিক কুলেও দুর্ল্লভ। বিগ্রস্ সাহেব লিখিয়াছেন, এই ইতিহাস সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনবৃত্তের প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। এই প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয়। মোসলমানের ধর্ম্ম ও স্বভাব-সুলভ দোষগুলি বাদ দিলে আমরা ইহার কোন অংশই ইউরোপের এই প্রণালীতে লিখিত ইতিবৃত্ত অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ করি না। ডক ডিসালি, লর্ড ক্লেরেনডন্ অথবা বিশপ বারনেটও ঈদৃশ রচনাপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

হাজি মুস্তাফা নামক একজন ফরাসী ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সায়ের মুতাক্ষরিণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। হাজি মুস্তাফার প্রকৃত নাম রেমণ্ড। রেমণ্ড স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন। হাজি মুস্তাফার পরে বিগ্রস্ সাহেব সায়ের মুতাক্ষরিণের কিয়দংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই উভয় অনুবাদই এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি কলিকাতার ক্যাম্বে এণ্ড কোম্পানী হাজি মুস্তাফার অনুবাদের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।